২০০২ সালের
বুকার
পুরস্কারপ্রাপ্ত

লাইফ অব পাই

ইয়ান মার্টেল

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

বুকার ২০০২ সালের পুরস্কারপ্রাপ্ত
বাংলার বাঘ গেল বিশ্বসাহিত্যে

লাইফ অব পাই

ইয়ান মার্টেল

সহজ সরল মাতৃভাষায় অনুবাদ

অনুবাদ
মনজুর শামস

ইংরেজি © ইয়ান মার্টেল
বাংলা © মনজুর শামস

প্রথম প্রকাশ ● বইমেলা ২০০৩

প্রকাশক ● মিজানুর রহমান ● দি স্কাই পাবলিশার্স ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস ● সজল কমপিউটার ৩৮/২-খ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ● হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
পরিবেশক ● সাহিত্য বিকাশ ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ● শিশির

মূল্য ● ১৫০ টাকা মাত্র

ISBN 984-826-021—8

লেখকের কথা

আমার উনয় আকাঙ্ক্ষার ফসল এই বই। চলুন এর ব্যাখ্যা দেয়া যাক। ১৯৯৬ সালের বসন্তে আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ, একটি উপন্যাস, প্রকাশিত হয় কানাডায়। এটা ভালো চলেনি। সমালোচকরা ছোটখাটো প্রশংসা করলেও কড়া ভর্ৎসনায় এটিকে উড়িয়েই দিলেন প্রায়। আর পাঠকরা এতে একে উপেক্ষা করলো। প্রচার মাধ্যমের সার্কাসে আমার আন্তরিক প্রয়াস জোকারের লম্ফঝম্ফ আর দড়ির ওপর কসরত বলে অবজ্ঞা করা হলো। বইয়ের দোকানের শেলফে আমার বই অনড়-সারিবদ্ধ হয়ে পড়ে রইলো। বেসবল আর ফুটবল খেলার সুযোগের অপেক্ষায় ছেলেরা যেমন লাইন ধরে অপেক্ষায় থাকে আমার বইগুলোও তেমনি শেলফে পড়ে রইলো—যেন আনাড়ি বালককে কেউ খেলতে নিচ্ছে না। অবশ্য দ্রুত এবং শান্তভাবেই আমার এ দুরবস্থার অবসান হলো।

এ ব্যর্থতা আমাকে তেমনভাবে টলাতে পারলো না। এর মধ্যেই আমি ১৯৩৯ সালের পর্তুগালকে উপজীব্য করে একটি উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি নিলাম। আমি শুধু অবসরহীন হয়ে পড়লাম আর হাতে টাকা-পয়সাও ছিলো সামান্যই।

সুতরাং আমি বোম্বে উড়ে গেলাম। তিনটি জিনিসের নিরিখে এটা মোটেও অযৌক্তিক ছিলো না : চেপেচুপে চলতে যে কারো পক্ষে ভারতে অবসর কাটানো সম্ভব; অল্প পয়সায় সেখানে অনেকদূর ভ্রমণ করা যায় এবং ১৯৩৯ সালের পর্তুগালের পটভূমিতে উপন্যাস লেখার জন্য পর্তুগালে ছুটে যাওয়ার তেমন প্রয়োজন ছিলো না।

এর আগেও ভারতের উত্তর অংশে একবার এসে পাঁচ মাস বেড়িয়ে গেছি। সেবার অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়ই উপমহাদেশ সফরে এসেছিলাম। আসলে সেবার এক কথাতেই রাজি হয়ে ভারত ভ্রমণ করেছিলাম। আমার এক বন্ধুর দেশটি সম্পর্কে ভালো জানাশোনা ছিলো। আমার ভারত সফরের পরিকল্পনার কথা শুনে সে বললো, "ভারতীয়রা এক মজার উচ্চারণে ইংরেজি বলে। ঠকবাজি তাদের খুব পছন্দের শব্দ।" তাই দিল্লীর উদ্দেশে আমার বিমান উড়াল দিতেই সমৃদ্ধ, গোলযোগপূর্ণ এবং কমডিন্যাদনার ভারত সফরে স্মরণে রাখলাম ঠকবাজি শব্দটা। আর সত্যি বলতে কি এ শব্দটা ব্যবহার করে ভালই উপকার পেয়েছিলাম। এক রেল স্টেশনের কেরানিকে বললাম, "আমি কল্পনাও করিনি ভাড়া এতো বেশি হতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে ঠকবাজি করছেন না। করছেন কি?" হেসে উঠে সে বললো, "না স্যার! এখানে কোনো ঠকবাজি চলে না। আপনার কাছ থেকে সঠিক ভাড়াই নেয়া হয়েছে।"

এবার এই দ্বিতীয়বার ভারত সফরে এসে আমি বেশ ভালোই জানতাম আমি কি চাই এবং কীভাবে সহজে এটা পাওয়া যাবে। আমার উপন্যাসটি লেখার জন্য আমি পাহাড়ী স্টেশনে বসতি গাড়লাম। অচিরেই নিজেকে এক প্রশস্ত বারান্দায় লেখার টেবিলে আবিষ্কার করলাম। আমার সামনে ছড়ানো ছিটানো নোট আর ধোঁয়া ওঠা এককাপ চা। আমার নিচেই সবুজ পাহাড়ে ঘিরে আছে কুয়াশা, কানে আসছে বানরের কিচির মিচির। আবহাওয়া বেশ চমৎকার। সকালে আর বিকেলে হাল্কা স্যুয়েটারেই চলে। দুপুরে হাতাকাটা জামাতেই যথেষ্ট। সুতরাং বৃহত্তর সত্যের স্বার্থে কলম হাতে হামলে পড়লাম উপন্যাসে পর্তুগালকে ফুটিয়ে তুলতে। এটা কি এক বাস্তবতায় বসে অন্য বাস্তবতাকে টেনে আনার প্রয়াস ছিলো না? স্মরণকে চটকে উপন্যাসের রস বের করা নয় কি এটা? এভাবে পারলে আমার আর পর্তুগালে যাবার দরকার কি?

আমি যেখানে থাকতাম সেটি পরিচালনা করতেন এক মহিলা। তিনি আমাকে শোনাতেন ভারতীয়রা কীভাবে ব্রিটিশদের তাড়ালো—সেই গল্প। দুপুরে এবং রাতে কী খাবো তা তিনিই নির্ধারণ করে দিতেন। লেখার দিন শেষ হলে আমি গড়ানো পাহাড়ের চা বাগানে হেঁটে বেড়াতাম।

অচিরেই দুঃখজনকভাবে উপন্যাসটি ফিকে হয়ে এলো এবং বলা যায় এটি কাশতে কাশতে মারা গেলো। এটা ঘটলো বোম্বের অদূরে এক ছোট্ট পাহাড়ী স্টেশন মাথেরানে। এখানে বানর থাকলেও চা বাগান ছিলো না। সদ্য লেখক হতে যাওয়া কারও জন্য এটা এক বড়ো ধাক্কা। আপনার বিষয়বস্তু এবং বাক্য বিন্যাস চমৎকার। আপনার উপন্যাসের চরিত্রগুলো এতো বাস্তব যে জন্ম সনদ থাকলে দিব্বি এদের আসল বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। পটভূমি এমনভাবে ছকেছেন যা চমৎকার, সহজ এবং টানে। আপনি গবেষণার কাজ সারলেন, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আবহাওয়াগত, রান্না সংক্রান্ত তথ্য যোগাড় করলেন, যা আপনার উপন্যাসকে দিলো বিশ্বাসযোগ্যতা। সংলাপগুলো যথার্থ বেগবান এবং খই ফোটার মতো স্বতঃস্ফূর্ত। বর্ণনার চিত্রায়ন বর্ণিল, দ্বন্দ্ব-সংঘাত যথার্থ এবং বিস্তারিত বলাও হলো। এভাবে এক মহান কাহিনী দাঁড় করালেন।—কিন্তু এসব আপনার উপন্যাসে কোনো মাত্রাই যোগ করতে পারবে না। এক সময় দেখবেন স্মরণের যে কষ্ট কল্পনা আপনার কানে কানে ফিসফিসিয়ে আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছিলো তা এক সময় বিস্মরণের অতলে হারিয়ে গেলো। সোজা এবং নির্জলা সত্য হচ্ছে—এটা আপনি আর চালাতে পারবেন না। স্মৃতি হাতড়ে উপাদান সংগ্রহের জন্য মাথার ছেড়াই সার হবে।

মাথেরান থেকে আমি আমার পণ্ড উপন্যাসের নোট ডাকে পাঠালাম। আমি এগুলো সাইবেরিয়া এবং বলিভিয়ার দুটি প্রকাশনার ঠিকানায় ফেরত ঠিকানাসহই পাঠালাম। ডাক কর্মচারি যখন খামে টিকেট লাগিয়ে ওগুলো চিঠির বাক্সে ভরলো আমি হতাশায় বসে পড়লাম। নিজেকে বললাম, 'এখন? এখন কি করবে তলস্তয়? আর কোন চমৎকার ধারণা তোমার ভেতরে জাগবে কি, যা তোমাকে আবার জীবন্ত করে তুলবে?"

তখনও সামান্য টাকা অবশিষ্ট ছিলো এবং ছিলাম ক্লান্তিহীন। পোস্ট অফিস থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং ঠিক করলাম দক্ষিণ ভারতে একটু ঘুরে আসবো। কেউ কি করি জিজ্ঞেস করলে আমি নিজেকে ডক্টর বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতাম। ঔৎসুক্য নিরসনে এটা জাদুর মতো কাজ করতো। রাস্তায় বাস দুর্ঘটনায় পড়বো এমন একটা নিশ্চিত ধারণা ছিলো। সে ক্ষেত্রে চারদিকে যখন আহতদের আহাজারি, সবাই এসে নিশ্চয়ই একজন ডাক্তার বলে আমাকে চেপে ধরবে। সেক্ষেত্রে না হয় বলবো আমি 'ব্যাচেলর অব ফিলোসফি।'

ভ্রমণপথে যেখানেই লেখক পরিচয় দিয়েছি, আমাকে শুনতে হয়েছে, "আপনি লেখক? সত্যি? আপনার লেখার মতো একটা গল্প আছে আমার কাছে।" বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেতো এগুলো আটপৌরে সত্য ঘটনা, স্বল্প পরিসর এবং ক্ষণজীবী।

আমি পন্ডিচেরিতে পৌছলাম। এটি মাদ্রাজের দক্ষিণে স্বায়ত্তশাসিত এক অঞ্চল, তামিলনাড়ুর উপকূলে। জনসংখ্যা এবং আকারের দিক থেকে এটি ভারতের অন্য এলাকার সাথে একেবারেই সংগতিহীন। বরং কানাডার প্রিন্স এডুয়ার্ড দ্বীপের সাথে অনেক মিল। কিন্তু ইতিহাস এদের পৃথক করে রেখেছে। পন্ডিচেরি একসময় কিছুটা উদার ফরাসী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো। ফরাসীরা ব্রিটিশদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও হাতে গোনা অল্প কয়েকটি বন্দরই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলো। প্রায় তিনশ' বছর এরা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারা পন্ডিচেরি ছাড়ে ১৯৫৪ সালে। তারা রেখে যায় সুন্দর সাদা দালান, চওড়া রাস্তা যার মোড়গুলো সমকোণের। রাস্তাগুলোর নামও তাদের স্মৃতি বহন করে। যেমন—রু ডি লা মেরিন এবং রু সেইন্ট-লুইস এবং কেইপিস্—ক্যাপস পুলিশদের জন্য।

একদিন নেহরু স্ট্রীটে 'ইন্ডিয়ান কফি হাউজে' বসে আছি। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ দেয়াল এবং উঁচু ছাদ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। এর টেবিলগুলো বর্গাকৃতির, এবং প্রতিটি টেবিলে চারটি করে চেয়ার পাতা। আপনি যে কোনো টেবিলে যে কারও সাথে বসতে পারেন। এখানকার কফি খুব মজার এবং এখানে ফ্রেন্স টোস্ট পাওয়া যায়। আড্ডা দেয়ার লোক এখানে সব সময়ই মেলে। আমারও জুটে গেলো একজন। বেশ প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল দৃষ্টির মাঝবয়সী লোকটির মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা। আমি তাকে জানালাম কানাডায় খুব শীত পড়ে এবং এর অনেক জায়গায়ই লোকে ফরাসী ভাষায় কথা বলে। আর বললাম ভারত আমার নানা কারণেই প্রিয় জায়গা। একজন মিষ্টিভাষী ভারতীয় এবং ফিরে যাবার জন্য তল্পী গোছানো এক প্রবাসীর মধ্যে খুচরো আলাপ চলতেই থাকলো। আমি কি করি, জানতে পেরে তার চোখ দুটো বড়ো হয়ে গেলো এবং মাথা দুলতে থাকলো। যাবার সময় হলো। আমি হাত তুলে ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিল দিতে ইশারা করলাম।

ঠিক তখনি বয়স্ক লোকটি বলে উঠলো, "আমি একটি গল্প জানি, যা আপনাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তুলবে।"

আমার মাথা দোলানো বন্ধ হয়ে গেলো। মনে একটু সন্দেহ জন্মালো। একি জেহবার কোনো সাক্ষী আমার দুয়ারে কড়া নাড়ছে? "আপনার এ গল্প কি দুই হাজার বছর আগের রোমান সাম্রাজ্যের কোনো প্রত্যন্ত এলাকার?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না।"

সে কি কোনো মুসলমান ধর্ম প্রচারক? "এটা কি সপ্তম শতাব্দীর কোনো ঘটনা?"

"না, না। এ কাহিনীর শুরু এখানেই, এ পন্ডিচেরিতেই, ঠিক কয়েক বছর আগেই। আর আমি খুশির সাথে জানাচ্ছি যে এ কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে আপনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশেই।"

"এবং এ কাহিনী আমার ভেতর ঈশ্বর বিশ্বাস জন্মাবে?"

"হ্যাঁ।"

"এটা কি অনেক লম্বা কাহিনী?"

"এতো লম্বা নয় যে আপনি এর শেষে যেতে পারবেন না।"

ওয়েটার এলো। এক মুহূর্ত দ্বিধা হলো। তারপর আরও দু'পেয়ালা কফির ওয়ার্ডার দিলাম। আমরা পরিচিত হলাম। তার নাম ফ্রান্সিস আদিরুপস্বামী। "দয়া করে বলুন দেখি আপনার গল্প"—বললাম আমি।

"আপনাকে কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে," উত্তরে বললেন তিনি।

"মনোযোগ দিয়েই শুনবো। বলুন।" আমি নোটখাতা আর কলম বের করলাম।

"আচ্ছা বলুন, আপনি কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেছেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি কালই গিয়েছিলাম।"

"আপনি কি খেলনা ট্রেনের রেললাইন দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

"বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্য ট্রেনটা এখনও প্রতি রবিবার চলে। কিন্তু একসময় এটা রোজ ঘন্টায় দু'বার করে চলতো। আপনি কি এর স্টেশনগুলোর নাম জেনেছেন?"

"একটার নাম তো রোজভিল। এর ঠিক ডানেই গোলাপ বাগান।"

"ঠিক তাই। আর অন্যটা?"

"আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"সাইনবোর্ডটা এখন নামিয়ে ফেলা হয়েছে। ওই স্টেশনটাকে এক সময় জু-টাউন বলা হতো। খেলনা ট্রেনটির দুটি স্টপেজ ছিলো—রোজভিল এবং জু-টাউন। এক সময় পন্ডিচেরি বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি চিড়িয়াখানা ছিলো।"

সে বলে যেতে থাকলো। আমি পয়েন্টগুলো টুকে নিতে থাকলাম। "আপনি তার সাথে কথা বলে নিতে পারেন।" সে কাহিনীর নায়ককে নির্দেশ করে বললো। "আমি তাকে খুব ভালো করে চিনি। সে এখন একজন পরিণত মানুষ। আপনি তাকে প্রশ্ন করে সবকিছু জেনে নিতে পারেন।"

পরে টরেনটোতে টেলিফোন গাইডের ৯ কলাম প্যাটেলের মাঝ থেকে তাকে, মানে গল্পের নায়ককে খুঁজে বের করলাম। যখন তার নম্বরে ডায়াল করলাম, উত্তেজনায় আমার বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করছিলো। ও প্রান্তে যে কথা বলে উঠলো তার কানাডিয়ান উচ্চারণে ভারতীয় টান স্পষ্ট। যেন বাতাসে ধূপের ঘ্রাণ পাচ্ছি। "এটা অনেকদিন আগের কথা," সে ওপ্রান্ত থেকে বললো। সে আমাকে সাক্ষাত দিতে রাজি হলো। আমরা অনেকবার মিলিত হলাম। সে আমাকে ডায়েরিটা দেখালো—যেটা সে ঘটনার সময় টুকে রেখেছিলো। সে আমাকে খবরের কাগজের হলুদ হয়ে যাওয়া কাটিংগুলো দেখলো যা তাকে ঐ সময়ে বিখ্যাত করে তুলেছিলো। সে আমাকে তার গল্প বললো। সে গল্প বলার সময় আমি এটা নোট করছিলাম। প্রায় এক বছর পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি জাপানী যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে একটি টেপ এবং রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই টেপ শুনে আমি মি. আদিরূপস্বামীর সাথে একমত হলাম যে এ কাহিনী যে কারও মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে দেবে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে মি. প্যাটেল তার পুরো কাহিনী উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছেন,—তার কণ্ঠে এবং চোখের ভাষায়। কোথাও ভুল হলে বা অসঙ্গত মনে হলে তার দায় আমার।

অনেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। মি. প্যাটেলের কাছে তো অবশ্যই—তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রশান্ত মহাসাগরের সমান। আমি আশা করি তার গল্প আমি যেভাবে বলেছি তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না। গল্পটা আমার ভেতর শুরু করে দেবার জন্য মি. আদিরূপস্বামীকে ধন্যবাদ। গল্পটার ইতি টানার জন্য তিনজন পেশাজীবীর কাছে আমি ঋণী : মি. কাজুহিকো ওডা, আগে যিনি অটোয়ায় জাপানী দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন; ওইকা শিপিং কোম্পানির মি. হিরোশি ওতানার; মি. তোমিহিরো ওকামোতো, যিনি জাপানী যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। জীবনের আলো জ্বালার জন্য মি. মসিয়ের স্কিলিয়ার আমি ঋণী। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই কানাডার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, 'কানাডা কাউন্সিল ফর আর্টস'কে যাদের অনুদান ছাড়া এ কাহিনী সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, যেমনটি সম্ভব হয়নি ১৯৩৯ সালের পর্তুগালকে নিয়ে লেখা। আমরা নাগরিকেরা যদি আমাদের শিল্পীদের সহযোগিতা না করি তাহলে তো আমাদের কল্পনাকে রসহীন রুক্ষ বাস্তবতার বেদীতেই মাথা কুটে মরতে হবে। আর এতে আমাদের কোনো কিছুতেই বিশ্বাস জন্মাবে না—শুধু বাজে স্বপ্নই দেখে যেতে হবে।

সূচিপাতা

প্রথম ভাগ
টরেনটো এবং পন্ডিচেরি ৯

দ্বিতীয় ভাগ
প্রশান্ত মহাসাগর ৬৭

তৃতীয় ভাগ
বেনিটো জুয়ারেজ ইনফারমারি, টোমাটলান, মেক্সিকো ১৬১

প্রথম ভাগ

টরেনটো এবং পন্ডিচেরি

১

আমার ভোগান্তি আমাকে বিষণ্ন এবং হতাশ করে তুললো।

কেতাবি শিক্ষা এবং স্থির, মনোযোগী আধ্যাত্মিক অনুশীলন আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিলো। আমি আমার মনোবল ধরে রাখলাম। লোকে এটাকে আমার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফসল বলেই মনে করে থাকবে।

উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বেরুনোর এক বছর পর আমি টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই এবং সেখান থেকে দ্বৈত সাফল্য নিয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করি। আমার এই সফলতা ছিলো ধর্ম শিক্ষা এবং প্রাণিবিদ্যায়। আমার চতুর্থ বর্ষের ধর্ম শিক্ষার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিলো সৃষ্টি রহস্য বিষয়ক ইসাক লুরিয়ার তত্ত্ব। ইসাক লুরিয়া ছিলেন সাফেডের ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত। তিনি ছিলেন সেই ইহুদী পণ্ডিতদেরই একজন যাঁরা বাইবেলের গুপ্ত অর্থ উদ্ধার করেছিলেন। আমার প্রাণিবিদ্যার গবেষণার বিষয় ছিলো তিন আঙুল বিশিষ্ট স্লথের থায়রয়েড গ্রন্থির কার্যাবলীর বিশ্লেষণ। গবেষণার জন্য আমি স্লথকে বেছে নিয়েছিলাম এর আচরণের জন্য। স্লথ হচ্ছে শান্ত, নিরুপদ্রব, অন্তর্দর্শী প্রাণী, যা বিধ্বস্ত এই আমাকে সান্ত্বনা যুগিয়েছিলো।

দু'ধরনের স্লথ দেখতে পাওয়া যায়। সামনের পায়ের আঙুলের সংখ্যা বিচারে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এক ধরনের স্লথের সামনের পায়ে দুটি আঙুল থাকে। অন্য ধরনের স্লথের থাকে তিনটি আঙুল। অবশ্য পিছনের লুকানো থাবায় সব স্লথেরই তিনটি করে নখর থাকে। এক গ্রীষ্মে আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো ব্রাজিলের সিটুতে অবস্থিত বিষুবীয় জঙ্গলে তিন আঙুলের স্লথ পর্যবেক্ষণের। এটি অত্যন্ত কৌতূহল জাগানিয়া প্রাণী। এর একমাত্র এবং আসল স্বভাব হচ্ছে আলসেমি। এরা দিনে গড়ে বিশ ঘন্টা ঘুমায় বা বিশ্রাম করে। আমাদের গবেষণা দল দিন আঙুলের পাঁচটি স্লথের ঘুম কাতরতা পরখ করে দেখে। আগ-সন্ধ্যায় যখন এরা ঘুমিয়ে পড়ে, উজ্জ্বল লাল প্লাস্টিকের থালায় পানি ভরে এদের মাথায় স্থাপন করা হয়। পরদিন সকালে দেখা গেলো পানিসহ থালার অবস্থান তেমনই আছে। শুধু থালার পানিতে দেখা গেল পোকা কিলবিল করছে। সূর্যাস্তের সময় স্লথেরা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। অবশ্য এখানে ব্যবহৃত 'ব্যস্ত' শব্দটিকে চরম শিথিলতা হিসেবেই গণ্য করতে হবে! বৃক্ষ শাখায় বিচরণকালে এদের মাথা থাকে নিচের দিকে আর পা উপরের দিকে। সাধারণত তখন এদের গতি থাকে ঘন্টায় ৪০০ মিটার। মাটিতে এরা এক গাছ থেকে আরেক গাছে যায় হামাগুড়ি দিয়ে। উদ্দীপ্ত থাকলে এদের গতি থাকে ঘন্টায় ২৫০ মিটার, যা একটি উদ্দীপ্ত চিতার গতির চেয়ে ৪৫০ গুণ মন্থর।। উদ্দীপ্ত না থাকলে স্লথের এই গতি কমে দাঁড়ায় ঘন্টায় ৪ থেকে ৫ মিটারে।

বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে এই তিন আঙুলের শ্লথের তেমন কোন ধারণা নেই। এদের আচরণ সূত্রবদ্ধ করার জন্য বীব (১৯২৬) এক মজার কেল পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। ২ থেকে ১০ পর্যন্ত দাগ আঁকা এই স্কেলে ২ দিয়ে অস্বাভাবিক মন্থরতা এবং ১০ দিয়ে চরম গতিশীলতাকে বোঝানো হয়। তিনি শ্লথের স্বাদ, স্পর্শ এবং দৃষ্টিশক্তি দেখিয়েছেন স্কেলের ২-এর দাগে এবং ঘ্রাণশক্তি ৩-এর দাগে। আপনি যদি কোন জঙ্গলে তিন আঙুলের শ্লথের দেখা পান, দুই-তিনটি গুঁতো মারার পর হয়তো এটিকে জাগাতে পারবেন। এটি তখন ঘুম ঘুম চোখে চারদিকে তাকাবে আপনার দিকে ছাড়া। উল্লুকের মতো যার দৃষ্টি ঝাপসা সেই শ্লথ কেন এভাবে চারদিকে তাকায় তা বোধগম্য নয়। শোনার ক্ষেত্রে শ্লথ অতোটা কালা নয়, যতোটা সে শুনতে অনীহ। বীবের তথ্য অনুযায়ী ঘুমন্ত বা আহাররত শ্লথের খুব কাছে গিয়ে বন্দুক ফোটালেও এদের খুব অল্পই প্রতিক্রিয়া হয়। আর শ্লথের অন্যসব ইন্দ্রিয়ের চাইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটু উন্নত হলেও তা আহামরি কিছু নয়। বলা হয়ে থাকে এরা শুঁকে শুঁকে ক্ষয়প্রাপ্ত ও ঝুরঝুরে ডাল পরিহার করে চলে কিন্তু বুলক (১৯৬৮) জানান ঝুরঝুরে ডাল আঁকড়ে চলার সময় শ্লথেরা প্রায়ই মাটিতে পড়ে যায়।

আপনি হয়তো এখন জানতে চাইবেন এরা কীভাবে বেঁচে থাকে।

স্পষ্টতই এরা খুব ধীর প্রকৃতির। ঘুম কাতরতা এবং শ্লথতাই এদের জাগুয়ার, অসিলট, লোভী ঈগল এবং আনাকোন্ডার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকে। শৈবাল-যেগুলো শুকনো মওসুমে বাদামী এবং বর্ষায় সবুজ থাকে তার সাথে শ্লথের লোম এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে, প্রাণীটিকে শ্যাওলা এবং পাতার সাথে একাকার হয়ে সাদা পিঁপড়া বা কাঠবেড়ালির বাসার মতো দেখায়, এমন কি অনেক সময় এদের গাছেরই একটি অংশ ছাড়া কিছুই মনে হয় না।

পরিবেশের সাথে একাকার হয়ে শ্লথের শান্ত এবং তৃণভোজী জীবনযাপন করে। টিরলার (১৯৬৬) জানান, "একটি সুস্বভাবের হাসি সব সময় এদের ঠোঁটে লেগে থাকে।" আমি এই হাসি নিজ চোখে দেখেছি। মানুষের স্বভাব এবং ভাবনা আমি জীবজন্তুর সাথে এক করে দেখাতে চাই না। কিন্তু ব্রাজিলে থাকাকালীন ঐ এক মাসে আমি বহুবার শ্লথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেছি আমি যেন উল্টো হয়ে থাকা গভীর ধ্যানমগ্ন এক রোগীকে দেখছি বা প্রার্থনারত কোন দরবেশকে দেখছি যে পার্থিব সব ঝুট ঝামেলার উর্ধ্বে এবং যা আমার বৈজ্ঞানিক যৌক্তিক বিশ্লেষণেরও আওতামুক্ত।

কখনও কখনও আমি আমার অধ্যয়নের বিষয়বস্তুসমূহ গুলিয়ে ফেলতাম। আমার ধর্মীয়-শিক্ষার অনেক সহপাঠীই অজ্ঞেয়বাদকে তালগোল পাকিয়ে ফেলতো, যারা শুধু কার্যকারণকেই মানতো, বোকার মতো কেবল উজ্জ্বলতা দিয়েই সোনাকে বিচার করতো—আমার তখন মনে পড়ে যেতো তিন আঙুলের শ্লথকে। এই শ্লথগুলো ছিলো জীবনের অলৌকিকত্বের চমৎকার উদাহরণ—যা আমাকে ঈশ্বরের কথা মনে করিয়ে দিতো।

নিজের সম্বন্ধে বলতে হলে বলতে হয়, ছাত্র হিসেবে আমি খুব ভালো ছিলাম। সেন্ট মাইকেল্স কলেজে চার বছর আমি একনাগাড়ে শীর্ষ সারিতে ছিলাম। আমি প্রাণিবিদ্যার সম্ভাব্য প্রত্যেক ছাত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলাম। যদিও ধর্ম শিক্ষায় আমি কোন পুরস্কার পাইনি। কারণ ধর্মীয় শিক্ষায় এমন কোন পুরস্কার দেয়ার রেওয়াজ ছিলো না। কেননা এটা বিশ্বাস করা হতো মরণশীল কেউ ধর্মীয় শিক্ষার পুরস্কার দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আমি গবর্নর জেনারেলের শিক্ষা পদক, টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব সর্বোচ্চ পুরস্কার হয়তো পেয়েই যেতাম।

কিন্তু স্বল্পসংখ্যক স্বনামখ্যাত কানাডিয়ানও এটা অর্জন করতে পারেনি। সেখানে এই গোমাংসভোগী গোলাপী আভার সদাহাস্য বালক এটা কি করে আশা করতে পারে!

সামান্য পরিমাণে এখনও আমি বেদনাক্লিষ্ট। যখন আপনি ব্যাপকভাবে ভোগান্তির শিকার হবেন, অতিরিক্ত যে কোন ব্যথাই তখন সুতীব্রভাবে অনুভূত হবে। আমার জীবনটা ইউরোপীয় চিত্রকর্মের অনিবার্য মৃত্যুপথযাত্রীর মতো। একটি নরখুলি সর্বদাই যেন দাঁত কেলিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো মানবীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূর্খতার কথা। আমি এই নরখুলিকে বিদ্রূপ করলাম।

এটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছো। তুমি জীবনে বিশ্বাস না করতে পারো কিন্তু আমি মৃত্যুতে বিশ্বাস করি না। ভাগো!" খুলিটি চাপা হাসি দিয়ে আরও কাছে সরে এলো। কিন্তু এটা আমাকে ভড়কে দিতে পারলো না। জীবনকে মৃত্যু এমনভাবে তাড়া করে বেড়ায় যে এটা যেন জৈব প্রয়োজন নয় বরং এর শত্রু। জীবন এতো সুন্দর যে মৃত্যুও এর প্রেমে পড়ে যায়। কোন ঈর্ষা এবং আধিকারিক প্রেমও একে আকড়ে ধরে। কিন্তু জীবন বিস্মরণের ওপর দিয়ে হাল্কাভাবে চলে যায়, অগুরুত্বপূর্ণ একটি কি দু'টি জিনিস শুধু রেখে যায়, শুধু হতাশা এক কালো মেঘ হয়ে বিরাজ করে। এই গোলাপী আভার ছেলেটি রোডস বৃত্তি পর্যদের কৃপাও পেয়েছিলো। আমি তাকে ভালোবাসি এবং আশা করি তার অক্সফোর্ডের জীবন সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে। সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর কৃপা হলে অক্সফোর্ড হবে আমার তালিকায় পঞ্চম নগরী যেখানে আমি মৃত্যুর আগে যেতে চাই, মক্কা, বেরানসি, জেরুজালেম এবং প্যারিসের পরে।

আমার কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু বলব এটি হচ্ছে একটি ফাঁসের গেঁরো—একটু অসাবধান হলেই যেখানে ঝুলে পড়তে হয়।

আমি কানাডাকে ভালোবাসি। যদিও আমি ভারতের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হই—এর খাদ্য, দেয়ালে বিচরণরত এর গিরগিটি, রুপালি পর্দার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, রাস্তায় চরে বেড়ানো গরু, কাকের কা-কা, এমনকি ক্রিকেট নিয়ে আড্ডা—তবু আমি কানাডাকে ভালোবাসি। এ এক বিশাল দেশ, যদিও এখানে খুব শীত। কারুণাময়, জ্ঞানী খারাপ কেশবিন্যাসের বাসিন্দারা এখানে বাস করে। যাই হোক আমার বাড়ি অর্থাৎ পন্ডিচেরি ফিরে যাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি।

রিচার্ড পার্কার আমার সাথে থেকে গেলো। আমি তাকে কখনও ভুলিনি। কোন্ দুঃসাহসে বলি আমি তার সঙ্গবঞ্চিত হচ্ছি! কিন্তু আসল ঘটনা তা-ই। আমি তার সঙ্গবঞ্চিত। আমি এখনও তাকে স্বপ্ন দেখি। যদিও এর বেশির ভাগই দিবাস্বপ্ন, কিন্তু দিবাস্বপ্ন থাকে ভালোবাসার রঙে রাঙানো। মানব হৃদয়ের এই এক আশ্চর্যের দিক। আমি এখনও বুঝতে পারি না এমন অনানুষ্ঠানিকভাবে কেন সে আমাকে ছেড়ে গেলো—কোন বিদায় সম্ভাষণ ছাড়াই, এমনকি একবারও পিছনে না তাকিয়ে! সেই বেদনা আমার হৃদকে ফালি-ফালি করে দিচ্ছে।

ম্যাক্সিকোর ডাক্তার এবং নার্সরা আমার প্রতি ছিলো অত্যন্ত দরদী। এমনকি রোগীরাও। ক্যান্সার এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগীরা এবং তাদের পরিবার একবার যারা আমার কথা শুনেছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এবং হুইল চেয়ারে করে আমাকে দেখতে এসেছে যদিও তারা কেউ ইংরেজি ভাষী নয় এবং আমিও স্প্যানিশ ভাষী নই। তারা সহাস্যে আমার সাথে করমর্দন করেছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং উপহার হিসেবে খাদ্য এবং পোশাক রেখে গেছে বিছানায়। তারা আমাকে অবাধে হাসিয়েছে এবং কাঁদিয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলাম। এমনকি দুঃসহ যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, টালমাটাল অবস্থা এবং সাধারণ দুর্বলতা কাটিয়ে দু'-এক কদম হাঁটতেও পারলাম। রক্ত

পরিষ্কায় দেখা গেলো আমি রক্তশূন্যতায় ভুগছি এবং আমার সোডিয়ামের মাত্রা উচ্চ এবং পটাসিয়ামের নিম্ন। আমার শরীরে পানি জমলো এবং পা ভীষণ ফুলে গেলো। দেখে মনে হচ্ছিলো যেন হাতির পা জুড়ে দেয়া হয়েছে আমাকে। আমার মূত্র গাঢ় হলুদ থেকে বাদামী রঙ ধারণ করলো। দু'-এক সপ্তাহ পরেই অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই আমি হাঁটতে পাবলাম এবং জুতাও পরতে পারলাম, যদিও ফিতা বাঁধা গেলো না। আমার চামড়ার ঘা সেরে গেল যদিও তখনও ঘাড়ে এবং পাছায় ঘা ছিলো।

প্রথমবার পানির ট্যাপ খুলতেই ঘটলো এক বিপত্তি। এর হিস হিস আওয়াজ, বিধ্বস্তকারী প্রচণ্ড জলধারা আমাকে এমনই হতচকিত করলো যে আমার পা দু'টি ভেঙে পড়লো এবং আমি নার্সের বাহুতে এলিয়ে পড়লাম।

প্রথমবার কানাডার এক ভারতীয় রেস্তরাঁয় গিয়ে আমি আমার আঙুল ব্যবহার করেছিলাম। ওয়েটার আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বললো, "এইমাত্র নৌকা থেকে নেমে এসেছো, না?" লজ্জায় আমি রক্তশূন্য-সাদা হয়ে উঠলাম। আমার আঙুল, কয়েক সেকেন্ড আগেও যা আমার মুখের সামনে সুস্বাদু খাদ্য তুলে ধরছিলো তার দন্তানার ভিতর নোংরা হয়ে উঠলো। ধরাপড়া দুর্বৃত্তের মতো তারা জমে গেলো। আমি এটি আর চাটার সাহস পেলাম না। অপরাধীর মতো আমি এগুলো ন্যাপকিনে মুছলাম। তার কথা আমাকে কীভাবে বিদ্ধ করেছিলো সে সম্বন্ধে ওয়েটারের কোন ধারণা ছিলো না। তার কথাগুলো যেন পেরেকের মতো আমার মাংসে বিদ্ধ হচ্ছিলো। আমি ছুরি এবং কাঁটাচামচ তুলে রাখলাম। আমি আর কখনো এগুলো ব্যবহার করিনি। আমার হাত কাঁপছিলো। আমার সামবার তার স্বাদ হারালো।

২

তিনি স্কারবোরোতে বাস করেন। একজন ছোটখাটো ছিপছিপে মানুষ। উচ্চতা পাঁচ ইঞ্চির বেশি হবে না। কালো চুল, কালে চোখ। জুলফির উপরে চুলে পাক ধরেছে। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। আকর্ষণীয় চেহারা, গায়ের রং কফি রঙের। আবহাওয়া একটু খারাপ হলেই শীতকালীন ফার লাগানো পারকা পরে ডিনারে আসেন। অভিব্যক্তিপূর্ণ অবয়ব। হাত নেড়ে দ্রুত কথা বলেন। কম কথা নয়। তিনি দ্রুত সামনে বাড়লেন ঃ

৩

একটি সুইমিংপুলের নামে আমার নাম রাখা হয়েছিলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার মা-বাবা কখনো আমাকে পানিতে নামাননি। ফ্রান্সিস আদিরুবাসামি নামের একজনের সাথে প্রথম থেকেই আমার বাবার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিলো। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের একজন ভালো বন্ধু।

আমি তাঁকে মামাজি ডাকতাম। আমার জন্মের আগে, যখন তিনি যুবক ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু। পুরো দক্ষিণ ভারতের তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু। সারা জীবনেই সাঁতার ছিলো তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার ভাই রবি একবার বলেছিলো, মামাজি যখন জন্ম নেন তিনি বাতাসে শ্বাস না নিয়ে পানিতে নিতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার তাই তাঁর পা দু'টি ধরে মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়েছিলো তাঁর জীবন বাঁচাতে।

"এতে কাজ হয়েছিলো!" হাত দু'টি মাথার ওপর প্রসারিত করে রবি বলেছিলো, "কাশির সাথে সে পেটের পানি বের করে ফেলেছিলো এবং বাতাসে শ্বাস নিতে শুরু করেছিলো। কিন্তু এতে তার শরীরের মাংস এবং রক্ত উপরের দিকে উঠে গিয়েছিলো। এ জন্যই তার বুক এমন সরু আর পা দু'টি হাড্ডিসার।"

আমি রবির কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। (রবি ছিলো নিষ্ঠুর পরিহাসকারী। প্রথম যেদিন সে আমার মুখের ওপর মামাজিকে মি. ফিস বলেছিলো আমি ওর বিছানায় কলার খোশা রেখে এসেছিলাম)।

এমনকি ষাটোর্ধ বয়সেও, যখন তাঁর শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে, জন্মের সময় শরীরের যে ভার উপরে উঠে গিয়েছিলো তা ঠেলে নিচে নামতে শুরু করেছে—তখনও তিনি রোজ অরবিন্দ আশ্রমের সুইমিংপুলে ত্রিশ চক্কর সাঁতার কাটতেন।

তিনি আমার মা-বাবাকেও সাঁতার শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁদের হাঁটুজলের বেশি নামাতে পারেননি। পানিতে নেমেই আমার বাবা-মা এমনভাবে হাত ছোড়াছুড়ি শুরু করতেন যেনো তাঁরা জঙ্গলে হাঁটছেন আর প্রাণপণে দু'হাতে লম্বা লম্বা ঘাস সরাচ্ছেন। রবি অবশ্য এ ব্যাপারে একেবারেই নিরুৎসাহী ছিলো।

আমি উৎসাহী শিষ্য হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত মামাজিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। মায়ের অনাগ্রহ সত্ত্বেও আমি যেদিন সাঁতারের বয়োপ্রাপ্ত হলাম, সৈকতের পানিতে নামিয়ে মামাজি তাঁর দু'বাহু প্রসারিত করে বললেন—"তোমার জন্য এই হচ্ছে আমার উপহার।" মামাজির দাবি অনুযায়ী তখন আমার বয়স ছিলো সাত বছর।

"এবং সে তখন তোমাকে প্রায় ডুবিয়েই মেরেছিলো"—মা পরে আমাকে বলেছিলেন।

আমি কিন্তু আমার সাঁতার-গুরুর প্রতি আস্থাশীল থাকলাম। আমি যখন সৈকতে পা ছড়িয়ে শুয়ে হাত দিয়ে বালু সরাতাম, শ্বাস নেয়ার জন্য মাথা তুলতাম তাঁর সাবধানী নজর আমাকে পাহারায় রাখতো। পানিতে নামিয়ে তিনি যখন আমাকে ধরে থাকতেন। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম। ডাঙার চাইতে এটা কষ্টসাধ্য ছিলো। কিন্তু মামাজি ছিলেন ধৈর্যশীল, তিনি আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে যেতেন।

যখন তিনি দেখলেন আমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, সৈকত দৌড়ানো, হৈচৈ, সবুজাভ নীল ঢেউয়ের ওপর সার্ফিয়ের ইতি টেনে সাঁতারের আসল পাঠ দিতে তিনি আমাকে অশ্রমের সুইমিংপুলে নিয়ে গেলেন।

পুরোটা শৈশবকাল সোম, বুধ এবং শুক্র সপ্তাহে এই তিনদিন ভোরে তাঁর সাথে আমাকে সুইমিংপুলে যেতে হতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে কিভাবে তিনি আমার সামনেই কাপড় ছেড়ে তার দেহ সৌষ্ঠবে আমাকে মুগ্ধ করে সাঁতারে নামতেন।

আমার নিজের বন্য আনন্দ ছিলো এরপর সমুদ্রে ফিরে যাওয়া। সেখানে ফুঁসে আসা ঢেউ এই ভারতীয় বালককে তাদের জলো আলিঙ্গনে টেনে নিতো।

যখন আমার বয়স তেরো, জন্মদিনে মামাজিকে আমার উপহার ছিলো পুরো দুই চক্কর
বাটারফ্লাই সাঁতার।

সাঁতার কাটা ছাড়াও ছিলো সাঁতারের গল্প। সাঁতারের গল্প বাবা খুব পছন্দ করতেন। সাঁতার
কাটতে তাঁর যতোটা অনাগ্রহ ছিলো সাঁতারের গল্পে ছিলো তাঁর তার চেয়ে বেশি আগ্রহ। ছুটির
দিনে তিনি সাঁতার বিদ্যার গল্পে মেতে থাকতেন—কর্মদিবসে যেমনটি মেতে থাকতেন
চিড়িয়াখানা নিয়ে। পানি ছাড়া জলহস্তি নিয়ন্ত্রণের চাইতে পানিসহ জলহস্তি নিয়ন্ত্রণ সহজ।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বদৌলতে মামাজি দু'বছর প্যারিসে পড়াশোনা করেছিলেন। এটা
১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন ফরাসীরা পন্ডিচেরিকে আয়ত্তে নিতে তৎপর
ছিলো, যেমনটি ব্রিটিশরা তৎপর ছিলো বাদবাকি ভারতকে আয়ত্তে নিতে। আমার ঠিক মনে
নেই মামাজি ঠিক কোন বিষয় নিয়ে পড়েছিলেন। এটা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন বিষয় হবে বলে
আমার ধারণা। একজন বড়ো বাক্যবাগিশ হয়েও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন কি নিয়ে তিনি
পড়েছিলেন এবং আইফেল টাওয়ার, লঁভিয়ের বা ক্যাম্পাস এলিসিঁসের ক্যাফের কথাও তিনি
ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত গল্প আবর্তিত হতো সুইমিংপুল এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা নিয়ে।
যেমন ধরা যাক নগরীর প্রাচীনতম পাইসাইন ডেলিগনি সুইমিংপুলের কথা। ১৭৯৬ সালে এটির
প্রতিষ্ঠা। খোলা প্রান্তরে এর অবস্থান যেখানে কুই ডি' অরসেতে প্রমোদতরী নোঙর করে
থাকতো, ১৯০০ সালের অলিম্পিকের ভেনু ছিলো এটি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থা কখনও
এ পুলকে অনুমোদন করেনি, কারণ এটি ছিলো মাপের চাইতে ছয় মিটারেরও বেশি বড়ো।

এ পুলের পানি সোজা সেইন থেকে আছাকা এবং গরম না করেই আনা হয়েছে। "এটা
ছিলো ঠাণ্ডা এবং নোংরা"—মামাজি বললেন। "এই পানি সমস্ত প্যারিস পেরিয়ে যথেষ্ট নোংরা
হয়ে এসেছে। পুলের লোকগুলো এটিকে এমন বিরক্তির করে তুলেছিলো যে কি বলবো!"
বিদ্রূপাত্মক ফিসফিসিয়ে তিনি আমাদের নিশ্চিত করলেন যে ব্যক্তিস্বাস্থ্যের বিচারে ফরাসীদের
রুচি খুব নিম্নমানের। "ডেলিগনিও খুব বাজে। সেন-এর আরেকটি পায়খানা বেন রয়াল—
বাজে। ডেলিগনিতে তো তারা কমছে কম মরা মাছ ছেঁকে ফেলতো।" তা সত্ত্বেও অলিম্পিক
পুল তো অলিম্পিক পুলই, এর মর্যাদাই আলাদা। যদিও এটা ছিলো মলকুণ্ড, মামাজি ডেলিগনি
সম্পর্কে বলার সময় অনুরাগের হাসি নিয়েই বলতেন।

পাইসাইন শ্যাটু ল্যান্ডন, রোভেট বা ডিউ বুলভার্দ ডিলা গেয়ারেও কিছুটা ভালো সুইমিংপুল
আছে। এগুলো ছিলো ছাদওয়ালা, ভূমিতে অবস্থিত এবং সারা বছর এটি খোলা থাকতো।
এগুলোর পানি আসতো আশপাশের ফ্যাক্টরির বাষ্পীয় শোধনাগার থেকে। আর তাই এগুলো
ছিলো পরিষ্কার এবং গরম। কিন্তু এই পুলগুলো তখনও ছিলো নোংরা এবং লোক গিজগিজে।
"সেখানে এতো জঞ্জাল আর থুথু ভাসতে থাকতো যে আমার মনে হতো জেলিফিসের মাঝ দিয়ে
সাঁতরাচ্ছি।"—চাপা হাসি দিয়ে বললেন মামাজি।

পাইসাইন হেবার্ট, লেড্রু-রোলিন এবং বাট-আক্স কেলিস, ছিল উজ্জ্বল, আধুনিক এবং
বিশিষ্ট পুল যেগুলোতে পানি সরবারহ করা হতো বিশেষ ধরনের কূপ থেকে। এতে কোন
পাম্পের প্রয়োজন হতো না। এগুলো মিউনিসিপাল মানসম্পন্ন ছিলো। সেখানে আরও ছিলো
পাইসাইন-দেস-টাওরেলস, যেটি নগরীর অন্যতম বড়ো সুইমিংপুল, ১৯২৪ সালের প্যারিস
গেমসে যেটি উদ্বোধন করা হয়েছিলো। সেখানে এমন আরও অনেক পুল ছিলো।

কিন্তু মামাজির দৃষ্টিতে পাইসাইন মলিটরের মতো এমন রাজকীয় গৌরবের সুইমিংপুল
প্যারিস, এমনকি সভ্য দুনিয়ার আর কোথাও ছিলো না।

"এটি ছিলো এমনই এক পুল যেখানে দেবতারাও হয়তো সাঁতরাতে পেরে নিজেদের ধন্য
মনে করতো। এখানে দু'টি পুল ছিলো—একটি ইনডোর, আরেকটি আউটডোর। দুটোই এতো
বড়ো—যেন ছোটখাটো একেকটি সাগর! ইনডোর পুলের দু'টি লেন নির্দিষ্ট যারা সাঁতরাতে
চায় তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এখানকার পানি এতো পরিষ্কার আর স্বচ্ছ যে আপনি এ দিয়ে
দিব্যি সকালের কফি বানিয়ে খেতে পারেন। এর চারদিকে রয়েছে কাঠের কাপড় বদলাবার
দোতলা কেবিন। আপনি নিচে তাকিয়ে সবাইকে এমনকি সবকিছুই দেখতে পারবেন। যে
পেটিরারা আপনি কোন ক্যাবিনে ঢুকলে চক দিয়ে চিহ্নিত করে তারা কৃশ এবং বৃদ্ধ অসুস্থ
মেজাজের হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ। কোন রকম হৈ-হট্টগোল, আহম্মকি তাদের বিরক্ত করতে পারে না।
এখানকার শাওয়ার থেকে উষ্ণ পানিন প্রক্ষিপ্ত হয়। এখানে রয়েছে উষ্ণ হওয়ার জন্য স্টিমরুম
এবং ব্যায়ামাগার।

বাইরের পুলটি শীতকালে স্কেটিং রিঙ্ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরও আছে একটি বার
একটি ক্যাফেটারিয়া,একটি সূর্যস্নানের ডেক এমনকি দু'টি কৃত্রিম সৈকত, যেখানে রয়েছে
সত্যিকারের বালু। পিতল, কাঠ, টাইল—এখানকার সবকিছুই চকচকে। এটি হচ্ছে...এটি
হচ্ছে...."

এটি হচ্ছে, একমাত্র পুল যার ব্যাপারে মামাজি একেবারে চুপ। এর স্মৃতি তাঁর মগজে
এমনভাবে গেঁথে আছে যে এর সম্বন্ধে বলতে গেলে মামাজি আর থামতে। পারে না।

মামাজি স্মরণ করেন আর বাবা দেখেন স্বপ্ন।

আর জন্মের পর এভাবেই আমার নামকরণ করা হয়। আমাদের পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ
সদস্য পৃথিবীর আলো দেখলো, পরিবারে যুক্ত হলো আর এক নাম, রবির তিন বছরের ছোট—
পাইসাইন মলিটর প্যাটেল।

৪

একটি ছোট্ট অঞ্চল যখন আমাদের মনোরম পুরনো দেশের সাথে যুক্ত হলো তখন এই
প্রজাতন্ত্রের বয়স সাত। ১৯৫৪ সালের ১ নভেম্বর পন্ডিচেরি ভারতের সাথে যুক্ত হলো। একটি
নাগরিক অর্জন আরেক অর্জনকে ডেকে আনে।

পন্ডিচেরির বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি অংশে বিনা ভাড়ায় ব্যবসার সুযোগ দেয়া হলো।
আর এভাবেই ভারত পেল আধুনিক, জীববিদ্যার সুসংবদ্ধ রীতি অনুসরণে পরিকল্পিত এক
তরতাজা নতুন চিড়িয়াখানা।

এটা ছিলো এক বিশাল চিড়িয়াখানা। এতো বড়ো ছিলো যে পুরোটা ঘুরে দেখতে
রেখগাড়ির প্রয়োজন। কিন্তু এখন এটা একেবারেই ছোটো। এটা ছিলো উষ্ণ এবং আর্দ্র এলাকা,
চারদিক চকচকে রোদ, নানা বর্ণ। সর্বত্র বৃক্ষ, গুল্ম আর লতার প্রাচুর্য। পিপুল, গুলমহর, বনে
রঙের আগুন লাগানো লাল শিমুল, জাকারন্ধ, আম, কাঁঠাল চেনা অচেনা আরও কতো গাছ!
এখানে সেখানে বেঞ্চ। তার ওপর কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে। কোনো কোনোটিতে জোড়ায় জোড়ায়
যুবক-যুবতি। বড়ো বড়ো গাছ দেখতে দেখতে হঠাৎ আপনার চোখে পড়বে গলা উঁচু করে দুটি

জিরাফ আপনাকে পরখ করছে। চমকের এখানেই শেষ নয়। পরমুহূর্তেই আপনাকে চমকে দেবে একদল বড়ো বানরের চিৎকার। এগুলো ছাপিয়ে একসময় শুনতে পারবেন অদ্ভুত পাখির ডাক। পয়সার বিনিময়ে আপনাকে ঘূর্ণায়মান দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। আরও এগিয়ে যান। দেখতে দেখতে পাবেন একটি নিচু দেয়াল। নিশ্চয়ই এটা ভারতীয় গণ্ডারের অগভীর খাদ নয়। বরং ঘাড় ঘুরিয়েই দেখতে পাবেন হাতি। কী বিশাল প্রাণী! পুকুরে দেখতে পাবেন জলহস্তি ভাসছে। যতোই তাকাবেন ততোই দেখবেন আপনি যে এখন চিড়িয়াখানার নগরে!

পন্ডিচেরিতে আসার আগে বাবা মাদ্রাজে এক বড়ো হোটেল চালাতেন। প্রাণিজগতের ওপর ঐকান্তিক আগ্রহ তাকে চিড়িয়াখানার ব্যবসায় টেনে আনলো। হোটেল ব্যবসা থেকে চিড়িয়াখানার ব্যবসায় আসা কোন স্বাভাবিক পরিবর্তন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই একটি চিড়িয়াখানা চালানো কোনো হোটেল ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের শামিল। কিন্তু ভাবুন তো একটি হোটেলের পরিবেশ—গেস্টরা রুম ছাড়তে চায় না। তারা শুধু লজিং চায় না বোর্ডার হতে চায়। দর্শনার্থীরা তাদের কাছে আসতেই থাকে! যাদের কেউ কেউ হট্টগোল করে, কেউবা দুষ্কৃতকারী। বারান্দায় এরা হেলেদুলে এমন ধীরে ধীরে পায়চারি করে যে, ভদ্র কাউকে বারান্দায় যেতে হলে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে হয়। কাউকে তার রুম পরিষ্কার করতে হলে অপেক্ষা করে থাকতে হয়—যতক্ষণ না এই দর্শনার্থীরা বিদায় না হয়। আর রুম পরিষ্কার এক মহা ঝকিক। কারণ মেহমানরা বেশিরভাগই অস্বাস্থ্যকর এবং মদ্যপ। প্রত্যেক মেহমানেরই নির্দিষ্ট খাবার চাই। আর ওয়েটার ঠিকমতো খাবার সরবরাহ করছে না—এ অভিযোগ তো হামেশাই শুনতে হয়। এরা কখনও টিপসও দেয় না। অনেকে আবার মেতে যায় যৌনলীলায়। আপনিই বলুন এই ধরনের মেহমান আপনি বাড়িতে স্বাগত জানাবেন? পান্ডিচেরির চিড়িয়াখানা ছিলো মি. সন্তোষ প্যাটেলের আনন্দের উৎস এবং অনেক সময় মাথা ব্যথার কারণ। মি. সন্তোষ প্যাটেল—পন্ডিচেরি চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতা, মালিক, পরিচালক, তিপ্পান্নজন কর্মচারীর প্রধান এবং আমার বাবা।

আমার কাছে এটি ছিলো ভূ-স্বর্গ। সেই চিড়িয়াখানায় বেড়ে ওঠার সমধুর স্মৃতি ছাড়া এখন আমার কী-ইবা আছে! সেখানে আমার জীবন ছিলো রাজকুমারের মতো। মহারাজার ছেলেরও কি এমন বিশাল শৌখিন খেলার মাঠ ছিলো? কোন্ রাজমহলের এমন বন্য প্রাণীর সংগ্রহ আছে? সিংহ-এ্যালার্ম ঘড়ির গর্বিত মালিক ছিলাম আমি। এরা কোন সুইস ঘড়ি ছিলো না, এরা সত্যিকারের সিংহ। সিংহগুলো ভোর পাঁচটা ত্রিশ থেকে ছয়টার মধ্যে গর্জন করে উঠতো। প্রাতঃরাশের সময় নিয়ন্ত্রিত হতো বানরের চ্যাচানি, পাহাড়ী ময়না এবং কাকাতুয়ার কাকলিতে। আমি স্কুলে যেতাম শুধু মায়ের নয়, ভোঁদড়ের উজ্জ্বল চোখ, আমেরিকার বার্লি বাইসন আড়মোগা দেয়ারও ওরাং-ওটাংয়ের সদাসয় দৃষ্টির সামনে দিয়ে। গাছের তলা দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় কোন ময়ূর হয়তো আমার ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করলো—আমি তখন উপরে তাকাতাম। ভালো ছিলো সেইসব গাছের তলা দিয়ে যাওয়া যেগুলোতে ফল খাওয়া বাদুড়ের ঝাঁক থাকতো। এর একমাত্র অসুবিধা ছিলো দিনের প্রথম ভাগে যখন বাদুড়েরা ঝগড়া করে সমস্ত তল্লাট মাথায় করে রাখতো। বাইরে বেরুনোর সময়, আমি হয়তো ঘেরের সামনে থামতাম উজ্জ্বল চকচকে, উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ, গাঢ় নীল, বাদামী বা পাংশুটে ব্যাঙ দেখার জন্য। কখনো বা কোনো পাখি আমার দৃষ্টি কাড়তো—বাদামী ফ্লেমিঙ্গো, কালো রাজহাঁস, মাথায় বৌলঅলা এমু, ছোটো রুপালি ঘুঘু, লাভবার্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু হাতি, সীল, বড়ো বেড়াল, ভালুকই নয় বরং বেবুন, ম্যাকাকুই, ম্যাঙ্গাবে, গিবন, হরিণ, টাপির, লামা, জিরাফ, বেজি এরা সবাই সকালে জেগে যেতো।

প্রত্যেকদিন সকালে আমি যখন মূল ফটক পার হতাম শেষ যে জিনিসটা আমার মনে রেখাপাত করতো তা একদিকে যেমন সাধারণ তেমনি মনে রাখবার মতো— কচ্ছপের একটি পিরামিড, বেবুনের ত্রিনাভ লম্বা নাক, নিশ্চল জিরাফ, হলুদ-মোটা, জলহস্তির প্রকাণ্ড হা, ঠোঁট এবং নখ দিয়ে কবুতরের তারের বেড়ায় ওঠা, শোবিলের চঞ্চল স্বাগত ঠকঠকি উটের তিমরতি ইত্যাদি। এইসব দেখে দেখে আমি দ্রুত স্কুলে যেতাম। স্কুল ছুটির পর আমোদ করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করতাম কিভাবে শুঁড় দিয়ে হাতি একটি বাদামের জন্য তল্লাশি চালায় অথবা ওরাং-ওটাং কিভাবে তার হিস্যার জন্য কারও চুল বেছে দেয়। আমার ইচ্ছে হতো আমি যদি সীলের মতো পিছলিয়ে পানিতে পড়তে পারতাম! অথবা মাকড়সা বানরের মতো গাছে গাছে দোল খেতে পারতাম! অথবা সিংহের মতো রাজকীয়ভাবে মাথা নাড়াতে পারতাম! কিন্তু ভাষা অন্বেষণ করাই এগুলোর খেই পায় না! তার চেয়ে এগুলো গভীরভাবে অনুভব করতে বরং মস্তিষ্কে এসব ধরে রাখাই ভালো।

প্রকৃতি দর্শনের মতো চিড়িয়াখানা দেখারও সেরা সময় সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়। এ সময় প্রতিটি জীবজন্তুই জীবন্ত থাকে। এরা এদের সব ধরনের ক্রিয়াকলাপই এ সময় করে থাকে। এ সময়ের পর্যবেক্ষণ চোখ এবং কানকে সমৃদ্ধ করে। এগুলো দেখার জন্য আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করতাম। প্রাণীদের নানামুখী প্রকাশভঙ্গি আমাদের এই গ্রহকে যে কতো ঐশ্বর্য দিয়েছে! এটা এতো উজ্জ্বল, বাঙ্ময় এবং মাহর্ঘ যে বোধকেও হতোবুদ্ধি করে দেয়।

চিড়িয়াখানা সম্পর্কে আমি এতো বাজে কথা শুনেছি, যেমনটি শুনেছি ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্পর্কে। সুন্দর অর্থ অথচ ভুল তথ্যে বিশ্বাস করে মানুষ ভাবে জন্তুরা জঙ্গলেই 'সুখী' কারণ তারা 'মুক্ত'। তারা ভাবে বন্য জন্তু উদর পূর্তি করে উষরভূমিতে খাবার হজম করতে বিচরণ করে সেই শিকারকে উদরস্থ করে যারা ধার্মিকদের মতো তাদের এই ভাগ্য মেনে নিয়েছে। অথবা বন্যরা তাদের দেহ সৌষ্ঠব ঠিক রাখতে ব্যায়াম। তারা ভাবে এই বন্যরা গর্বের সাথে তাদের বাঞ্ছাকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন থাকে। বৃক্ষ শাখা থেকে তারা সূর্যাস্তের মহিমা দর্শন করে। তারা ভাবে বন্য জন্তুর জীবন সাদাসিধা, পবিত্র এবং অর্থবহ। দুষ্টু লোকেরা ধরে খাঁচায় পুরে এদের সুখকে দলিত-মথিত করে। এরা তখন মুক্তির জন্য তড়পাতে থাকে। খাঁচায় এরা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং মৌলিকত্ব হারায়। কিছু লোক এভাবেই চিন্তা করে।

আসলে ঘটনাটা তা নয়।

জঙ্গলে পশুরা এক বাধ্য জীবন যাপন করে। ক্ষমাহীন দৈবচক্রই এখানকার নিয়তি। এখানে খাদ্যের যোগানের চেয়ে ভয়ের যোগান বেশি। আত্মরক্ষার জন্য সবসময় এখানে সজাগ থাকতে হয় এবং পরজীবী হওয়া এখানকার নিয়ম। এই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার কী মানে থাকতে পারে? জঙ্গলের প্রাণীরা কি এলাকার বিচারে, কি সময়ের বিচারে, কি ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচারে স্বাধীন নয়। তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়ে থাকে, প্রাণীরা খাদ্য যোগাড় করে আর চলে যায়— এদের কোন বন্ধন নেই, পিছুটান নেই। কিন্তু এটাই যদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তা হলে কি দাঁড়ায়? ধরা যাক একজন দোকানদার তার পরিবারের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, সমাজের প্রতি বন্ধন চুকিয়ে সবকিছু ফেলে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেলো—তাকে কি বলবেন? তার পক্ষে কি এটা আদৌ সম্ভব? যদি একজন মানুষ সবচেয়ে সাহসী এবং বুদ্ধিমান প্রাণী এটা না পারে তা হলে মানুষের চেয়ে সবদিক থেকে সংকীর্ণ একটা প্রাণী তা পারবে কেন? যেখানে সামান্য পরিবর্তনেই সে বিচলিত হয়! সে চায় সমস্ত কিছু এভাবেই থাক, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। পরিবর্তনের

চমক তাদের কাঙ্ক্ষিত নয়। একটি প্রাণী জঙ্গলে এবং চিড়িয়াখানায় সমানভাবে বংশ বিস্তার করে। সর্বত্রই এরা দাবার ঘুঁটি। সর্বোপরি চিড়িয়াখানায় একটি প্রাণী সবিশেষ যত্নে, বৈজ্ঞানিকভাবে লালিত পালিত হয়।

ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

আপনি যদি কোন বাড়িতে গিয়ে সামনের দরোজায় লাথি মেরে ঢুকে ঐ বাড়িতে যারা থাকে তাদের জোর করে রাস্তায় বের করে দেন এবং বলেন, " যাও! তোমরা মুক্ত! বিহঙ্গের মতো মুক্ত-স্বাধীন! যাও! যাও!"—আপনি কি ভাবেন তারা উল্লাস করবে আর খুশিতে নাচতে থাকবে? না। পাখিরা স্বাধীন নয় জনাব। যাদের আপনি ঘর থেকে বের করে দিলেন তারা বলবে, "কোন্ অধিকারে আপনি আমাদের বের করে দিচ্ছেন? এটা আমাদের বাড়ি। আমরা এর মালিক। বছরের পর বছর আমরা এখানে বাস করছি! দাঁড়ান, আমরা পুলিশ ডাকছি। ব্যাটা বেহায়া!

আমরা কি বলি না, "বাড়ির মতো কোন জায়গা আছে কি?" পশুরাও এমনই অনুভব করে। পশুরা এলাকাভিত্তিক। নির্দিষ্ট এলাকাতেই তাদের যতো জারিজুরি। চেনা জানা এলাকাতেই তারা শত্রুকে এড়িয়ে চলে খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করতে পারে। জীববিদ্যার শুদ্ধ রীতি অনুসরণে গঠিত একটি চিড়িয়াখানায় কি খাঁচা, কি গর্ত, কি দ্বীপ, কি ঘের—সর্বত্রই পশু-পাখিদের এলাকা বেঁধে দেয়া হয়। জঙ্গলের এক বিলাশ এলাকায় হয়তো কোন হিংস বা বাঘের পর্যাপ্ত খাবার এবং বেঁচে থাকার নানা জিনিস নাও থাকতে পারে। কিন্তু চিড়িয়াখানায় তাদের সে দুশ্চিন্তা নেই। আমরা বাড়িতে যেমন খাবার খাই—পশুরাও চিড়িয়াখানায় তেমনি খাবার পায়, আশ্রয় পায়, পানীয় পায়—আর পায় সহানুভূতি।

সাহিত্যে ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে যে, খাঁচার প্রাণী শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে কিন্তু হয় না। কিংবা গেলেও আবার ফিরে আসে। একবার এক শিম্পাঞ্জীর খাঁচার দরোজা খোলা ছিলো। শিম্পাঞ্জীটি এ অকস্মাত ঘটনায় ভড়কে গেলো। এটি চ্যাচাতে শুরু করলো এবং সশব্দে বার বার দরোজা বন্ধ করতে চেষ্টা করতে থাকলো। পরে একজন দর্শকের কাছে খবর পেয়ে কেয়ারটেকার এসে দরোজা বন্ধ করার পর সে শান্ত হয়েছিলো। ইউরোপীয় এক চিড়িয়াখানায় একবার একদল ক্ষুদে হরিণ দরোজা খোলা পেয়ে তাদের খোয়াড় থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। দর্শকদের তাড়া খেয়ে তারা পাশের জঙ্গলে ছুটে গিয়েছিলো—যেখানে তাদের প্রজাতির ক্ষুদে হরিণদের বাস। কিন্তু খানিক যেতে না যেতেই তারা আবার তাদের খোয়াড়ে ফিরে এসেছিলো। অন্য আরেক চিড়িয়াখানায় ভোর বেলায় একবার এক শ্রমিক তার কাজে যাচ্ছিলো। সে তখন কাঠের তক্তা বহন করছিলো। একটি ভালুক কুয়াশার ভেতর সন্তর্পণে সোজা তার দিকে তেড়ে আসছিলো। লোকটি তক্তা ফেলে প্রাণ বাঁচাতে দে ছুট! চিড়িয়াখানার কর্মচারীরা তাৎক্ষণিক তাকে খুঁজতে শুরু করলো। আশ্চর্যজনকভাবে তারা তাকে তার খাঁচাতেই খুঁজে পেলো। গর্তে একটি গাছ পড়ে গিয়েছিলো এবং এটি বেয়ে সে পালিয়েছিলো। তারা দেখে সেই গাছ বেয়েই ভালুকটা আবার গর্তে নামছে। এটা মনে করা হয় সে তক্তার আওয়াজে ভয় পেয়েই সে এমনটি করেছিলো।

কিন্তু আমি গোয়ার্তুমি করবো না। আমি চিড়িয়াখানার পক্ষে ওকালতিও করবো না। সব চিড়িয়াখানা বন্ধ করে দিন এবং প্রাণীরা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরে যাক। আমি জানি চিড়িয়াখানার প্রতি মানুষের আর দরদ নেই। ধর্মও এই একই সমস্যায় আকীর্ণ। স্বাধীনতার বিষয়ে বিভ্রান্তি তাদের উভয়কে অভিশপ্ত করছে।

পঙ্গিচেরি চিড়িয়াখানা টিকে থাকেনি। এর গর্তগুলো ভরে ফেলা হয়েছে। খাঁচাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমি এখন এটিকে এক জায়গায়ই শুধু খুঁজে পাই—সে হচ্ছে আমার স্মৃতি।

৫

আমার নামই আমার নামের গল্পের শেষ নয়। আপনার নাম যদি হয় বব তাহলে কেউ জিজ্ঞেস করবে না আপনার নামের বানান কি। কিন্তু পাইসাইন মলিটর প্যাটেলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে রকম ছিলো না।

কেউ ভাবে আমার নাম পি.সিং। এতে তারা ধরেই নেয় যে, আমি একজন শিখ। তারা তখন বিস্মিত হয় আমি পাগড়ি পরি না বলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একবার আমরা কয়েক বন্ধু মিলে মন্ট্রিয়েলে গিয়েছিলাম। একদিন রাতে আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো পিজার অর্ডার দেয়ার। আমি চাচ্ছিলাম না আরেকজন ফরাসী আমার নাম শুনে হো হো করে হেসে উঠুক। তাই লোকটি যখন ফোনে আমার নাম জানতে চাইলো আমি তাকে এড়াতে বললাম—আমি যে সেই (আই এ্যাম হু আই এ্যাম)। আধা ঘণ্টা পর দুটো পিজা এলো 'ইয়ান হলিহান'—এই নামে।

লোকমুখে ফিরে ফিরে অনেকসময় আমাদের নাম এমন বিকৃত হয় যে পরে আর আসল নাম খুঁজেই পাওয়া যায় না। এভাবেই সিমন এক সময় হয়ে যায় পিটার, ম্যাথু হয়ে যায় লেভি; নাথানিয়েল হয়ে যায় বার্থোলোমিউ আর সল হয় পল।

একদিন স্কুলে গেছি। তখন আমার বয়স বারো। স্কুলের আঙিনায় আমার পরিচিত এক রোমান সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি সবে স্কুলে পৌঁছেছি। সে আমাকে দেখতে পেলো এবং এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো তার মাথায়। হাত তুলে আমাকে থামিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো—"আরে—এ যে পিসিং প্যাটেল"! মুহূর্তেই সবাই হেসে উঠলো। কারণ তার উচ্চারণের অর্থ দাঁড়িয়েছিলো—'মুতুলে প্যাটেল' সবাই ক্লাসে ঢোকার আগ পর্যন্ত এই হাসি চলেছিলো। সবার শেষে মাথা নিচু করে আমি ক্লাসে ঢুকেছিলাম। ছেলেদের ঠাট্টা আমার গায়ে কাঁটার মতো ফুটছিলো।

ছেলেদের এই নিষ্ঠুরতা কারও কাছে খবর হলো না। সারা স্কুলের যেখানেই যেতাম আমাকে দেখেই ছেলেরা শূন্যে এ কথাগুলো ভাসিয়ে দিতো : "পিসিং (পেশাবখানা) কোথায়? আমার বড্ড পেশাব লেগেছে।" অথবা "তুমি দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছো যে, তুমি কি হিসু করছো?" এমনই আরও অনেক হুল ফোটানো হাওয়াই কথা আমাকে শুনতে হতো। শুনে আমি জমে হিম হয়ে যেতাম। তাই এগুলো এড়ানোর জন্য শুনেও না শোনার ভান করতাম। শব্দটা মিলিয়ে যেতো, কিন্তু এর খোঁচাটা তখনও আমাকে বিদ্ধ করতো। ঠিক যেমনটি পেশাব শুকিয়ে যাওয়ার পরও তার গন্ধ অনেকক্ষণ থেকে যায়।

শিক্ষকরাও এমন শুরু করলেন। আমাদের ক্লাস শুরু হতো ভূগোল দিয়ে। সুন্দর সকালে মরুভূমির বিস্তার নিয়ে শুরু হলো ভূগোলের পাঠ, যেমন—থর মরুভূমি। তারপর শুরু হতো ইতিহাসের ক্লাস। দিনটা ধুলোমলিন হতে শুরু করতেই অঙ্কের ক্লাস শুরু হতো। খুব গরম

পড়তো তখন। দুপুর হতেই সবাই গরমে হাঁসফাঁস করতো। রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে তারা লজ্জাজনকভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতো। তাদের জিভকে তখন আমার রগ-টানা ঘোড়ার মতো বন্য মনে হতো। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায়ই তারা তাদের জিভের রাস আলগা করে ফেলতো। তারা আমার নামের প্রথম অংশের উচ্চারণ 'পি' বেশ ভালোভাবেই করতো। কিন্তু গরমের কারণে নামের শেষাংশের উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যেতো। আমার নামের শেষাংশ 'সিন'কে তারা উচ্চারণ করতো 'সিং'। আমি শেষমেষ তা মেনেই নিতাম এবং শিক্ষকদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলতাম, "হ্যাঁ, আমিই পিসিং।" প্রায়ই শিক্ষকরা বুঝতে পারতেন না কী নোংরা কথা তাঁরা এইমাত্র উচ্চারণ করলেন। তিনি হয়তো একটু রেগেই আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকতেন। অর্থাৎ আমি কেন প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি করছি। এই গরমে পুরো ক্লাসই বোধহয় বিরক্ত হতো আমার ওপর। তারা তখন হাসি বা চাপা হাসি নয়—রীতিমতো নিন্দাই করতো শুনতে পেতাম।

সেন্ট যোসেফ স্কুলে আমার শেষ বছরটি কেটেছিলো মক্কায় হযরত মুহম্মদের (দঃ) গঞ্জনাদগ্ধ দিনগুলোর মতো। তিনি যেমন কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, যেখান থেকে মূলত ইসলাম ধর্মের প্রসার শুরু—ঠিক তেমনি আমিও নতুন স্কুলে আমার নব জীবনের শুভ সূচনা করতে চাইলাম।

সেন্ট যোসেফের পর আমি পন্ডিচেরির সবচেয়ে ভালো প্রাইভেট মাধ্যমিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পেটিট সেমিনারিতে ভর্তি হলাম। রবি আগে থেকেই সেখানে পড়তো। অন্যসব ছোট ভাইয়ের মতো যথারীতি সেখানে আমাকে "ঐ যে রবির ছোট ভাই যায়"—ঐ ধরনের ফিসফিসানির বিরক্তি সহ্য করতে হয়েছিলো। পেটিট সেমিনারি স্কুলে সে ছিলো তার সময়ের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। শহরের সেরা ক্রিকেট দলেরও অধিনায়ক ছিলো সে। এক ভয়ঙ্কর বোলার এবং শক্তিমান ব্যাটসম্যান, যেন আমাদের 'কপিল দেব'! আমি যে একজন সাঁতারু—সেটা কেউ পুছতোও না। এটা যেন 'সমুদ্র পারের সবাই সাঁতার জানবে এবং পর্বতের পাদদেশের সবাই পর্বতারোহী হবে' এমনি স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে সবার কাছে আমি রবির ভাই। পুরোনো স্কুলের অপবাদ 'পিসিং' (প্রশ্রাব) তো ছিলোই তার ওপর 'রবি ভাই'। কারও ছায়ায় বেড়ে ওঠার এই আত্মগ্লানি থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে লাগলাম আমি। শেষ পর্যন্ত ফন্দি একটা বেরও করে ফেললাম।

আমার এই ফন্দি কাজে লাগাতে আমি বেছে নিলাম সেই দিনকে, ভর্তির পরে যেদিন প্রথম ক্লাস শুরু হবে। আমার চারপাশে ছিলো সেন্ট যোসেফ স্কুলের সহপাঠীরা। ক্লাস শুরু হলো বছরের শুরুতে নতুন ক্লাস যেমন শুরু হয় তেমনি। অর্থাৎ নাম পরিচয়ের মাধ্যমে। আমরা ডেস্কে যেভাবে বসেছিলাম সেই ক্রমানুসারে যার যার নাম বলে যাচ্ছিলাম।

"গণপতি কুমার",—বললো গণপতি কুমার।

"বিপিন নাথ",—বললো বিপিন নাথ।

"সামসুল হুদা",—বললো সামসুল হুদা।

"পিটার ধর্মরাজ"—বললো পিটার ধর্মরাজ।

প্রতিটি নাম শুনে শিক্ষক একটি তালিকায় 'টিক' চিহ্ন দিচ্ছিলেন এবং খানিক স্থির তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন ছেলেটির নাম। আমি ভয়ানক অসহায় বোধ করছিলাম।

"অজিত গিয়াডসন",—বললো অজিত গিয়াডসন, চার ডেস্ক দূরে...

"সম্পথ সরোজ",—বললো সম্পথ সরোজ, তিন ডেস্ক দূরে...

"স্ট্যানলি কুমার",—বললো স্ট্যানলি কুমার, দুই ডেস্ক দূরে...

"সিলভেস্টার ন্যাভিন",—বললো সিলভেস্টার ন্যাভিন, ঠিক আমার সামনে থেকে।

এবার আমার পালা। শয়তান যেনো সময়ের গলা টিপে ধরেছে। হঠাৎ নতুন আলোর ঝলকানি, আমার ভেতর ডেকে উঠলো মদিনা—নতুন জীবনের আহ্বান। আমি ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে দেয়ে গেলাম। শিক্ষক মহোদয়কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মুখে নাম বলার সাথে সাথে চক দিয়ে লিখলাম—

আমার নাম—
পাইআইন মিনিটর প্যাটেল,
সবাই আমাকে এ নামেই চেনে

—আমার নামের প্রথম দুই অক্ষরের নিচে দু'বার আন্ডার লাইন করলাম—

পাই প্যাটেল

ভালোমতো বোঝাতে আমি আরও যোগ করলাম—

π=3.14

এবং একটি বড়ো বৃত্ত আঁকলাম এবং একে দু'টি ভাগে ভাগ করলাম জ্যামিতিকভাবে বিষয়টা বোঝাতে।

ক্লাসসুদ্ধ নীরব। শিক্ষক মহোদয় হা করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন। উত্তেজনায় আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি। শিক্ষক বলে উঠলেন তখনই, "খুব ভালো, পাই—বসো। এর পর থেকে ডেস্ক ছেড়ে যাওয়ার সময় অনুমতি নেবে।"

"ইয়েস, স্যার।" আমি সম্মতি জানালাম।

তিনি আমার নামে টিক চিহ্ন দিলেন। এবং পরবর্তী ছেলের দিকে তাকালেন—

"মনসুর আহামাদ",—মনসুর আহামাদ বললো, আমি যেনো প্রাণ ফিরে পেলাম।

"গৌতম সেলভারাজ",—বললো গৌতম সেলভারাজ আমি স্বাভাবিক শ্বাস নিতে পারলাম।

"অরুণ আন্নাজি",—বলে উঠলো অরুণ আন্নাজি।

শুরু হলো এক নতুন জীবন।

সেদিন প্রতিটি ক্লাসেই আমি এ কাজটি করলাম। প্রশিক্ষণের জন্য অভ্যর্থনা সবিশেষ প্রয়োজন। এটা শুধু পশুর ক্ষেত্রে নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও। প্রতিটি ক্লাসেই নতুন জীবনের বহ্নিশিখায় উদ্দীপ্ত আমি এই কাজটি করে গেলাম। শেষের ক্লাসগুলোতে আমার সহপাঠীরা চড়া সুরে আমার সাথে গলা মিলাতে থাকলো—যেন এক ঐকতান। শুধু যখন আমি বৃত্ত এঁকে তাকে দু'টি ব্যাসে ভাগ করছিলাম, কোন কোন সহপাঠী ফিসফিসিয়ে বলছিলো, "থ্রী! পয়েন্ট! ওয়ান! ফোর!"

শিক্ষকরা যখন আমার নামের প্রথমাংশ আমাকে উচ্চারণ করার সম্মতি দিচ্ছিলেন—এটা যেন আমার কানে মধু-বর্ষণ করছিলো। ছাত্ররাও আমার নামের এ নতুন উচ্চারণ মেনে নিচ্ছিলো। এমনকি সেন্ট যোসেফের দুষ্টুগুলো পর্যন্ত। কিছুকাল পরেই এক মজার ব্যাপার শুরু হলো। একজনের নাম ছিলো ওম্প্রকাশ। সে নিজেকে 'ওমেগা' বলে পরিচয় দিতে শুরু করলো। এমনিভাবে কেউ হলো 'গামা', কেউ 'ল্যামডা', কেউ 'ডেল্টা'। কিন্তু গ্রীক হরফে নামকরণে পেটিট সেমিনার স্কুলে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। এমনকি আমার ভাই, ক্রিকেট দলের অধিনায়ক, স্থানীয় হিরো এটা মেনে নিলো। পরের সপ্তাহে সে আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বললো—

"তোর একটা ডাকনাম নিয়ে এসব কি শুনছি?"

আমি নীরব থাকলাম। কেননা কেউ যখন ঠাট্টা করে তাকে তখন থামানো যায় না।

"আমি বুঝতে পারিনি তুই হলুদ রঙ এতো পছন্দ করিস।"

হলুদ রঙ? আমি চারদিকে তাকালাম। সে যা বলতে চাইছে তা কারও শোনা উচিত নয়, বিশেষ করে যাকে তার ছায়ায় চলতে হয়।

"রবি! তুমি কী বলতে চাও?" আমি চাপাস্বরে জানতে চাইলাম।

"ঠিক আছে ভাইটি, চালিয়ে যাও। 'পিসিং'-এর চাইতে যে কোন শব্দই ভালো, নাকি বলিস? এমনকি লেমন পাইও, নাকি বলিস?

সে দূরে মিলিয়ে যেতে যেতে বললো, "তোর মুখটা যে রাঙামুলোর মতো লাল হয়ে উঠলো!"

কিন্তু সে শান্ত থেকেছিলো। আমাকে আর বেশি ঘাটায়নি।

এবং এইভাবে করোগেটেড টিনের চালার মতো দেখতে গ্রীক হরফটি, একটি অমূলদ নম্বর—যা দিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে চেষ্টা করেন সেটিই আমাকে আমার নাম বিভ্রাট থেকে রক্ষা করেছিলো।

৬

সে একজন চমৎকার পাচক। তার উচ্চ বাড়িটি সব সময় সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণে মৌ মৌ করতো। তার মসলা রাখার তাকটি ছিলো ওষুধের দোকানের মতো। সে যখন তার ফ্রিজ বা খাবার রাখার মিটশেফ খুলতো—এমন অনেক খাবার দেখা যেতো যেগুলোর আগে আমি নামও শুনিনি। সত্যি কথা বলতে কি কোন ভাষায় খাবারগুলোর নাম লেখা আমার তাও জানা ছিলো না। আমরা থাকি ভারতে। কিন্তু সে পশ্চিমী খাবারও সমান তালে চালিয়ে যেতো। সে আমাকে এমন সুস্বাদু এবং সূক্ষ্ম ম্যাকারনি এবং পনির খাওয়াতো যা আমি আগে তখনও খাইনি। এবং তার সবজির ট্যাকোজ এমনকি সব ম্যাক্সিকানেরই ঈর্ষায় বন্ধু হতে বাধ্য।

আমি আরও একটি জিনিস খেয়াল করতাম। তার মিটশেফ সবসময় খাবারে থাকতো ঠাসা। প্রতিটি দরোজার পিছনে, প্রতিটি তাকে থাকতো পর্বতপ্রমাণ পরিচ্ছন্ন ক্যান এবং প্যাকেটের গাদা বিরাজ করতো। ঠিক যেন পতনের আগে লেনিনগ্রাদের খাদ্য সংগ্রহ!

৭

কৈশোরে আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো অল্প কিছু ভালো শিক্ষকের সান্নিধ্য পাবার। তাঁরা আমার অন্ধকার মননে আলোর শিখা জ্বেলেছিলেন। এঁদেরই একজন ছিলেন বাবু সতীশ কুমার। পেটিট সেমিনারি স্কুলে তিনি জীববিদ্যা পড়াতেন। তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট এবং মনে করতেন তামিল নাড়ুর কখনও সিনেমা তারকাদের নির্বাচন করা উচিত নয়। কেরালার পথ ধরা উচিত। তাঁর চেহারা ছিলো অদ্ভুত। তাঁর মাথার শীর্ষদেশ ছিলো টাক এবং চোখা। যদিও তাঁর চোয়াল ছিলো আকর্ষণীয়, যেমনটি আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর সরু কাঁধ এক বিশাল ভুঁড়ির পথ করে দিয়েছিলো। দশাসই ভুঁড়িটা ছিলো পর্বতের পাদদেশের মতো। পার্থক্য এই—তাঁর বপুটা হঠাৎ করেই সরু হয়ে প্যান্টের মধ্যে ঢুকে থাকতো। আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো তাঁর কাঠির মতো লিকলিকে পা কী করে এই ভার সইতো। কখনও কখনও মনে হতো তিনি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবেন। তাঁর গড়ন ছিলো জ্যামিতিক। একটি ছোটো এবং একটি বড়ো ত্রিভুজ যেন একটি সরল রেখায় মিলেছিলো। তাঁর কানে ছিলো এক জঙ্গল যা থেকে মাথাকাটা পেরেকের মতো লোম বেরিয়ে থাকতো। আর ছিলেন দারুণ বন্ধুবৎসল। হাসিটা ছিলো তাঁর ত্রিভুজ আকৃতির মাথার ভিত। এ হাসি প্রায়ই তাঁর কান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকতো।

সতীশ স্যার ছিলেন আমার দেখা প্রথম স্বঘোষিত নাস্তিক। শুধু ক্লাসরুমেই নয়, চিড়িয়াখানায়ও এটা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। তিনি ছিলেন চিড়িয়াখানার এক নিয়মিত দর্শক; যিনি প্রতিটি পশু-পাখির খাঁচা, গর্ত বা খোঁয়াড়ে লটকানো ঐ প্রাণীর পরিচিতিমূলক বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। তাঁর কাছে এর সবই ছিলো যুক্তি এবং যান্ত্রিকতার বিজয়বারতা। সমগ্র প্রকৃতি যেন তাঁর কাছে বিজ্ঞানের এক অমোঘ ব্যাখ্যা। যখন কোন প্রাণী যৌনমিলনের তাড়না অনুভব করতো, তাঁর কানে বাজতো বংশগতিবিদ্যার জনক 'জর্জ মান্ডেলে'র কথা। যখন প্রাণীরা তাদের মেজাজ দেখাতে শুরু করতো তাঁর মনে পড়ে যেতো প্রাকৃতিক বিবর্তনের জনক ডারউনের কথা। ব্যাঁ-ব্যাঁ, ঘোঁত-ঘোঁত, হিস হিস, চিঁহি চিঁহি, সিংহের গর্জন, কুকুরের গর্জন, নেকড়ের গর্জন, পাখির কিচিরমিচির, কাক বা পেঁচার কর্কশ ডাক এগুলো তো আমাদের কাছে বিদেশী ভাষার মতোই। সতীশ স্যার চিড়িয়াখানা দেখতে আসতেন না তো, আসতেন হাত টিপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাড়ি দেখতে। তাঁর স্টেথেস্কোপিক মন তাঁকে আশ্বস্ত করতো—সবকিছু নিয়মমতোই চলছে। আর তখনই কেবল বিজ্ঞানমনোষ্ক এ শিক্ষক আত্মতুষ্টি নিয়ে চিড়িয়াখানা দর্শন শেষ করতেন।

প্রথম তাঁকে যেদিন চিড়িয়াখানায় দেখি—তিনি টলে টলে, দুলে দুলে হাঁটছিলেন। সামনে যেতে লজ্জা করছিলো। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আমার খুব প্রিয়। একটু ভয় করতাম তাঁকে। আর স্কুলে তো শিক্ষকরা রাজা আর ছাত্ররা অনেকটা তাঁদের প্রজারই মতো! তাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম। ঐ তো তিনি গণ্ডারের গর্তের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দুটো গণ্ডার ছিলো এ চিড়িয়াখানার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কারণ একইসঙ্গে এখানে ছিলো কয়েকটি ছাগল। গণ্ডারেরা সামাজিক প্রাণী। আমরা যখন এই তাগড়া মর্দ গণ্ডার 'পিক'কে যোগাড় করলাম তখন সে ছিলো একা। কয়েকদিন যেতেই সে আচার-আচরণে নিঃসঙ্গতায় ভোগার কথা জানান দিচ্ছিলো। এমনকি সে খাওয়া-দাওয়াও কমিয়ে দিলো। একটি মাদী গণ্ডার

যদ্দিন যোগাড় করা না যাচ্ছে ততোদিন 'পিক'কে কী করে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা যায় বাবা তাই নিয়ে ভাবছিলেন। অবশেষে তিনি এক বিকল্প ব্যবস্থা কাজে লাগানো যায় কিনা পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। বেশ কয়েকটা ছাগল এনে ছেড়ে দেয়া হলো 'পিকে'র সাথে। বাবা ভাবলেন এতে যদি পিকের নিঃসঙ্গতা কাটে তাহলে তো কথাই নেই—একটা গণ্ডারের মূল্যবান জীবন তো বাঁচলো! আর যদি তা না হয় তাহলে কয়েকটা ছাগলও না হয় গচ্চা গেলো। বাবার এই ঝুঁকিটা অদ্ভুতভাবে কাজে লেগে গেলো। কয়েকদিনেই ছাগলগুলোর সাথে গণ্ডারটির ভাব হয়ে গেলো। এমনকি একটি মাদী গণ্ডার 'সামিট' যোগাড় হওয়ার পরও এদের ভাব অব্যাহত রইলো। এখন গণ্ডারগুলো যখন কাদাটে ডোবায় গোসল করে, ছাগলগুলো ডোবার চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ছাগলগুলো যখন এককোণে তাদের জায়গায় থাকে তখন পিক আর সামিট তাদের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে—যেনো ওরা ছাগলগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। এদের এই অপূর্ব সহাবস্থান অনেক মানুষকে চিড়িয়াখানায় টেনে আনতো।

সতীশ স্যার এদিকে তাকালেন এবং আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি হাসলেন এবং এক হাতে রেলিং ধরে অন্য হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন।

"হ্যালো, পাই!" কাছে যেতেই বলে উঠলেন তিনি।

"হ্যালো, স্যার! খুব খুশি হয়েছি আপনি যে আমাদের চিড়িয়াখানায় এসেছেন।"

"আমি তো এখানে সব সময়ই আসি। বলতে পারো এটা আমার মন্দির। এটা খুবই মজার জায়গা..." তিনি গণ্ডারের গর্তটা দেখিয়ে বললেন, "এই গণ্ডার আর ছাগলের মতো রাজনীতিক থাকলে আমাদের দেশের সমস্যা অনেক কমে যেতো। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এই গণ্ডারের চামড়ার বর্ম পরে থাকতে হয়। অথচ গণ্ডারের আচরণের ইতিবাচক দিকটিই তার অজানা।"

রাজনীতি সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না। বাবা-মা প্রায় রোজই মিসেস গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। কিন্তু আমি তার তেমন কিছু জানি না। তিনি অনেক দূরে উত্তরে থাকেন; এই চিড়িয়াখানায়ও থাকেন না, এই পন্ডিচেরিতেও থাকেন না। কিন্তু আমার মনে হলো আমার কিছু বলা উচিত।

"ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে।"—আমি বললাম। জ্ঞান হবার পর থেকেই ধর্ম আমার আত্মার খুব কাছের বিষয়।

"ধর্ম?" বাঁকা হাসিতে বিস্মিত হয়ে বললেন স্যার। "আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না। ধর্ম হচ্ছে অন্ধত্ব।"

অন্ধত্ব?—আমি হোঁচট খেলাম। ধর্মের দিক দিয়ে অন্ধত্ব হচ্ছে সবচেয়ে দূরের বিষয়। ধর্ম হচ্ছে আলো। তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করছেন? তিনি এগুলো কী বলছেন—"ধর্ম হচ্ছে" অন্ধত্ব! তবে কি তিনি ক্লাসে যেমনটি—"স্তন্যপায়ীরা ডিম পাড়ে", বলে সবার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করেন কেউ তাঁর ভুল ভাঙিয়ে বলে ওঠে কিনা—"শুধু প্লাটিপাস ডিম পাড়ে স্যার" (প্লাটিপাস হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ঠোঁটঅলা এক ধরনের ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী, যারা ডিম পাড়ে), তেমনিভাবে আমাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন!

"বৈজ্ঞানিক বাস্তব ব্যাখ্যার বাইরে কোন কিছুরই ভিত্তি থাকতে পারে না এবং কোন কিছু বিশ্বাস করার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। একটি স্বচ্ছ ধারণা, নিবিড় মনোযোগী ব্যাখ্যা এবং একটুখানি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই ধর্মের অসারতা প্রমাণে যথেষ্ট। ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।"

তিনি সত্যিই কি তাই বললেন? আমি কি কোন নাস্তিকের কথা শ্রবণ করছি? সে যা-ই হোক এই চিন্তার একটা রকম। এমন কথা আগে আমি কখনও শুনিনি।

"অন্ধত্বকে কেনো মেনে নিতে হবে? সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলে আমরা দেখতে পাবো সবকিছুই এখানে স্বচ্ছ।"—পিকের দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন। যদিও পিকের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু আগে কখনও ভাবিনি কোন গণ্ডার আলোকবর্তিকা হতে পারে।

তিনি আবার শুরু করলেন, "কেউ কেউ বলে থাকে ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় ঈশ্বর মারা গেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধেও মারা গিয়ে থাকতে পারেন। অথবা তিনি এই গতকাল পন্ডিচেরির এতিমখানায় মারা গেছেন। কোন কোন মানুষ এভাবেই বলে থাকে। পাই! আমি যখন তোমার মতো ছোট তখন পোলিওতে ভুগে শয্যাশায়ী ছিলাম। আমি তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'কোথায় ঈশ্বর? কোথায় ঈশ্বর? ঈশ্বর কোথায়?' ঈশ্বর কখনও আসেননি। তখন ঈশ্বর এসে আমাকে বাঁচায়নি—বাঁচিয়েছে ওষুধ। কার্যকারণ হচ্ছে আমার নবী এবং এটা আমাকে বলে—ঘড়ি যখন বন্ধ হয়ে যায় তেমনি আমরা মারা যাই। এটাই শেষ। ঘড়ি যদি ঠিকমতো কাজ না করে তবে এটাকে এখানেই বন্ধ করতে হবে। এবং এটা আমাদেরই করতে হবে। একদিন আমরা উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবো। কেবল তখনই পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।"

আমার জন্য এটুকুই ছিলো যথেষ্ট। উচ্চারণটা ছিলো যথার্থ—দরদী এবং সাহসী। কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এটা ফিকে-বিবর্ণ হয়ে যায়। আমি কিছুই বললাম না। এজন্য নয় যে সতীশ স্যার রেগে যাবেন। বরং এজন্য যে আর আগে বাড়তে দিলে তিনি হয়তো এমনকিছু ধ্বংস করে ফেলতেন যা আমি ভালোবাসতাম। পোলিও নিয়ে তাঁর কথা যদি আমাকে প্রভাবিত করেও থাকে তাতে কি এমন আসে-যায়। এমন কি মারাত্মক রোগ থাকতে পারে যা মানুষের ভেতরের ঈশ্বরকে মেরে ফেলতে পারে?

আমরা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে আগে-পিছে, ডাইনে-বাঁয়ে ভীষণভাবে দুলতে থাকা জাহাজের মতো স্থির জমিনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলাম।

যেতে যেতে তিনি বললেন, "ভুলে যেও না, মঙ্গলবার টেস্ট পরীক্ষা আছে। কঠোর অধ্যয়ন কর, 3.14!"

"জি স্যার।"

পেটিট সেমিনারি স্কুলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমার প্রিয় শিক্ষক এবং তাঁর কারণেই আমি টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা পড়েছিলাম। তাঁর প্রতি আমি আত্মীয়তার টান অনুভব করতাম। এখান থেকেই আমার উপলব্ধি হয়েছিলো যে নাস্তিকরা আমার ভিন্ন চিন্তার ভাই বা বোন এবং তাদের প্রত্যেকটি উচ্চারণের পিছনে থাকে বিশ্বাস। আমার মতোই কার্যকারণের পায়ের ওপর ভর করে তারা কদম বাড়ায়।

সততার সাথে আমাকে বলতেই হচ্ছে, নাস্তিকরা নয় বরং অজ্ঞেয়বাদীরাই আমার পাকস্থলীতে আঘাত করেছে। সন্দেহ কার্যকর, তবে তা খুব অল্প সময়ের জন্য। আমাদের অবশ্যই গেথসমেনের উদ্যানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যিশু যখন সন্দেহ নিয়ে খেলেছেন, আমাদেরও খেলতে হবে। যিশু যদি একটি অজ্ঞেয় রাত প্রার্থনায় কাটাতে পারেন, তিনি যদি ক্রুশ থেকে কান্নায় ভেঙে পড়তে পারেন "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর আপনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলেন?" সেক্ষেত্রে আমরাও অবশ্যই সন্দেহ করার অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে

হবে। সন্দেহকে, অজ্ঞেয়তা জীবনের দর্শন বলে মেনে নেয়া এবং স্থিরতাকে যাতায়াতের মাধ্যম বলে মেনে নেয়া একই কথা।

৮

সাধারণত ব্যবসায় আমরা বলে থাকি যে, কোন চিড়িয়াখানায় সবচেয়ে বিপজ্জনক পশু হচ্ছে মানুষ। সচরাচর আমরা ব্যাখ্যা করি কীভাবে আমাদের অতিরিক্ত লুণ্ঠন প্রবৃত্তি পুরো গ্রহটাকে আমাদের শিকারে পরিণত করেছে। আরও সুনির্দিষ্ট করে আমাদের মনে রাখতে হবে সেই দুশ্চরিত্র লোকদের কথা যারা বড়শির টোপে ভোঁদড়কে যন্ত্রণা দেয়, ভালুকের শরীরে ক্ষুর চালায়, আপেলের ভেতর পেরেক ভরে হাতিকে খেতে দেয়। কতকিছুই না এইসব নিষ্ঠুর, বর্বরেরা তাদের জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে ব্যবহার করে ঃ বলপেন, পেপার ক্লিপ, রাবার ব্যান্ড, চিরুনি, কফির চামচ, ঘোড়ার ক্ষুরের নাল, ভাঙা কাঁচের টুকরো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেককিছু। এইসব বিপজ্জনক জিনিস খেয়ে চিড়িয়াখানার যেসব প্রাণী মারা গেছে তার মধ্যে রয়েছে—গরিলা, বাইসন, সারস, উটপাখি, সীল, বনবেড়াল, ভালুক, উট, বানর, হাতি ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের প্রাণীই মানুষের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে মারা গেছে। চিড়িয়াখানা সংশ্লিষ্টদের মনে সবচেয়ে গভীর দাগটি পড়েছিলো গোলিয়াথের মৃত্যুতে। গোলিয়াথ ছিলো সারা ইউরোপীয় চিড়িয়াখানার তারকাপ্রাণী। সে ছিলো একটি বিশালাকায় সিন্ধু ঘোটক, যার ওজন ছিলো দুই টন। সব দর্শনার্থীর সে ছিলো খুব প্রিয়। কেউ একজন তাকে ভাঙা বিয়ারের বোতল খাইয়েছিলো। আর তা থেকেই অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে সে মারা যায়।

প্রায়ই এই নিষ্ঠুরতা সরাসরি আঘাত করে প্রাণীদের। পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই এসব নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যেমন : 'কেউ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে একটি শোবিলের ঠোঁট ভেঙে দিয়েছে। সে এখন মৃত্যুর সাথে লড়ছে।' 'কে যেন একটি আমেরিকান চামরি গাইয়ের চোয়াল থেকে এক চাকতি মাংসসহ দাড়ি কেটে নিয়েছে।' (এই আমেরিকান চামরি গাইকেই ছয় মাস পর কে যেন বিষ প্রয়োগে হত্যা করে)। 'এক দর্শনার্থীর বাড়িয়ে দেয়া বাদাম ধরতে গিয়ে একটি বানরের হাত ভেঙে যায়।' 'একটি শিংঅলা হরিণের শিংয়ে করাত চালানো হয়েছে।' 'একটি জেব্রার গায়ে তরবারি চালানো হয়েছে।' আরও অদ্ভুত অশোভন ঘটনাও ঘটে : হস্তমৈথুন করে বীর্য ফেলা হয় বানর, টাট্টুঘোড়া, পাখির ওপর; এক ধর্মীয় উন্মাদ একটি সাপের মাথা কেটে নিয়েছে; একজন উচ্ছৃঙ্খল লোক রেলিং টপকে গিয়ে হরিণের মুখে পেসাব করে দিয়েছে—এমনি আরও কতো ঘটনা যে ঘটে!

তুলনামূলকভাবে পন্ডিচেরিতে আমরা ভালোই ছিলাম। ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান চিড়িয়াখানায় যেমন দর্শকদের অবাধ বিচরণ, এখানে তেমনটা নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের সোনালি এ্যাগোতিটি নেই হয়ে গেলো। বাবার ধারণা কেউ এটা চুরি করে খেয়ে ফেলেছে। ময়ূর, ম্যাকাউ, বন মোরগ প্রভৃতি সুদর্শন পাখির সুন্দর পালক মাঝে মাঝে লোভী লোকেরা চুরি করতো। একদিন একটি লোককে ছুরিসহ ধরে ফেললাম। সে হরিণের খাঁচায় ঢুকছিলো। সে বলেছিলো দুষ্ট রাবণকে শাস্তি দিতে যাচ্ছিলো সে। রাবণ হচ্ছে রামায়ণের একটি চরিত্র, যে

হরিণের বেশ ধরে সীতাকে অপহরণ করেছিলো। আরেকজন লোককে গোখরা সাপ চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা হয়েছিলো। লোকটি ছিল এক সাপুড়ে। তার নিজের গোখরাটি মরে গিয়েছিলো। লোকটি ধরা পড়ায় দু'জনেই রক্ষা পেয়েছিলো। সাপটা বেঁচেছিলো পোষমানা জীবনে বাজে বাজনার সাথে নেচে নেচে খেলা দেখানোর হাত থেকে আর সাপুড়ে বেঁচেছিলো সম্ভাব্য ছোবলে মৃত্যুর হাত থেকে। অনেকে ঢিল ছুঁড়ে প্রাণীদের অতিষ্ঠ করে তুলতো, যা প্রায়ই আমাদের সামাল দিতে হতো। একবার এক মহিলার শাড়ি টেনে নিচ্ছিলো এক সিংহ। মহিলা সিংহের খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে আঁচল নেড়ে তামাশা করছিলো। সিংহটি এক লাফে এসে মহিলার শাড়ি ধরে দে টান! ভাগ্য ভালো আশপাশের লোকজন দ্রুত ছুটে এসে মহিলাকে বাঁচিয়েছিলো। আমাদের সবচেয়ে বিপদে ফেলতো দর্শনার্থীদের পশু-পাখিকে এটা-সেটা খেতে দেয়া। আমাদের চিড়িয়াখানার ভেটেরিনারি ডাক্তার অতুলকে প্রায়ই প্রাণীদের হজম-ব্যাধি এবং অন্ত্রের প্রদাহের জন্য হিমসিম খেতে হতো।

টিকেট কাউন্টারের লাগোয়া দেয়ালে উজ্জ্বল লাল রঙে বাবা লিখে দিয়েছিলেন : **আপনি কি জানেন চিড়িয়াখানার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পশু কোন্‌টি?** লেখাটির সাথে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে একটি ছোট পর্দাকে নির্দেশ করা হয়েছিলো। এতো উৎসাহী দর্শক পর্দাটি নাড়াচাড়া করতো যে প্রায়ই আমাদের তা বদলাতে হতো। পর্দার আড়ালে ছিল একটি আয়না।

পরবর্তীতে আরও জেনেছিলাম, বাবা বিশ্বাস করতেন আরেকটি পশু আছে যা আমাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এটা খুবই সাধারণ পশু, প্রতিটি মহাদেশের প্রতিটি বাসস্থানে এগুলোকে দেখা যায়। এই প্রজাপতিটি হচ্ছে— Animalus anthropomorphicus. আমরা সবাই এটাকে দেখেছি। হয়তো বা মালিকও।

আমি শিখেছিলাম পশু হচ্ছে পশুই। অবশ্যই আমাদের ভেতর থেকে পশুত্বকে দূর করতে হবে। এই পাঠ আমাকে দু'বার নিতে হয়েছিলো। একবার বাবার কাছ থেকে, আরেকবার রিচার্ড পার্কারের কাছ থেকে।

এক রবিবার সকালের ঘটনা। আমি শান্তভাবে নিজের খেলা খেলছিলাম। বাবা ডেকে উঠলেন—

"বাচ্চারা, এদিকে এসো।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বুঝলাম কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সতর্ক হলাম। সকাল থেকে কোন অন্যায় করেছি কিনা খুঁতিয়ে দেখলাম। না করিনি। তাহলে পরিষ্কার রবি আবার বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আমি ভাবছিলাম কী এমন করেছে সে! আমি হেঁটে শোবার ঘরে গেলাম। সেখানে মা ছিলেন। এটা একটা ব্যতিক্রম। বাচ্চাদের শাসন করে থাকে সাধারণত বাবা। রবি এলো সবার পরে। তার সারামুখে অপরাধীর ছাপ।

"রবি, পাইসাইন, তোমাদের আজ এক অত্যন্ত দরকারি জিনিস শেখাবো।"

"সত্যি! এটা কি খুবই প্রয়োজন?" বলে উঠলেন মা। তাঁর চেহারায় আতঙ্কের ছায়া।

আমি ঢোক গিললাম। শান্ত এবং নিস্তরঙ্গ স্বভাবের মা যদি উদ্বিগ্ন বা হতাশ হন তবে বুঝতে হবে ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছি। রবির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

"হ্যাঁ, অবশ্যই এটা প্রয়োজনীয়", একটু বিরক্ত হয়ে বললেন বাবা।

"এটা এমনই দরকারী যা তাদের জীবন বাঁচাতে পারে।"

আমাদের জীবন বাঁচানো! আমার মাথায় সর্বনাশের যে সতর্ক ঘন্টা বাজছিলো এখন তা বেড়ে রীতিমতো দ্রিমি দ্রিমি করে বাজতে থাকলো।

"কিন্তু পাইসাইন? তার বয়স সবে আট", মা বললেন।

"সে-ই আমাকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলছে।"

"আমি নির্দোষ!" চিল্লিয়ে বললাম আমি। "যদি কিছু ঘটে থাকে তার জন্য রবি দায়ী। সেই করেছে।"

"কি?" ফেটে পড়লো রবি, "আমি কোন অন্যায় করিনি।" বলে আমার দিকে কটমটিয়ে তাকালো সে।

"হিস্‌স্‌স্!" বাবা হাত তুলে আমাদের থামালেন। তিনি মার দিকে তাকিয়েছিলেন। "গীতা, পাইসাইনকে তো দেখেছো। সে হচ্ছে এমনই এক বয়সের ছেলে যারা চারদিক দৌড়ে বেড়ায় এবং সব জায়গায় নাক গলায়।"

আমি? আমি চারদিক দৌড়ে বেড়াই? সব জায়গায় নাক গলাই? না, এমনকি কখনও নয়। 'মা বাঁচাও, মা বাঁচাও'—আমি মনে মনে জপতে থাকলাম। কিন্তু মা কেবল মাথা নাড়লেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। অর্থাৎ বিষয়টা চালিয়ে যাওয়া হোক।

"আমার সাথে এসো", বললেন বাবা।

আমরা কয়েদীর মতো তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে থাকলাম।

আমরা বাড়ির বাইরে এসে গেট পেরিয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম। এটা ছিলো সকালবেলা এবং দর্শকদের এখনও ঢুকতে দেয়া হয়নি। পশুর পরিচারকরা এবং ভূমি কর্মচারীরা তাদের কাজে যাচ্ছে। আমি সীতারামকে দেখলাম। সে ওরাং-ওটাংয়ের পরিচারক এবং আমার প্রিয়। সে থেমে আমাদের চলে যাওয়া দেখলো। আমরা পাখি, ভালুক, বানর, উল্লুক, উভচর আশ্রম, গণ্ডার, হাতি, জিরাফদের পেরিয়ে গেলাম।

আমরা বড়ো বুনো বেড়াল, বাঘ, সিংহ, চিতার খাঁচাগুলোর কাছে এলাম। তাদের পরিচারক বাবু আমাদের অপেক্ষায় ছিলো। আমরা ওগুলোর চারদিক ঘুরে দেখলাম। বাবু এ এলাকায় ঢোকার গেট খুলে দিলো। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। এটা শান বাঁধানো এক গোল চত্বর। গরম এবং আর্দ্র। চারদিক তীব্র পেশারের গন্ধ। চারদিকে বিশাল খাঁচা, যেগুলো ঘন, সবুজ লোহার বার দিয়ে বিভক্ত। হলুদ রোদ এসে পড়ছে এতে। খাঁচাগুলো শূন্য—একটি ছাড়া। এটিতে বন্দী করে রাখা হয়েছে মহিশাকে। মহিশা আমাদের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বংশপ্রদীপ, কিছুটা কৃশ, লম্বা, ওজন ৫৫০ পাউন্ড। আমরা এর চৌহদ্দিতে ঢোকামাত্রই এটি বারের ওপর লাফিয়ে পড়লো এবং সর্বশক্তিতে গর্জন করে উঠলো এবং চোখ রাঙিয়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করলো। মার কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালাম। মাও কাঁপছিলেন। এমনকি বাবাকেও মনে হলো শক্তি সঞ্চয় করছেন। শুধু বাবুর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। এটা তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। মহিশা খাঁচার ভেতর পায়চারি শুরু করলো।

বাবা আমাদের দিকে ফিরলেন। "এটা কোন্ পশু?" মহিশার গর্জন ছাপিয়ে তিনি হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"এটি একটি বাঘ", বাধ্য ছেলের মতো রবি আর আমি একই সাথে উত্তর দিলাম।

"বাঘেরা কি ভয়ঙ্কর?"

"হ্যাঁ, বাবা, বাঘেরা ভয়ঙ্কর।"

"বাঘেরা ভীষণ ভয়ঙ্কর" বাবা চিৎকার করে বললেন। "আমি তোমাদের বোঝাতে চাই যে তোমাদের কখনও—কোন পরিস্থিতিতেই একটি বাঘকে ছোঁয়া উচিত নয়, এদের পোষ মানাতে যাওয়া উচিত নয়, খাঁচার ভেতর হাত ঢোকানো উচিত নয়। এমনকি খাঁচার কাছে যাওয়াও উচিত নয়। বুঝেছো? রবি?"

রবি সাহসের সাথে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"পাইসাইন?"

আমি আরও সাহসের সাথে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি এতো জোরে ঘাড় নেড়েছিলাম যে ভাগ্যিস আমার মাথাটা ঘাড় থেকে ছিঁড়ে পড়েনি।

আমি এমন কোন আচরণ করিনি যে বাবা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে পারেন। দৌড়েও বেড়াই না তেমন একটা আর পশুদের ব্যাপারে নাকও গলাই না। তবু আমার বাবা আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

"আমি তোমাদের দেখাচ্ছি বাঘেরা কতোটা ভয়ঙ্কর!" তিনি বলতে থাকলেন, "আমি চাই সারা জীবন তোমরা এটা মনে রাখবে।"

তিনি বাবুর দিকে ফিরলেন এবং বাবু মাথা ঝাঁকালো। বাবু চলে গেলো। মহিশার চোখ জোড়া তাকে অনুসরণ করলো যতোক্ষণ না সে গেটের বাইরে মিলিয়ে গেলো। কয়েক সেকেন্ড পরেই বাবু পা বাঁধা একটা ছাগল নিয়ে ফিরে এলো। পিঁছন থেকে মা আমাকে থামচে ধরলেন। মহিশার গর্জন এখন ঘর্ ঘর্ আওয়াজে পরিণত হলো। বাবু বাঘের খাঁচার পাশের খাঁচাটি খুলে ঢুকে বন্ধ করে দিলো। দুটি খাঁচার ভেতর লোহার গরাদ আর একটি চোরা দরজা। সাথে সাথে মহিশ লোহার গরাদে থামা মারতে লাগলো। সে যেন তার গর্জনের মাঝে এখন আরও বিস্ফোরক ঢাললো। বাবু ছাগলটাকে নিচে নামালো। এটা ভয়ে এমন ভ্যা ভ্যা করছিলো যে মনে হচ্ছিলো চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসবে। বাবু এর পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। বাবু যেভাবে সাবধানে ঢুকেছিলো তেমনি সাবধানে বেরিয়ে এলো। খাঁচাটির দু'টি মেঝে। একটা আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সমতলে অন্যটি একটু পেছনে এবং তিন ফুট উঁচু। ছাগলটি দ্রুত উঁচু মেঝেতে উঠে গেলো। মহিশা এখন বাবুর কথা ভুলে গেছে। তার চোখ এখন ছাগলটির দিকে। বাঘটা এখন তার খাঁচার সমান্তরালে সরে এলো অনেকটা অনিচ্ছায়। সে থামাতে লাগলো এবং স্থির শুয়ে রইলো। শুধু তার লেজ নাড়া তার উত্তেজনা জানান দিচ্ছিলো।

বাবু চোরা দরোজার কাছে গেলো এবং এটা খুলতে শুরু করলো। মহিশা সন্তুষ্ট হয়ে চুপ থাকলো। সেই মুহূর্তে আমি দুটি শব্দই কেবল শুনতে পাচ্ছিলাম। বাবা বলছিলেন, "এই শিক্ষা কখনও ভুলবে না।" এবং ছাগলের তারস্বরে ভ্যা ভ্যা চিৎকার। আমি অনুভব করলাম হাঁপরের মতো ওঠা-নামা করা আমার বুক চেপে ধরলেন মা। চোরা দরোজাটা ছিলো তখনও বন্ধ। মহিশা এটির পাশেই ছিলো। দেখে মনে হচ্ছিলো এটা গরাদ ভেঙে বেরিয়ে আসবে। সে তার শিকার খুঁজছিলো। সে চোরা দরোজা খুঁজে পাচ্ছিলো না। আবার ভয়ঙ্কর গর্জন শুরু করলো মহিশা।

ছাগলটা লাফাতে লাগলো। কী সে লাফ! কোন ছাগল যে এতো উঁচুতে লাফাতে পারে আগে জানতাম না। হঠাৎ খুলে দেয়া হলো চোরা দরোজা। আবার চারদিক নীরব। শুধু ছাগলের ভ্যা ভ্যা আর মেঝেতে তার ক্ষুরে আওয়াজ।

শুধু একটি ঝলক দেখা গেলো—কালো-কমলা রঙের একটি ঝলক এক খাঁচা থেকে অন্য খাঁচায় ঢুকলো।

সচরাচর বড়ো বেড়ালদের সপ্তাহে একদিন বাদে রোজই একবার খেতে দেয়া হয়, জঙ্গল জীবনের সাথে ভারসাম্য রক্ষার জন্য। কিন্তু পরে জেনেছি বাবা মহিশাকে তিনদিন ধরে উপোস রাখার হুকুম দিয়েছিলেন।

মনে নেই সেদিন ছাগলের দেহ থেকে ছিটকে আসা রক্ত দেখেছিলাম কিনা এবং সেগুলো আমার জামা-কাপড়ে মেখে গিয়েছিলো কিনা; নাকি তার আগেই। ভয়ে মায়ের বাহুতে মুখ গুঁজে দিয়েছিলাম কিনা। তবে শুনেছিলাম। ছাগলটির ভয়ার্ত আর্তনাদই আমাকে বিক্ষত করতে যথেষ্ট ছিলো। মা আমাদের দু'জনকে জাপটে ধরলেন। আমরা ভীষণ কাঁপছিলাম। মা রেগে গেলেন, বললেন—

"এটা তুমি করতে পারলে, সন্তোষ? ওরা শিশু। সারা জীবন ওরা এই ভয়ের আতঙ্ক থেকে রেহায় পাবে না।

মার স্বর ছিলো চড়া এবং কাঁপা কাঁপা। আমি তাঁর চোখে পানি দেখেছিলাম। আমি কিছুটা ভালো বোধ করছিলাম।

"গীতা, আমার লক্ষ্মীটি, এটা ওদের ভালোর জন্য। ভাবো তো, পাইসন যদি কোনদিন গরাদে হাত ঢোকাতো এই সুন্দর কমলা রঙের পশমি প্রাণীটা ছুঁতে তা হলে কী হতে পারতো! তার চাইতে এটা একটা ছাগলের ওপর দিয়ে গেছে, এটা ভালো হলো না কি?"

তাঁর স্বর ছিলো নরম এবং ফিসফিসে। তাঁকে অনুতপ্ত লাগছিলো। এর আগে তিনি কখনও আমাদের সামনে মাকে 'লক্ষ্মীটি' বলে সম্বোধন করেননি। আমরা মাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। বাবাও আমাদের সাথে যোগ দিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাটা পরবর্তীতে কাজে দিয়েছিলো।

এরপর বাবা আমাদের সিংহ এবং চিতার কাছে নিয়ে গেলেন।

"অস্ট্রেলিয়ায় এক কর্তাগিন্নী ছিলেন। তিনি ছিলেন কারাতেতে ব্ল্যাক বেল্ট। তিনি সিংহের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি মারা গিয়েছিলেন। খুব খারাপ পরিণতি হয়েছিলো তাঁর। পরিচারকরা পরদিন খাঁচায় তাঁর অর্ধভুক্ত দেহ খুঁজে পেয়েছিলো।"

"জি, বাবা।"

হিমালয়ের ভালুক আর স্লথ ভালুকের কাছে এসে বললেন, "এগুলোর একটা থাবাই তোমাদের টুকরো টুকরো করার জন্য যথেষ্ট।"

"জি, বাবা।"

এরপর একে একে তিনি জলহস্তি, হায়েনা, ওরাং-ওটাং, উটপাখি, সাদা গুটি গুটি দাগের হরিণ, আরবের উট, কালো রাজহাঁস, ছোট ছোট পাখি, হাতি, শূকর ইত্যাদির খাঁচার কাছে নিয়ে গেলেন একে একে। এবং তিনি প্রতিটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলেন।

সেদিনের মতো পাঠপর্ব শেষ হলো। রবি আর আমি মুখ গোমড়া করে থাকলাম। এমনকি পুরো সপ্তাহই আমরা বাবাকে এড়িয়ে চললাম। মাও এ ক'দিন তাঁর সাথে ঠাণ্ডা মেরে থাকলেন।

কিন্তু আপনি যদি বাবাকে ভালোবাসেন তাহলে ক'দিন বা তাঁর সাথে রাগ করে থাকতে পারবেন? জীবন এগিয়ে যাবে এবং আপনি কখনও বাঘকে ছুঁতে যাবেন না। শুধু এর পরও রবি কোন দোষ না করলেও ওর ওপর দোষ চাপাতাম। আর রবি খুব রেগে গেলে বলতো,

"দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা! একলা পেয়ে নেই, তোকে বাঘের খাঁচায় ছাগল বানিয়ে ছাড়ব।"

৯

চিড়িয়াখানা-বিজ্ঞানের মোদ্দা কথাই হচ্ছে জনসমক্ষে পশুদের প্রদর্শন করা। মূল উদ্দেশ্য থাকে ওদের নিরাপদ দূরত্ব কমিয়ে আনা। কোন পশুর ক্ষেত্রে নিরাপদ দূরত্ব হচ্ছে যতটা দূরত্বে থেকে সে নিজেকে শত্রুর আশঙ্কামুক্ত মনে করে। জঙ্গলে আপনি তিনশ' গজ দূরে থাকলে কোন ক্রেমিঙ্গো কিছু মনে করবে না। এ দূরত্ব অতিক্রম করলেই এটা সতর্ক হয়ে উঠবে। তিনশ' গজ দূর থেকে আপনি গুলি করলেও পাখিটি কিছু মনে করবে না। বিভিন্ন প্রাণীর নিরাপদ দূরত্ব বিভিন্ন এবং এরা বিভিন্নভাবে এটা রক্ষা করে। বিড়াল দেখে, হরিণ শোনে, ভালুক ঘ্রাণ নেয়। আপনি কোন মোটরগাড়িতে থাকলে জিরাফ আপনাকে ৩০ গজ কাছ পর্যন্ত যেতে দেবে। আর যদি আপনি হেঁটে যান তাহলে ১৫০ গজ দূর থেকেই এটা পালাবে। এমনি নানা প্রাণীর নিরাপত্তা বলয় নানা রকমের।

প্রাণীদের নিরাপত্তা বলয় কমিয়ে আনার আমাদের চাবিকাঠি হচ্ছে প্রাণীদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ভালোবাসা, আমাদের দেয়া খাদ্য এবং পানীয়। আমাদের এই অভিজ্ঞতা এদের পোষ মানাতে কাজে তো লাগেই, এমনকি এরা এখানে বংশ বৃদ্ধিও করে। আমি বলছি না আমাদের চিড়িয়াখানাটি, সান্টিয়াগো, টরেনটো, বার্লিন বা সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানার মতো। কিন্তু আপনি একজন ভালো চিড়িয়াখানা রক্ষককে অবহেলা করতে পারেন না। প্রকৃতিগতভাবেই বাবা একজন ভালো চিড়িয়াখানা রক্ষক। প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও তাঁর অভিজ্ঞতা, প্রাণীদের প্রতি তাঁর মমতার দৃষ্টি, পশুর প্রতি স্বতোপ্রণোদিত ভালোবাসা তাঁকে একজন ভালো ও খাঁটি চিড়িয়াখানা বিশারদ বানিয়েছিলো। কোন পশু-পাখির দিকে তাকিয়েই তিনি এর মনের কথা পড়ে ফেরতে পারেন। খাঁচার প্রাণীগুলোর প্রতি ছিলো তাঁর গভীর মনোযোগ। এগুলোও বাবাকে বন্ধুর চোখে দেখতো। কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি।

১০

তবু চিড়িয়াখানায় সবসময় কিছু পশু থাকেই যারা সুযোগ পেলেই পালাতে চায়। মানানসই বেষ্টনীতে রাখা হয়নি এমন পশুই এ কাজটি বেশি করে থাকে। প্রতিটি পশু-পাখির জন্যই তার উপযোগী বাসস্থান তৈরি করতে হয়। এটি যদি বেশি রোদেলা বা বেশি ভেজা হয়, এটি যদি বেশি খালি হয়, এর ছাদ যদি বেশি উঁচুতে হয়, অতিরিক্ত খোলামেলা হয়, মাটি যদি বেশি বালুময় হয়, এটিতে যদি বাসা বাঁধার জন্য পর্যাপ্ত ডাল না থাকে, খাবার যদি বেশি নিম্নমানের হয়, গর্তে যদি গড়াগড়ি করার মতো পর্যাপ্ত কাদা না থাকে...এমনি আরও অনেক 'যদি'র ওপর নির্ভর করে প্রাণীর শান্তি। মোদ্দা কথা একটু এদিক-সেদিক হলে এদের আর রক্ষা করা যায় না। আর যদি প্লেগের মতো কোন সংক্রামক রোগ কোন অরক্ষিত বেষ্টনীঅলা চিড়িয়াখানায় দেখা যায় তাহলে তো কথাই নেই! পুরো চিড়িয়াখানাই মৃত্যুপুরিতে পরিণত হবে।

আর একটা সমস্যার দিক হচ্ছে যে প্রাণীটি জঙ্গল থেকে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ধরা হয় সেটি। সেটির চিড়িয়াখানার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে অনেক সময় লাগে এবং এর পিছনে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়।

কিন্তু যেসব প্রাণীর জন্মই চিড়িয়াখানায় এবং বন্য জীবন সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা তাদের বেষ্টনীর সাথে যথার্থই খাপ খাইয়ে নেয়। এরা মানুষের উপস্থিতিতে উত্তেজিত হয় না। এদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাতে এরাও পালাবার পথ খোঁজে। প্রতিটি প্রাণীরই পাগলামির একটা সীমা আছে। এটা অতিক্রম করলে এদের আচরণ এমন অদ্ভুত হয় যার কোন ব্যাখ্যা থাকে না। এই পাগলামি রোধ করা সম্ভব। খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতারই এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা ছাড়া কোন প্রাণীই টিকে থাকতে পারে না।

প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ পশুদের পালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে যে কারণই কাজ করুক না কেন, যারা চিড়িয়াখানা তুলে দিতে চান তাদের মনে রাখা উচিত পশু-পাখি পালিয়ে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে চায় না বরং এর পালাবার থাকে নির্দিষ্ট কারণ। তাদের এলাকার কোন ঘটনা, কোন পরিস্থিতি তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। যে সমস্ত পশু পালিয়ে যায়—তারা চেনা জায়গা থেকে অচেনা জায়গায় যায়। এবং কোন পশু যদি কোন কিছু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে থাকে—তা হচ্ছে অচেনা পরিবেশ।

১১

জুরিখ চিড়িয়াখানার সেই মাদি কালো চিতাটির কথাই ধরা যাক না! এটি ১৯৩৩ সালের শীতকালে চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। চিড়িয়াখানায় চিতাটিকে নতুন আনা হয়েছিলো এবং একটা মর্দ চিতার সাথে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু যৌনক্রিয়া করতে গিয়ে প্রায়ই দু'টিতে ঝগড়া বেধে যেতো এবং মাদি চিতাটি জখম হতো। কর্তৃপক্ষ যখন কী করা যায় তা নিয়ে ভাবছে তখনই একদিন রাতের অন্ধকারে ছাদের এক ভাঙা ফোকর দিয়ে এটি পালালো। এটির পালানোর খবর চাউর হতেই জুরিখের অধিবাসীদের ভেতর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। কতো ফাঁদ পাতা হলো, কতো শিকারি কুকুর ছেড়ে দেয়া হলো! কিন্তু কোথায় কি? চিতাটির কোন হদিসই পাওয়া গেলো না দশ সপ্তাহে। অবশেষে পঁচিশ মাইল দূরে এক গোলাবাড়িতে এক দিনমজুর এটিকে পেয়ে গুলি করে মারে। গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার এতো বড়ো কালো চিতাটি দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে সুইজারল্যান্ডের শীতে টিকে থাকলো, কেউ তার টিকিটিও দেখলো না, কাউকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই ক্ষুদে হরিণদের কথা, যারা কাছেই জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং ফিরে এসেছিলো। এতে কি এই প্রমাণিত হয় না যে, চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে যাওয়া পশু বিপজ্জনক নয়? কেবল এরা নিজেদের নিরাপত্তা চায়।

এটি অনেক ঘটনার একটি। আপনি যদি টোকিও নগরীকে উল্টিয়ে ঝাঁকান তাহলে যে সমস্ত প্রাণী ছিটকে পড়বে তাদের দেখে আপনি হতবাক হবেন। দেখবেন বিড়াল এবং কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় বোয়া সাপ, কোমোডো ড্রাগন, কুমির, উটপাখি, নেকড়ে, ওরাং-ওটাং ইত্যাদি বৃষ্টির মতো আপনার ছাতার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। এবং তাদের এই ম্যাজিকান উত্থ জঙ্গলে খুঁজে পাবেন—হা! হা! হা! এটা স্রেফ হাসাকর, কেবলি হাসাকর। তারা ভেবেছে কি?

১২

কখনও কখনও তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। আমি খুব কমই কথা বলতাম। তাঁর নিজের গল্প আমাকে চুপ করিয়ে রাখতো। তিনি স্মৃতির সমুদ্র থেকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কথা বের করতেন। আমি উদ্বিগ্ন থাকতাম—এই বুঝি তিনি থেমে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর গল্প শোনাতে চাইতেন। তিনি বলে যেতেন। এতো বছর পরও টিকে থাকা রিচার্ড পার্কারের সবই মনে আছে।

তাঁর স্বভাব ছিলো মিষ্টি। যতোবারই আমি তাঁর ওখানে যেতাম তিনি আমাকে দক্ষিণ ভারতীয় সবজির ভোজ খাওয়াতেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমি মসলাদার খাবার পছন্দ করি। জানি না কেন বোকার মতো এমন একটি মিথ্যা কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমি লোকমার পর লোকমা ওগার্ট মাখিয়ে যেতাম কিন্তু কিছুই করতাম না। প্রতিবার একই কাজ করতাম। আমার খাবার রুচি চলে যেতো। আমার চামড়া বিটের মতো লাল হয়ে উঠতো, আমার চোখ অশ্রুসজল হতো, মাথার ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতো এবং আমার ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদান্ত্র বোয়া সাপের মতো যন্ত্রণায় গর্জন করে মোচড়াতে থাকতো।

১৩

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেউ যদি সিংহের গর্তে পড়ে যায় সিংহটি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এর কারণ এই নয় যে সিংহটা ক্ষুধার্ত, কারণ চিড়িয়াখানায় পশুদের পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করা হয়; এর কারণ এই নয় যে সিংহটি রক্তপিপাসু, বরং এইজন্য যে লোকটি সিংহটির নিজস্ব এলাকায় ঢুকেছে।

অন্যদিকে একজন সার্কাস ট্রেইনারকে সিংহ আক্রমণ তো করেই না বরং তার কথামতো ওঠ-বস করে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ট্রেইনার আগে রিংয়ে প্রবেশ করে। অর্থাৎ সিংহের কাছে সে এ ব্যাপারটাই দাঁড় করায় যে এটা তার এলাকা। পরে সিংহরা রিংয়ে প্রবেশ করে অর্থাৎ ট্রেইনার রিংটির মালিক আর সিংহরা আগন্তুক। সুতরাং যার এলাকা তার কথা তো শুনতেই হবে। ট্রেইনার চিল্লিয়ে, ক্ষিপ্রতার সাথে রিংয়ের সব জায়গায় থপ থপ করে হেঁটে, সাঁই সাঁই করে চাবুক ঘুরিয়ে রিংয়ে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সিংহরা ভাবে ট্রেইনার তাদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি, সুতরাং তার বশ্যতা মেনে চলতে হবে। পশুর রাজা সিংহ তখন ট্রেইনারের কথায় লাইন ধরে হাঁটে, ইয়া বড়ো হা করে দেখায়, কাগজ মোড়ানো পিপের মধ্য দিয়ে যায়, লোহার রিংয়ের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে যায়, আরও কতো খেলা দেখায়। ট্রেইনারের মনে একটা কথাই সব সময় কাজ করে—যে করেই হোক তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন বজায় রাখতে হবে।

হেডিগার (১৯৫০) বলেন, "দুটি প্রাণীর যখন সাক্ষাত ঘটে তখন যে প্রাণীটি অন্য প্রাণীটির মনে ভয় ধরাতে সক্ষম হয়, সামাজিকভাবে তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়া হয়, যার কারণে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময় যুদ্ধ অপরিহার্য নয়; একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বীই পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট।" হেডিগার ছিলেন একজন জ্ঞানী পশু বিশারদ। অনেক বছর ধরে তিনি চিড়িয়াখানার পরিচালক ছিলেন প্রথমে বাসেল চিড়িয়াখানায় এবং পরে জুরিখ চিড়িয়াখানায়। পশুদের আচরণ সম্বন্ধে তাঁর ছিলো অগাধ জ্ঞান।

এটা হচ্ছে পেশীর ওপরে মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন। ট্রেইনাররা পশুদের কথা শোনাতে পারে কারণ মনস্তাত্ত্বিকভাবে ট্রেইনাররা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অচেনা জায়গা, ট্রেইনারের ঋজুভঙ্গি, নির্ভীক এগিয়ে চলা, শান্ত আচরণ, দৃঢ়তা, অদ্ভুত গর্জন, চাবুক ঘোরানো, বাঁশি বাজানো ইত্যাদি পশুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয় এবং এতে পশুদের কাছে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪

এটা খুবই মজার ব্যাপার, সার্কাসের ট্রেইনারের চালাকির শিকার হয়ে যে সিংহ এমন পোষ মানে তার সামাজিক অহঙ্কার একেবারেই নিম্নমানের। বলা যায় 'ঘ' শ্রেণীর। এ ব্যাপারে সার্কাসের ট্রেইনার হচ্ছে 'ক+' শ্রেণীর। এজন্যই এটি ট্রেইনারের সাথে এতো ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে। এটা কখনও অতিরিক্ত যত্নের কারণে ঘটে না। এক্ষেত্রে ট্রেইনারের সাথে গভীর সম্পর্ক তাকে অন্য অহঙ্কারী প্রাণী থেকে রক্ষা করে। দর্শকরা আঁকার এবং হিংস্রতার দিক দিয়ে হয়তো একই রকম দেখে কিন্তু এই নিম্ন-অহঙ্কারের সিংহটি ট্রেইনারের সবচেয়ে বেশি পোষ্য থাকে।

এটা সার্কাসের অন্যান্য প্রাণী এমনকি চিড়িয়াখানার প্রাণীদের ক্ষেত্রেও সত্য। সামাজিকভাবে সবচেয়ে নিম্নমানের পশুই দেখা যায় ট্রেইনার বা পরিচারকের সবচেয়ে বেশি বাধ্য হয়। একই অবস্থা দেখা যায় বেড়াল জাতীয় সব প্রাণী, বাইসন, হরিণ, বানর এবং আরও অনেক পশুর ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারটি চিড়িয়াখানা সংশ্লিষ্ট প্রায় সবারই জানা।

১৫

তাঁর বাড়িটি একটি মন্দির। হলঘরের প্রবেশদ্বারে ঝুলছে হাতিমুখো গণেশের বাঁধানো ছবি। গণেশ বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে—গায়ের রঙ গোলাপী, মোটা পেট, মুকুট পরা হাস্যোজ্জ্বল। তিনটি হাতে বিভিন্ন জিনিস ধরা চতুর্থ হাতটির পাতা বাইরের দিকে মুখ করা, আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা জানানোর ভঙ্গিতে। সে হচ্ছে বিপদ ভঞ্জনের দেবতা, সৌভাগ্যের দেবতা, জ্ঞানের দেবতা এবং শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। তাঁকে দেখলেই আমার হাসি পায়। তাঁর

পায়ের কাছে গদগদ ভক্ত তাঁর বাহন—ইঁদুর। বিপরীত দিকের দেয়ালে কাঠের ক্রুশের একটি ছবি।

শোবার ঘরের সোফার পাশের টেবিলে মা-মেরির বাঁধানো ছবি। তাঁর খোলা লম্বা কোট থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফুল। এটির উল্টোদিকে কালো পর্দায় ঢাকা কাবা শরীফের ছবি, যার চারদিকে হাজার হাজার ভক্ত। টেলিভিশনের ওপর নটরাজের বেশে শিবের ব্রোঞ্জ মূর্তি—তিনি ব্রহ্মাণ্ড এবং সময়ের নিয়ন্ত্রক, অজতার দৈত্যের ওপর তিনি নৃত্যরত। তাঁর চার বাহু নাচের মুদ্রা প্রদর্শন করছে, তাঁর একটি পা দৈত্যের পিঠের ওপর, অন্য পা উর্ধে তোলা। বলা হয়ে থাকে নটরাজ যখন তাঁর এই পা নামাবেন তখনই থেমে যাবে সময়।

রান্নাঘরে আছে চন্দনকাঠের একটি বাক্স। এটি সেখানে একটি কাপবোর্ড রাখা, যার দরজার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে কারুকাজ করা এক খিলান। এই খিলানের আড়ালে আছে এক বাল্ব, যা সন্ধ্যায় জ্বালানো হয়। একটি বেদির পিছনে দু'টি ছবি। একপাশে গণেশের, মাঝখানে বড়ো ফ্রেমে নীল গাত্রবর্ণের কৃষ্ণ, বাঁশি বাজাচ্ছেন। বেদিতে রাখা তামার থালায় তিনটি মূর্তি—একটি লক্ষ্মীর, একটি পার্বতীর অন্যটি কৃষ্ণের, এবারে হামাগুড়ি দেয়া শিশুর ভঙ্গিতে। দুই দেবির মাঝখানে শিব যোনী-লিঙ্গ। থালাটির একদিকে স্তম্ভের ওপর একটি শঙ্খ। অন্যদিকে রুপার ছোট একটি ঘন্টি। এগুলোর সামনে ছড়ানো ধান আর ফুল। এর নিচের তাকেই বিভিন্ন নৈবেদ্য;—একটি তামার চামচ; একটি সলতেসহ প্রদীপ, ধূপকাঠি, ছোট পাত্রে ভর্তি আবীর ও হলুদ গুঁড়ো, চাল, চিনির দলা।

খাবার ঘরে আছে আরেকটি মা-মেরির ছবি।

উপরতলায় তাঁর অফিসে কম্পিউটারের পরেই রাখা আছে পদ্মাসনে বসা গণেশের কাসার মূর্তি; ব্রাজিল থেকে আনা কাঠের ক্রুশবিদ্ধ যিশু এবং কোণায় পাতা আছে সবুজ এক জায়নামাজ। এর পরেই আছে রেহালে রাখা কাপড়ে মোড়ানো কোরান শরীফ। কাপড়ের মাঝখানে আরবি হরফে লেখা 'আল্লাহ'।

খাটের পাশের টেবিলে রাখা বইটি বাইবেল।

১৬

আমরা সবাই ক্যাথলিকদের মতো জন্মাই, নয় কি?—নরকের প্রবেশদ্বারে, ধর্মহীন, যতক্ষণ না কেউ আমাদের ঈশ্বরকে চিনিয়ে দেন। বেশির ভাগ মানুষেরই ব্যাপারটা এর পরপরই চুকে যায়। খুব অল্প ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে। জীবনপথের বাঁকে অনেকেই ঈশ্বরকে হারিয়ে ফেলেন। আমার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। আমাকে যিনি ধর্মের পথ দেখান তিনি আমার এক মাসি। তিনি ছিলেন মার চেয়ে বয়সে বড়ো এবং প্রথাগত জীবনে বিশ্বাসী। আমি যখন ছোট শিশু তখন তিনিই আমাকে মন্দিরে নিয়ে যান। রুহিনী মাসি তাঁর নবজাতক ভাগ্নেকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর এই আনন্দের ভাগীদার করবেন মা-কালীকেও। তিনি

আমাকে মন্দিরে নিয়ে চললেন। আমরা থাকতাম মধুরাইতে। এখান থেকে সাত ঘণ্টার ট্রেন জার্নি করে মন্দিরটিতে যেতে হয়েছিলো। মা আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি মাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার এই প্রথম মন্দির দর্শনের তেমন কিছুই আমার মনে নেই। শুধু ধূপের ঘ্রাণ, কিছু আলো-ছায়ার খেলা, কিছু শিখা, কিছু রং এবং জায়গাটির রহস্যময়তা আমার মাঝে থেকে গিয়েছিলো। সর্ষেদানার মতো ছোট্ট এক ধর্মবীজ আমার সত্তায় রোপিত হয়েছিলো।

আমি হিন্দু মূর্তির শঙ্খতে লাল কুমকুম আর হলুদ গুঁড়োর দলার কারণে, ফুলের মালা আর নারকেলের ফালির কারণে, ভগবানের কাছে কেউ এলে বেজে ওঠা ঘন্টাধ্বনির কারণে, আরতির কারণে, ঢোলের আওয়াজের কারণে, পাথরের মেঝেতে নগ্নপায়ে হেঁটে যাবার কারণে, ধূপের ঘ্রাণের কারণে, ভজনের সুরের কারণে, রঙিন মূর্তি এবং তাঁদের পেছনের রঙিন কাহিনীর কারণে,—এক কথায় বিশ্বাসের কারণে। এসবের কী মানে এবং এগুলো কিসের জন্য তা জানার আগেও আমার এর ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিলো। এখনও আমি এ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে উদ্বেলিত হই।

কিন্তু ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানের চাইতেও বেশি কিছু। এখানেও আমি একজন হিন্দু। আমি হিন্দুর চোখ দিয়েই জগতকে চিনতে শিখেছি। ব্যক্তির আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার সংস্পর্শে আসে। এখানেই ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা চিন্তা এবং ভাষাকে অতিক্রম করে। সীমার মাঝে অসীম, অসীমের মাঝেই সীমা। মুক্তির পথ অনেক, কিন্তু সব পথ গিয়ে এক মোহনায় মিশেছে, আর সেই মোহনা হচ্ছে কর্ম।

সংক্ষেপে এই হলো হিন্দুত্ব। এবং আমি আমার সারা জীবন হিন্দুই থেকেছি। এর আলোতেই আমি বিশ্বকে দেখি। কিন্তু তাই বলে এটাকে আবার এমনভাবে আঁকড়ে থাকা উচিত নয় যাতে মৌলবাদীদের সাথে জ্ঞানীদের বিরোধ বাধে। শ্রীকৃষ্ণের এক লীলার কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ তখন রাখাল বালকের বেশে। প্রতি রাতেই তিনি গোপিনীদের তপবনে তাঁর সাথে নাচতে আসতে বলতেন। তারা আসতো এবং নাচতো। অন্ধকার রাত। তারা নাচছে—মাঝখানে রাখা অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে, বাজনার তাল আস্তে আস্তে দ্রুতলয়ের হচ্ছে, গোপিনীরা নাচছে আর নাচছে, উন্মাতাল হয়ে তাদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সাথে নাচছে। শ্রীকৃষ্ণ একই সাথে সবাইকে সঙ্গ দিচ্ছেন, সবারই বাহুলগ্ন হচ্ছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে গোপিনীরা ভাবতে শুরু করতো শ্রীকৃষ্ণ শুধু তার একারই সঙ্গী— তখনই শ্রীকৃষ্ণ উধাও হয়ে যেতেন।

টরেনটোতে আমি এক মহিলাকে জানি। আমার খুবই অন্তরঙ্গ। আমি তাঁর পালিত সন্তান। আমি তাঁকে 'আন্টিজি' বলে ডাকি। তিনি একজন 'কুইবেকাইজ'। যদিও তিনি ত্রিশ বছর ধরে টরেনটোতে আছেন তবু এখনও কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে তিনি অনেক ইংরেজি শব্দের মানে বোঝেন না। তেমনিভাবে প্রথম যেদিন তিনি 'হরে-কৃষ্ণ' শব্দটি শোনেন, তিনি সঠিকভাবে শোনেননি। তিনি শুনেছিলেন, 'হেয়ারলেস খ্রিস্টান'। অনেক বছর ধরে ব্যাপারটা তাঁর কাছে সেই অর্থেই ছিলো—অর্থাৎ চুলহীন খ্রিস্টান। আমি যখন তাঁকে শুধরে দেই তখন বলি যে, আসলে তিনি ততো মারাত্মক ভুল শোনেননি। যে হিন্দুরা তাদের ভক্তির সুবাদে মাথা ন্যাড়া করে, প্রকৃত অর্থে তারা ন্যাড়া খ্রিস্টান, ঠিক যেমনভাবে মুসলমানরা সবকিছুতেই আল্লাহকে দেখতে পায়—দাড়িঅলা হিন্দুরাও তেমনি দেখতে পায়। একইভাবে খ্রিস্টানরা যেমন ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল—টুপিপরা মুসলমানরাও তেমনি আস্থাশীল আল্লাহর ওপর।

প্রথম চমকটা ছিলো গভীরতম। দ্বিতীয় চমকটা প্রথমটি থেকেই উৎসারিত। আমার ধর্মীয় অনুভূতির বিশাল পটভূমি রচনার জন্য আমি হিন্দু ধর্মের কাছে ঋণী। হিন্দু পুরাণের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ, নদী, যুদ্ধক্ষেত্র, বন, পবিত্র পর্বত, গভীর সমুদ্র, দেব-দেবী, দৈত্য এবং সাধারণ মানুষ আমার ওপর গভীর ছায়াপাত করে আছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে উদারতা, ভালোবাসার জয়গান শুনেছি হিন্দু ধর্মে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমি শুনেছি। তাঁর জ্ঞান এবং সুমহৎ ভালোবাসা একদিন আমাকে আরেকজন চিনিয়েছিলো।

আমি তখন চৌদ্দ বছরের বালক এবং মনেপ্রাণে হিন্দু। সে সময়েই কোনো এক ছুটির দিনে আমি যিশু খ্রিস্টের সাক্ষাত লাভ করি।

চিড়িয়াখানার কাজে বাবা এমনই ব্যস্ত থাকেন যে তাঁর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু সেবার হয়েছিলো। আমরা সপরিবারে মান্নারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মান্নার কেরালার এক সুন্দর শহর। মান্নারের ছোট্ট পাহাড়ী স্টেশনের চারদিক জুড়ে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চা-বাগানগুলো। এটা ছিলো মে মাসের প্রথম দিক, মৌসুমি বায়ু তখনও বইতে শুরু করেনি। তামিলনাড়ুতে অসহ্য গরম। মধুরাই থেকে পাঁচ ঘন্টার গাড়ি-ভ্রমণ শেষে আমরা মান্নারে পৌঁছলাম। মান্নারের স্নিগ্ধ হাওয়া আমাদের শরীরে শীতল তাজা হাওয়ার পরশ বুলিয়ে দিলো। এখানকার শীতল হাওয়া আমাদের মুখে মিষ্টের তাজা অনুভূতির মতো প্রশান্ত করলো।

আমাদের বেড়ানো পর্ব শুরু হলো। আমরা টাটা চা-ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখলাম। চমৎকার এক লেকে নৌ-বিহার করলাম। এমনকি একটি গো-প্রজনন কেন্দ্রও দেখলাম। একটি জাতীয় উদ্যানে গিয়ে নীলগিরি তাহ্‌র নাম এক প্রজাতির বন্য ছাগলকে লবণ খাওয়ানোর সময় কিছু সুইচ পর্যটককে সুযোগ পেয়ে বাবা বললেন, "আমাদের পন্ডিচেরির চিড়িয়াখানায় এই নীলগিরি ছাগল আছে, একবার ঘুরে এলে খুশি হবো।" আমি তার বরি তো রীতিমতো চা-বাগানগুলো চষে বেড়াতে লাগলাম!

মুন্নারে তিনটি পাহাড় আছে। পাহাড় না বলে এগুলোকে পর্বত বলাই ভালো। তিনটি পাহাড়ের চূড়াতেই আছে একটি করে উপাসনালয়। ডানদিকের যে পাহাড়, আমাদের হোটেল থেকে সেটিতে যেতে হলে একটি নদী পার হতে হয়। এ পাহাড়ির ওপর আছে একটি হিন্দু মন্দির। কিছু দূরে মাঝে যে পাহাড় তার চূড়ায় রয়েছে একটি মসজিদ। আর বামদিকের যে পাহাড় তার চূড়ায় মুকুটের শোভা হয়ে আছে একটি খ্রিস্টান চার্চ।

আমাদের ভ্রমণের চতুর্থ দিন। পড়ন্ত বিকেল। বামদিকের পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানে রয়েছে একটি চার্চ। খ্রিস্টানদের স্কুলগুলো খুব নামকরা। বলতে লজ্জা নেই, সেই খ্রিস্টানদের স্কুলে পড়াশোনা করলেও এ পর্যন্ত আমি কখনও কোন চার্চে প্রবেশ করিনি। এখন এ চার্চের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও ভেতরে ঢুকতে দ্বিধা হচ্ছিলো। চার্চের চারপাশটা একবার ঘুরে এলাম। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এর ভেতরে কী আছে। বৈশিষ্ট্যহীন উঁচু দেয়াল। হাল্কা নীল রং। জানলাগুলো এতো ছোট যে দেখে মনে হয় দুর্গপ্রাচীর।

আমি যাজকের অফিসের কাছে এলাম। দরোজাটা খোলা। আমি এক কোণায় লুকিয়ে চারদিক দেখে নিলাম। দরোজার বাম দিকে একটি ছোট বোর্ড। তাতে লেখা 'গির্জা যাজক'

এবং 'সহকারী যাজক'। দু'জনেই তাঁদের অফিসে আছেন। এখানকার সব দরোজাই হাট করে খোলা। একজন যাজক জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাজ করছেন। অন্যজন একটি বড়ো উপপ্রকোষ্ঠে গোল টেবিলের পাশে বেঞ্চে বসে আছেন। আসবাবপত্র দেখে বোঝা যায় এখানে গির্জা দর্শনার্থীদেরও বসানো হয়। তিনি সামনের দরোজা এবং জানালার দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর হাতে একটি বই। আমার মনে হলো এটি একটি বাইবেল। তিনি একটু পড়ছেন আবার মুখ তুলে বাইরে তাকাচ্ছেন, আবার খানিক পড়ছেন—আবার বাইরে তাকাচ্ছেন। পড়ার ধরনে বোঝা যায় তিনি খুব উপভোগ করছেন বইটি, একই সাথে সতর্ক থাকছেন কেউ আসে কিনা। কয়েক মিনিট পড়ে তিনি বইটি বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। দুই হাত ভাঁজ করে টেবিলে রেখে তিনি বসে রইলেন। তাঁর অভিব্যক্তিতে পবিত্রতার ছোঁয়া।

উপপ্রকোষ্ঠটি পরিষ্কার। দেয়াল সাদা। টেবিল এবং বেঞ্চগুলো কাঠের এবং গাঢ় রঙের যাজকের পরনে ছিলো সাদা আলখাল্লা। আমার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। এটা বুঝতে পেরে আরও ভালো লাগলো যে তিনি ওখানে বসে আছেন কারও আসার প্রতীক্ষায়। তাঁকে খুব ধৈর্যশীল এবং প্রশান্ত ছিলো। যে কেউ তার ব্যক্তিগত সমস্যা, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা, কোন ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পাবার আসায় তাঁর কাছে আসতে পারে। তিনি ধৈর্য ধরে সব কথা শুনবেন। তাঁর পেশাই হচ্ছে ভালোবাসা, কারো অশান্ত মনকে প্রশান্ত করা এবং সঠিক পথ-নির্দেশ করা।

এ সবই আমার মন কেড়ে নিলো এবং আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। আমি এগিয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম তিনি তার প্রতিবন্ধক সরিয়ে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু না। তিনি বরং পিছু হঠলেন। খোলা দরোজা দিয়ে তিনি গীর্জার ভেতর ঢুকলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি এবং তাঁর সহকর্মী ভেতরেই আছেন।

আমি হেঁটে গেলাম এবং সাহস করে গির্জায় প্রবেশ করলাম। বুকটা দুরু দুরু করছিলো—এই বুঝি কোন খ্রিস্টান দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, "তুমি এখানে কি করছ? কতো বড়ো সাহস এখানে ঢুকেছো? এক্ষুণি বেরিয়ে যাও!"

কেউ কোথাও নেই। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি এগিয়ে গেলাম এবং এই পবিত্র স্থানের ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। একটি চিত্রকর্ম ছিলো। এটাই কি তা হলে এই পবিত্র মন্দিরের মূর্তি! নরবলি সম্পর্কে কিছু একটা হবে। একজন রাগী দেবতা, যিতি রক্তে তৃপ্ত হবেন। হতবুদ্ধি রমনীরা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে শূন্যের দিকে। নধরকান্তি শিশুরা ছোট্ট পাখায় ভর করে উড়ে এসে জড়ো হচ্ছে। এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এর ভেতর কোন্‌টি ঈশ্বর? গির্জা অভ্যন্তরের এক পাশে কাঠের রঙ করা একটি ভাস্কর্য। আবার সেই ভুক্তভোগী। চাবুকের কালসিটে দাগ এবং রক্তাক্ত, উজ্জ্বল রঙে আঁকা। আমি অভিভূত হয়ে তার হাঁটুর দিকে তাকালাম। এগুলোতে দগদগে জখমের চিহ্ন। গোলাপী চামড়া উপড়ে নেয়া হয়েছে এগুলোকে অনেকটা ফুলের পাপড়ির মতো লাগছে। উন্মুক্ত মালাইচাকি আগুন-লাল। এই নির্যাতনের দৃশ্যের সাথে গির্জার অফিসঘরের যাজকদের মেলাতে পারলাম না।

পরদিন একই সময়ে আমি আবার গির্জায় ঢুকলাম।

ক্যাথলিকদের কঠোরতার জন্য খ্যাতি আছে। তাদের ধারণা আছে যে, বিচার বড়ো নির্মম। কিন্তু ফাদার মার্টিনের সাথে আমার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা মোটেও তেমনটি নয়। তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমাকে চা এবং বিস্কুট খেতে দিলেন। এবং আমার সাথে বড়োদের মতো

আচরণ করলেন। তিনি আমাকে একটি গল্প বললেন। গল্পটি ছিলো কবে থেকে খ্রিস্টানরা বড় হাতের অক্ষর পছন্দ করে সে বিষয়ে।

কী এক গল্প! এ গল্পে বরং এ ধর্ম সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস জন্মালো। মানবজাতি পাপ করবে আর ঈশ্বরের পুত্র তার মাসুল দেবে? আমি কল্পনা করলাম ফাদার যেনো আমাকে বলছেন, "পাইসাইন, একটি সিংহ লামার গর্তে পড়ে গিয়েছিলো এবং দুটি লামাকে মেরে ফেলেছিলো। গতকাল আরেকটা সিংহ একটি হরিণ মেরেছে। গত সপ্তাহে দুটিতে মিলে একটি উট খেয়েছে। এর আগের সপ্তাহে সে একটি সারস এবং ধূসর বক খেয়েছে। এবং কে বলতে পারে হয়তো এটিই আমাদের সোনালি আগোতিকে খেয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রাণীগুলোর পাপমুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে ওগুলোকে সিংহের ভোগে পরিণত করা।"

"হ্যাঁ ফাদার, এগুলোই হবে সঠিক এবং যুক্তিসংগত করণীয়। আমাকে পরিষ্কার হয়ে আসার অনুমতি দিলে খুশি হই।"

"হেলেলুজাহ্ (ধন্য পরমেশ্বর) মাই সান।"

"হেলেলুজাহ্, ফাদার।"

কি ভাহা রহস্যময় গল্প। কী অদ্ভুত দর্শন। আমি ফাদারকে আরেকটি গল্প বলতে বললাম। হয়তো তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি। নিশ্চয়ই এই ধর্মে এমন অনেক গল্প আছে। কিন্তু ফাদার আমাকে বোঝালেন এ গল্পগুলো হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের অনেকটা আসর বন্দনা। তাদের মূল গল্প একটাই। এ গল্প তাঁরা বার বার পড়েন। এ এক গল্পই তাঁদের জন্য যথেষ্ট।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি হোটেলে ঝিম মেরে থাকলাম।

একজন দেবতা দুর্দশাগ্রস্ত হবেন—এ আমি ভাবতেই পানি না। পুরো রামায়ণেই কি রামের দীর্ঘ দুর্দশাগ্রস্ততার কাহিনী বর্ণিত হয়নি?—হ্যাঁ, হয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটেনি?—হ্যাঁ ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়নি?—হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে 'অবনতি!' 'মৃত্যু!' অমি কল্পনাও করতে পারি না শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে উলঙ্গ করা, চাবকানো, রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া এবং এতো উপরে ক্রুশবিদ্ধ করার কথা, তাও আবার কোন অমর দেবতা নয়—মানুষের হাতে! হিন্দু ধর্মে দৈত্য-দানবরা দুর্দশার শিকার হয়—দেবতারা নন। খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের পুত্র এভাবে মরে যায়? মানুষের হাতে! একবারের মৃত ঈশ্বর তো বরাবরেরই মৃত ঈশ্বর! খ্রিস্টানদের ঈশ্বর কেন সমস্ত ভোগান্তি নিজের ঘাড়ে নিলো? এমন ভয়ঙ্কর নির্যাতন কেন ঈশ্বর সইতে গেলেন? এই মৃত্যুর ভার তো মরণশীল মানুষের ওপরও বর্তানো যেতো! যা সুন্দর কেন তাকে কুৎসিত করা হলো? কেন যা সঠিক তাকে নষ্ট করা হলো?

—"ভালোবাসা।" ফাদার মার্টিনের উত্তর।

আর এই যে ঈশ্বরের পুত্রের নির্বাসন? এ কেমন কথা? শিশু কৃষ্ণের একটি গল্প আছে। একবার শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথীরা তাঁর বিরুদ্ধে পালক মা যশোদার কাছে এক মিথ্যা অভিযোগ করলো কৃষ্ণ গোবরের টুকরো খেয়েছে। যশোদা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করলেন, "দুষ্টু ছেলে, তোমার কখনও গোবর খাওয়া উচিত নয়।" "কিন্তু আমি তো খাইনি,"—জগতের মহাপ্রভু উত্তর দিলেন।

"তোমার মুখ খোলো তো, দেখি।" যশোদা কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না করে বললেন। কৃষ্ণ হা করলেন। যশোদা কৃষ্ণের মুখে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সমস্ত নক্ষত্ররাজি, স্থলভাগ, জলভাগ। "হে প্রভু, আপনি মুখ বন্ধ করুন।" যশোদা বললেন।

এবং 'সহকারী যাজক'। দু'জনেই তাঁদের অফিসে আছেন। এখানকার সব দরোজাই হাট করে খোলা। একজন যাজক জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাজ করছেন। অন্যজন একটি বড়ো উপাসকোষ্ঠে গোল টেবিলের পাশে বেঞ্চে বসে আছেন। আসবাবপত্র দেখে বোঝা যায় এখানে গির্জা দর্শনার্থীদেরও বসানো হয়। তিনি সামনের দরোজা এবং জানালার দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর হাতে একটি বই। আমার মনে হলো এটি একটি বাইবেল। তিনি একটু পড়ছেন আবার মুখ তুলে বাইরে তাকাচ্ছেন, আবার খানিক পড়ছেন—আবার বাইরে তাকাচ্ছেন। পড়ার ধরনে বোঝা যায় তিনি খুব উপভোগ করছেন বইটি, একই সাথে সতর্ক থাকছেন কেউ আসে কিনা। কয়েক মিনিট পড়ে তিনি বইটি বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। দুই হাত ভাঁজ করে টেবিলে রেখে তিনি বসে রইলেন। তাঁর অভিব্যক্তিতে পবিত্রতার ছোঁয়া।

উপাসকোষ্ঠটি পরিষ্কার। দেয়াল সাদা। টেবিল এবং বেঞ্চগুলো কাঠের এবং গাঢ় রঙের যাজকের পরনে ছিলো সাদা আলখাল্লা। আমার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। এটা বুঝতে পেরে আরও ভালো লাগলো যে তিনি ওখানে বসে আছেন কারও আসার প্রতীক্ষায়। তাঁকে খুব ধৈর্যশীল এবং প্রশান্ত ছিলো। যে কেউ তার ব্যক্তিগত সমস্যা, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা, কোন ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পাবার আসায় তাঁর কাছে আসতে পারে। তিনি ধৈর্য ধরে সব কথা শুনবেন। তাঁর পেশাই হচ্ছে ভালোবাসা, কারো অশান্ত মনকে প্রশান্ত করা এবং সঠিক পথ-নির্দেশ করা।

এ সবই আমার মন কেড়ে নিলো এবং আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। আমি এগিয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম তিনি তার প্রতিবন্ধক সরিয়ে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু না। তিনি বরং পিছু হঠলেন। খোলা দরোজা দিয়ে তিনি গীর্জার ভেতর ঢুকলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি এবং তাঁর সহকর্মী ভেতরেই আছেন।

আমি হেঁটে গেলাম এবং সাহস করে গির্জায় প্রবেশ করলাম। বুকটা দুরু দুরু করছিলো—এই বুঝি কোন খ্রিস্টান দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, "তুমি এখানে কি করছ? কতো বড়ো সাহস এখানে ঢুকেছো? এক্ষুণি বেরিয়ে যাও!"

কেউ কোথাও নেই। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি এগিয়ে গেলাম এবং এই পবিত্র স্থানের ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। একটি চিত্রকর্ম ছিলো। এটাই কি তা হলে এই পবিত্র মন্দিরের মূর্তি! নরবলি সম্পর্কে কিছু একটা হবে। একজন রাগী দেবতা, যিনি রক্তে তৃপ্ত হবেন। হতবুদ্ধি রমনীরা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে শূন্যের দিকে। নধরকান্তি শিশুরা ছোট্ট পাখায় ভর করে উড়ে এসে জড়ো হচ্ছে। এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এর ভেতর কোন্‌টি ঈশ্বর? গির্জা অভ্যন্তরের এক পাশে কাঠের রঙ করা একটি ভাস্কর্য। আবার সেই ভুক্তভোগী। চাবুকের কালসিটে দাগ এবং রক্তাক্ত, উজ্জ্বল রঙে আঁকা। আমি অভিভূত হয়ে তার হাঁটুর দিকে তাকালাম। এগুলোতে দগদগে জখমের চিহ্ন। গোলাপী চামড়া উপড়ে নেয়া হয়েছে এগুলোকে অনেকটা ফুলের পাপড়ির মতো লাগছে। উন্মুক্ত মালাইচাকি আগুন-লাল। এই নির্যাতনের দৃশ্যের সাথে গির্জার অফিসঘরের যাজকদের মেলাতে পারলাম না।

পরদিন একই সময়ে আমি আবার গির্জায় ঢুকলাম।

ক্যাথলিকদের কঠোরতার জন্য খ্যাতি আছে। তাদের ধারণা আছে যে, বিচার বড়ো নির্মম। কিন্তু ফাদার মার্টিনের সাথে আমার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা মোটেও তেমনটি নয়। তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমাকে চা এবং বিস্কুট খেতে দিলেন। এবং আমার সাথে বড়োদের মতো

আচরণ করলেন। তিনি আমাকে একটি গল্প বললেন। গল্পটি ছিলো কবে থেকে খ্রিস্টানরা বড় হাতের অক্ষর পছন্দ করে সে বিষয়ে।

কী এক গল্প! এ গল্পে বরং এ ধর্ম সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস জন্মালো। মানবজাতি পাপ করবে আর ঈশ্বরের পুত্র তার মাসুল দেবে? আমি কল্পনা করলাম ফাদার যেনো আমাকে বলছেন, "লাইসাইন, একটি সিংহ লামার গর্তে পড়ে গিয়েছিলো এবং দুটি লামাকে মেরে ফেলেছিলো। গতকাল আরেকটা সিংহ একটি হরিণ মেরেছে। গত সপ্তাহে দুটিতে মিলে একটি উট খেয়েছে। এর আগের সপ্তাহে সে একটি সারস এবং ধূসর বক খেয়েছে। এবং কে বলতে পারে হয়তো এটিই আমাদের সোনালি আগোতিকে খেয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রাণীগুলোর পাপমুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে ওগুলোকে সিংহের ভোগে পরিণত করা।"

"হ্যাঁ ফাদার, এগুলোই হবে সঠিক এবং যুক্তিসংগত করণীয়। আমাকে পরিষ্কার হয়ে আসার অনুমতি দিলে খুশি হই।"

"হেলেলুজাহ্ (ধন্য পরমেশ্বর) মাই সান।"

"হেলেলুজাহ্, ফাদার।"

কি ভাহা রহস্যময় গল্প। কী অদ্ভুত দর্শন। আমি ফাদারকে আরেকটি গল্প বলতে বললাম। হয়তো তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি। নিশ্চয়ই এই ধর্মে এমন অনেক গল্প আছে। কিন্তু ফাদার আমাকে বোঝালেন এ গল্পগুলো হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের অনেকটা আসর বন্দনা। তাদের মূল গল্প একটাই। এ গল্প তাঁরা বার বার পড়েন। এ এক গল্পই তাঁদের জন্য যথেষ্ট।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি হোটেলে ঝিম মেরে থাকলাম।

একজন দেবতা দুর্দশাগ্রস্ত হবেন—এ আমি ভাবতেই পানি না। পুরো রামায়ণেই কি রামের দীর্ঘ দুর্দশাগ্রস্ততার কাহিনী বর্ণিত হয়নি?—হ্যাঁ, হয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটেনি?—হ্যাঁ ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়নি?—হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে 'অবনতি' 'মৃত্যু' অমি কল্পনাও করতে পারি না শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে উলঙ্গ করা, চাবকানো, রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া এবং এতো উপরে ক্রুশবিদ্ধ করার কথা, তাও আবার কোন অমর দেবতা নয়—মানুষের হাতে! হিন্দু ধর্মে দৈত্য-দানবরা দুর্দশার শিকার হয়—দেবতারা নন। খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের পুত্র এভাবে মরে যায়? মানুষের হাতে! একবারের মৃত ঈশ্বর তো বরাবরেরই মৃত ঈশ্বর! খ্রিস্টানদের ঈশ্বর কেন সমস্ত ভোগান্তি নিজের ঘাড়ে নিলো? এমন ভয়ঙ্কর নির্যাতন কেন ঈশ্বর সইতে গেলেন? এই মৃত্যুর ভার তো মরণশীল মানুষের ওপরও বর্তানো যেতো! যা সুন্দর কেন তাকে কুৎসিত করা হলো? কেন যা সঠিক তাকে নষ্ট করা হলো?

—"ভালোবাসা।" ফাদার মার্টিনের উত্তর।

আর এই যে ঈশ্বরের পুত্রের নির্বাসন? এ কেমন কথা? শিশু কৃষ্ণের একটি গল্প আছে। একবার শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথীরা তাঁর বিরুদ্ধে পালক মা যশোদার কাছে এক মিথ্যা অভিযোগ করলো কৃষ্ণ গোবরের টুকরো খেয়েছে। যশোদা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করলেন, "দুষ্ট ছেলে, তোমার কখনও গোবর খাওয়া উচিত নয়।" "কিন্তু আমি তো খাইনি,"—জগতের মহাপ্রভু উত্তর দিলেন।

"তোমার মুখ খোলো তো, দেখি।" যশোদা কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না করে বললেন। কৃষ্ণ হা করলেন। যশোদা কৃষ্ণের মুখে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সমস্ত নক্ষত্ররাজি, স্থলভাগ, জলভাগ। "হে প্রভু, আপনি মুখ বন্ধ করুন।" যশোদা বললেন।

বিষ্ণুকে নিয়েও এমন গল্প আছে। রামকে নিয়ে আছে। এঁরাই হচ্ছে যথার্থ প্রভু।

অন্যদিকে খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের পুত্র অনাহারে থাকে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যায়। ক্লান্ত হয়। উদ্বিগ্ন হয়। আর শিষ্যরাও এমন-গুরুর কষ্টের ভাগ নেয় না। প্রতিপক্ষ তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। এ কেমন ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র, যিনি নিজেও ঈশ্বর, মাত্র তিন ঘন্টার মুখে গাজলা তুলে, মরণ আর্তনাদ করে, কেঁদে কেঁদে মরে যায়—এ কেমন ঈশ্বর? এই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি মুগ্ধ হবার কী আছে?

—"ভালোবাসা।" ফাদার মার্টিন বললেন। এবং এই ঈশ্বর একবারই মাত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাও অনেক অনেক আগে পশ্চিম এশিয়ার এক অজ্ঞ গোত্রে? তাঁর তো শ্রীকৃষ্ণের মতো একই সময় সর্বত্র বিরাজমান হওয়া উচিত, তাই না? এই স্বর্গীয় কার্পণ্যের ব্যাখ্যা কি?

—"ভালোবাসা।" ফাদার মার্টিন পুনরাবৃত্তি করলেন।

আমি কৃষ্ণপ্রেমেই মজে থাকবো। আপনাকে ধন্যবাদ। আমি তাঁর স্বর্গীয় দীক্ষা পেয়েছি। আপনি আপনার ঘর্মাক্ত, রক্তাক্ত যিশুকে আপনার কাছেই রাখুন।

এভাবেই বিপদগ্রস্ত রাব্বির সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিলো—অবিশ্বাস এবং যন্ত্রণাদগ্ধতার মাঝে। পরপর তিনদিন চা খেতে খেতে এভাবে আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি। কিন্তু ফাদার মার্টিনের উত্তর ছিলো ঐ একটিই—ভালোবাসা।

আমি তাঁকে মাথা থেকে সরাতে পারছিলাম না। এখনও পারিনি। পুরো তিনদিন আমি তাঁকে নিয়ে ভেবেছি। তিনি আমাকে যতো বিব্রত করেন তত কম আমি তাঁকে ভুলতে পারি। এবং তাঁর সম্বন্ধে যতো জানতে পারি ততো কম আমি তাঁকে পরিত্যাগ করতে চাই।

আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই আমরা মুন্নার ছাড়বো। ঠিক তখন খ্রিস্টান মনস্কতা আমাকে পেয়ে বসলো। খ্রিস্টান ধর্মটাই হচ্ছে দ্রুততার। এ ধর্ম অনুসারে মাত্র সাত দিনে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। যদি হিন্দু ধর্ম গঙ্গার মতো বয়ে যায় তা হলে খ্রিস্টান ধর্ম টরেনটোর ব্যস্ততম সময়ের মতো ধেয়ে চলে। এটা এমনই এক ধর্ম যার গতি চড়ুই পাখির মতো দ্রুত, এ্যাম্বুলেন্সের মতো এটি জরুরি। এক মুহূর্তের মধ্যে এখানে আপনি সব হারাতেও পারেন, পেতেও পারেন। খ্রিস্টান ধর্ম অতীত নিয়ে চর্চা করে, কিন্তু তরতাজা হয়ে এটি ধারণ করে বর্তমানকে অর্থাৎ ঠিক এখনকেই।

আমি দ্রুত পাহাড়ে উঠলাম। যদি ফাদার মার্টিনকে না পাই। কিন্তু পেলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি ছিলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "ফাদার, আমি খ্রিস্টান হতে চাই।" তিনি হাসলেন, "এর মধ্যেই তুমি খ্রিস্টান হয়ে গেছো পাইসাইন—তোমার হৃদয়ে। যে যিশুকে বিশ্বাস করে সেই খ্রিস্টান। তুমি এই মুন্নারে যিশুর সাক্ষাত পেলে।"

তিনি চাটি মেরে আমার মাথা নেড়ে দিলেন। এটা যেন এক বিস্ফোরণ ঘটালো আমার ভেতর। তাঁর হাত আমার মাথায় বুম! বুম! বুম! শব্দ করতে লাগলো যেনো। আমি খুশিতে ফেটে যাচ্ছিলাম।

"আবার যখন আসবে, আমরা একসাথে বসে চা খাবো।"

"জি ফাদার।"

তিনি আমাকে এক প্রশান্ত হাসি উপহার দিলেন। যিশু খ্রিস্টের হাসি।

এবার আমি নির্ভয়ে চার্চে প্রবেশ করলাম। এটা যে এখন আমারও চার্চ! আমি যিশুর উদ্দেশে প্রার্থনা করলাম, যিনি জীবিত। এরপর আমি বামের পাহাড় থেকে নেমে এলাম এবং ডানের পাহাড়ে উঠলাম—শ্রীকৃষ্ণকে ধন্যবাদ জানাতে যে, চলার পথে আমি মহান যিশুকে খুঁজে পেয়েছি।

১৮

এর পরই ইসলাম পর্বের শুরু। বড়োজোর এক বছর পরের ঘটনা। তখন আমার বয়স পনেরো। আমি আমার নিজ শহর ঘুরে ঘুরে চিনে নিচ্ছিলাম। মুসলমানদের নিবাস চিড়িয়াখানা থেকে খুব একটা দূরে নয়। ছোট্ট, শান্ত একটি মহল্লা। প্রতিটি বাড়ির প্রবেশদ্বারে আরবি লেখা এবং চাঁদ-তারা উৎকীর্ণ।

আমি মোল্লা স্ট্রীটে এলাম। আমি বাইরে থেকে সাবধানে জামে মসজিদটা উঁকি মেরে দেখে নিলাম। এটি একটি বড়ো মসজিদ। ইসলাম ধর্মের খ্যাতি খ্রিস্টান ধর্মের চাইতে কম। ঈশ্বর মাত্র একজন, হানাহানি বেশি এবং মুসলমানদের স্কুল সম্পর্কে কাউকে কোনো ভালো কথা বলতে শুনিনি। তাই জায়গাটা জনশূন্য হলেও ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলাম না। মসজিদটি পরিষ্কার এবং সাদা রঙের। শুধু এর প্রান্তসীমাগুলো সবুজ রঙের। খোলামেলা গঠনের মসজিদটির মূল কক্ষটি খোলা। পুরো মসজিদটির মেঝেতে মাদুর বিছানো। ভবনশীর্ষ থেকে দু'টি মিনার উঠে গেছে আকাশের দিকে যার পটভূমি একসারি বাড়ন্ত নারকেল গাছ। কোথাও কোনো ধর্মীয় আড়ম্বরতা নেই। আমার কৌতূহল এখানেই। কিন্তু এটি শান্ত এবং মনোরম।

আমি এগিয়ে গেলাম। মসজিদের পেছনেই সারি সারি গা ঘেঁসাঘেঁসি করা ছোট্ট বারান্দাঅলা বাড়ি। এগুলো ভাঙাচোরা এবং হতদরিদ্র। জীর্ণ দেয়ালগুলোতে শ্যাওলা ধরেছে। একটি একটি ঘরে দোকান। দোকানটির একিট তাকে দেখলাম নোংরা কয়েকটা বোতল। চারটি প্লাস্টিকের চকোলেটের বৈয়াম। কিন্তু এ দোকানের আসল পণ্য অন্য একটি জিনিস। চাপ্টা, গোল এবং সাদা। আমি কাছে গেলাম। দেখে মনে হয় খামির ছাড়া রুটি। আমি একটি তুললাম। শক্ত! তিনদিনের বাসি নানরুটির মতো। আমার ধাক্কা লাগলো—কেউ এগুলো খায়! আমি চুপিসারে একটি তুললাম এবং চেষ্টা করতে গেলাম ভাঙ্গা যায় কিনা।

"তুমি কি একটি খেয়ে দেখতে চাও?" কে যেন বলে উঠলো। আমি চমকে প্রায় লাফিয়েই উঠলাম। চার ফুট দূরেই বসে আছে লোকটি। রোদ আর ছায়ার লুকোচুরির কারণে আমি তাকে দেখতে পারিনি। আমি এমনভাবে চমকে উঠেছিলাম যে হাতের রুটিটি ছিটকে রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি টাটকা গোবরের ওপর পড়লো।

"আমি দুঃখিত, জনাব। আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।" আমার তখন দৌড়ে পালাবার অবস্থা।

"লজ্জার কিছু নেই," তিনি শান্তভাবে বললেন, "এটা গরুকে খাওয়ানো যাবে। তুমি আরেকটি নাও।"

তিনি দুটি রুটি তুললেন। আমরা একসাথে তুললাম। এটা শক্ত এবং রাবারের মতো। চিবোতে চিবোতে দাঁত লেগে আসে। আমি শান্ত হলাম।

"আপনি এতলো তৈরি করেন?" বলে আমি আলাপ শুরু করলাম।

"হ্যাঁ। এখানে এসো। দেখে যাও কিভাবে বানাই। তিনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে তাঁর বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন।

এটি দুই কামরার একটি ছোট্ট বাড়ি। বড়ো কামরার প্রায় পুরোটাই জুড়ে আছে একটি চুলা। এটি তাঁর বেকারি। জীর্ণ পর্দা দিয়ে পৃথক করা অন্য কামরাটি শোবার ঘর। তিনি আমাকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন কীভাবে রুটি তৈরি করতে হয়। এমন সময় মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে এলো। কথার মাঝখানেই থেমে গেলেন তিনি। বললেন, "দুঃখিত। তোমার একটু দাঁড়াও। আমি নামাজটা পড়ে নিই।"

তিনি নামাজ পড়া শুরু করলেন। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম কীভাবে নামাজ পড়ে। আমার মনে হলো এটা আর কিছুই নয় বরং ব্যায়াম। আমি ভাবলাম এটি বেদুইনদের গরম আবহাওয়ার যোগশাস্ত্র। তিনি পর্যায়ক্রমে চারবার বিড়বিড় করে আরবিতে কি যেন বলতে বলতে একই রকম করে গেলেন। তিনি ঘাড় ডানে-বায়ে ঘুরিয়ে নামাজ শেষ করলেন এবং দু'হাত তুলে মোনাজাত করে আমার দিকে ফিরে হাসলেন। তিনি তাঁর জায়নামাজ গোটালেন এবং সেটি পাশের কামরায় রেখে এলেন।

"বল তো আমি কি বলছিলাম?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

এভাবেই আমি জীবনে প্রথম মুসলমানদের নামাজ পড়া দেখলাম—দ্রুত, প্রয়োজনীয়, শারীরিক, যপ এবং নির্দেশিত। এরপর আমি চার্চে প্রার্থনা করতে গেলেই মুসলমানদের ঐ নামাজের কথা আমার মনে পড়ে যেতো।

১৯

আমি তাঁকে আবার দেখতে গেলাম।

"আপনার ধর্মটা কি সম্পর্কে?"—তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁর চোখ দ্যুতি ছড়ালো। "এটা হচ্ছে সৃষ্টিকে নিয়ে," তিনি উত্তর দিলেন।

আমি হলফ করে বলতে পারি যে, ইসলামের মূলনীতি যে উপলব্ধি করতে পারবে সে ঐ ধর্মকে ভালো না বেসে পারবে না। ত্যাগ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মহিমায় ভাস্বর এ এক অনন্যধর্ম।

মসজিদটা একেবারেই খোলামেলা। মুক্ত বায়ু এবং খোদার অপার মহিমা অবারিত। আমরা পা ভাঁজ করে ইমাম সাহেবের কথা শুনছিলাম। নামাজের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বয়ান করে যাচ্ছিলেন। নামাজের সময় হতেই ঝটপট উঠে দাঁড়ালো সবাই। এতোক্ষণ বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকা মুসল্লিরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো। আমিও দাঁড়ালাম। প্রতিটি সারির ফাঁকা জায়গা পিছনের লোক এসে ভরে দিলো। এভাবে প্রতিটি সারি হয়ে উঠলো ফাঁকহীন-নিপাট। সারির পর সারি করে নামাজিরা দাঁড়িয়ে গেলো। সেজদায় গিয়ে আমার কপাল মেঝেতে আনত হচ্ছিলো গভীর ধর্মীয় আবেগে—ঈশ্বরের প্রতি।

২০

তিনি একজন সুফি। একজন মুসলমান মরমী সাধক। তিনি ফানা চান। আল্লাহর সাথে একাত্ম হতে চান। আল্লাহর সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক। তিনি আমাকে বলতেন, "তুমি যদি আল্লার দিকে দু'কদম বাড়াও, আল্লাহ্ তোমার দিকে দৌড়ে আসেন।"

তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর পোশাক এবং চেহারা এমন অস্বাভাবিক কিছু নয় যে মনে থাকবে। প্রথমদিকে তাকে কি বেশে দেখেছি এবং প্রথম দর্শনে তাঁর চেহারা কেমন ছিলো মনে নেই। এমনকি যখন আমি তাঁকে ভালোভাবে চিনতাম, প্রায়ই সাক্ষাত হতো, আমি খুব কষ্ট করে তাঁকে চিনে নিতাম। তাঁর নাম ছিলো সতীশ কুমার। তামিল নাড়ু তে এ নামটি খুবই সাধারণ।

আমি আজও আশ্চর্য হই পেটা শরীরের এই রুটির দোকানি আর আমার অদ্ভুত দর্শন বাইওলজি শিক্ষক, কমিউনিস্ট, ছোটবেলায় যিনি পোলিওতে ভুগেছিলেন—এই দু'জনের নামই ছিলো সতীশ কুমার। মি. এবং মি. কুমার আমাকে বাইওলজি এবং ইসলাম শিখিয়েছিলেন। টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা এবং ধর্ম-শিক্ষা পড়ার ক্ষেত্রে আমার অনুপ্রেরণা এই মি. এবং মি. কুমার। ভারতে আমার তারুণ্যের দুই মহান দার্শনিক মি. এবং মি. কুমার।

আমরা একসাথে নামাজ পড়লাম এবং আল্লার নিরানব্বইটি নাম যপে যিগির করলাম। তিনি একজন কোরানে হাফেজ। আস্তে এবং সাধারণ স্বরে তিনি তেলাওয়াত করেন। আমার আরবি জ্ঞান খুব কম থাকলেও এর ধ্বনি মাধুর্য আমাকে মুগ্ধ করতো।

আগেই বলেছি মি. কুমারের বাড়িটি ছিলো ছোট্ট এবং ভাঙাচোরা। তবু কোন মন্দির-মসজিদ-গির্জাই আমার কাছে এতো পবিত্র মনে হতো না। আমি কখনও কখনও তাঁর বাড়ি থেকে এক গভীর অনুভূতি আর স্বর্গীয় সুখ নিয়ে বের হতাম। আমি সাইকেলে উঠেই প্যাডেল করতে করতে সেই স্বর্গীয় অনুভূতি বাতাসে ছড়িয়ে দিতাম।

এমনি একদিন আমি তাঁর বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। খুব উঁচু একটা জায়গায় এসে আমার এতো ভালো লেগে গেলো যে আমি না থেমে পারলাম না। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পাহাড়, সমুদ্র, গাছপালা, নীল আকাশে সাদা মেঘ—সবকিছু মিলে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য। মন যেন আমার তেপান্তরে মাঠ চষে বেড়াতে লাগলো। অথচ যাওয়ার সময় এই একই পথে গেছি। এই পাহাড়, সমুদ্র, গাছপালা সবই ছিলো। অথচ তখন এতো ভালো লাগেনি। সমস্ত প্রকৃতি যেন আমাকে ঘিরে সৌন্দর্যের ঐকতানে মেতেছে। আমার আত্মা আল্লার দর্শন পেলো। আরও একদিন আমি ঈশ্বরকে এমন কাছাকাছি পেয়েছিলাম। এটা আরও পরের ঘটনা। কানাডায় দেশী বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তখন ছিলো শীতকাল। আমি এক বন্ধুর বিশাল জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। রাতভর তুষারপাতের পর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার, নীল। সমস্ত প্রকৃতি বরফের কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। যখন আমি বাড়ির দিকে আসছিলাম, আমি ঘাড় ফেরালাম। ওদিকে ছিলো এক বন। আর সেই বনের ভেতর একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা। হঠাৎ ওঠা দমকা হাওয়া নাকি কোন পশু গাছের ডাল ধরে নাড়া দিয়েছিলো বলতে পারবো না। চমৎকার তুষার ঝরে পড়েছিলো। সূর্যের আলোয় তার ঝিলিক—ওহ্, অপূর্ব। সেই সোনালি তুষার গুঁড়োর ঝলমলে চমকে আমি ভার্জিন মেরিকে দেখেছিলাম। কেন

তাঁকে দেখেছিলাম জানি না। তাঁর প্রতি আমার আরাধনা দ্বিতীয় পর্যায়ের। তুব আমি তাঁকেই দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন সাদা পোশাক পরা, যাতে চিকন নীল পাড়। শান্ত, সৌম্য, পবিত্র। তিনি যেন আমাকে দেখে স্নেহের হাসিতে উদ্ভাসিত ছিলেন। আমার হৃদয় ভয়ে এবং আনন্দে দুলে উঠেছিলো।

এমনি করে ঈশ্বর দর্শন সুন্দরতম পুরস্কার।

২১

শহরতলির এক ক্যাফেতে বসেছিলাম চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে। পুরো দুপুরটা তাঁর সাথে
কাটিয়েছি। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সব সময় আমাকে উদ্বিগ্নতার বিষণ্ন সন্তুষ্টি এনে দেয় যা শেষ
অবধি আমার চরিত্রের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। আমাকে যা যন্ত্রণা দিচ্ছিলো—তা কি? তা হচ্ছে
"নীরস, মাদকতাহীন বাস্তবতা," "সেরা কাহিনী"। আমি কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলাম:
স্বর্গীয় অনুভূতির পঙ্‌ক্তিমালা : নৈতিক মহিমা; উন্নয়ন, গর্ব আর আনন্দের অশেষ অনুভূতি;
ত্বরিত নৈতিক জ্ঞান, যা কোনকিছুর জ্ঞানগর্ভ উপলব্ধির মতোই উদ্দীপ্ত করে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
নৈতিকতার সারিতে সারিবদ্ধ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক কিছুকে নয়; আমরা যাকে ভালোবাসা বলি তার
ভিত্তির অস্থিত্বের উপলব্ধি, যা কখনও কখনও আপনা-আপনি ক্রিয়াশীল হয় স্বচ্ছভাবে নয়,
পরিষ্কারভাবে নয়, তাৎক্ষণিক নয়—তা সত্ত্বেও অপরিহার্যভাবে।
একটু থামলাম। ঈশ্বরের নীরবতা?—আমি এ নিয়ে ভাবলাম। তারপর আরা লিখতে
থাকলাম :
এখনও এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তি এই পরম সাধন এবং অস্তিত্বে বিশ্বাসী অনুভূতি।

২২

এক নাস্তিকের শেষ কথা আমার বেশ ভালোমতোই মনে আছে : "সাদা, সাদা! ভা-ভা-ভালোবাসা! হা ঈশ্বর!"—অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় তাঁর ভেতর বিশ্বাস জন্মেছিলো। অন্যদিকে একজন অজ্ঞেয়বাদী যদি তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে যৌক্তিক কার্যকারণে স্থির থাকে, যদি সে নীরস মাদকতাহীন বাস্তবতায় তখনও অনড় থাকে তা হলে মৃত্যুকে সে বলবে, "সম্ভবত ম-ম-মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহের এ-এ-একটি ব্যর্থতা।" আর অন্তিত সময়ে এভাবেই ব্যর্থ হয় সে কোন দৃশ্যকল্প কল্পনা করতে।

২৩

ওহ্! সাধারণ সাম্প্রদায়িক ধারণা আমাকে কী বিপদেই না ফেললো! আমার ধর্মীয় কর্মকাণ্ড অনেকেরই কোন মাথা ব্যথার কারণ ছিলো না। তারা বরং এতে বেশ মজা পেতো। কিন্তু এক সময় আমার এই ব্যতিক্রমী ধর্মাচরণ তাদের নজরে এলো, যার এটাকে মোটেই মজার ব্যাপার মনে করলেন না।

"আপনার ছেলে মন্দিরে গিয়ে কী করে?"—যাজক বললেন।

"আপনার ছেলেকে গির্জায় বুকে ক্রস করতে দেখা গেছে।"—ইমাম বললেন।

"আপনার ছেলে তো মুসলমান হয়ে গেছে!"—বললেন পণ্ডিত।

এসব অভিযোগ আমার মা-বাবাকে হতবুদ্ধি করে তুললো। তাঁরা আমার এসব কাণ্ডকারখানার কিছুই জানতেন না। আপনারা জানেন টিন-এজাররা সব সময় তাদের মা-বাবার কাছ থেকে কিছু না কিছু লুকায়। ষোলো বছর বয়সীদের কিছু না কিছু গোপন ব্যাপার-স্যাপার থাকেই—তাই না? নিয়তির পরিহাসে একদিন 'গোডবার্ড সালাই' সমুদ্র সৈকতের ময়দানে আমার মা-বাবা, আমি আর ঐ তিন জ্ঞানীর দেখা হয়ে গেলো। আর এতে আমার গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেলো।

কোন এক তপ্ত রবিবারের দুপুর। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে আর নীল আকাশের নিচে বঙ্গোপসাগর ঝিকমিক করছে। শহরবাসী বেড়াতে বেরিয়েছে। ছেলে-মেয়েরা হৈচৈ করছে আর হাসাহাসি করছে। বাতাসে রঙিন বেলুন উড়ছে। আইসক্রিমের বিক্রি বেড়ে গেছে। এমন আনন্দময় দিনে তারা কেন যে ব্যবসার কথা ভাবে, ভেবে পাই না। তারা কি হেঁটে যেতে যেতে মাথা ঝুকিয়ে একটু হাসতেও পারে না? কিন্তু এটা তো আর হবার নয়!

আমাদের সাথে একজন নয়—তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তির দেখা হয়ে গেলো। তাও একজনের পর আরেকজন নয়, একেবারে একসাথে তিনজনের সাথে! এঁদের প্রত্যেকেই যেন পণ্ডিচেরির এই বিখ্যাত চিড়িয়াখানার মালিকের সাথে সাক্ষাতের এবং তাঁর গুণধর ধার্মিক পুত্রের গুণপনা তুলে ধরার জন্য এমন সুবর্ণ সুযোগই খুঁজছিলেন। প্রথমজনকে দেখে আমি মুচকি হাসলাম। কিন্তু একজন-দু'জন করে তৃতীয়জনকে দেখে আমার হাসি মিলিয়ে গেলো এবং আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যখন বুঝলাম এঁরা তিনজনই আমাকে নিয়ে কথা বলছে—ভয়ে আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ করতে লাগলো।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখন বুঝতে পারলেন তাঁরা তিনজনই একজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা যেনো একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। প্রত্যেকেই বোধহয় অন্যদের দেখে ভাবছিলেন—ওঁরা বোধহয় মেষপালক বা তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কোন আলাপ করতে এসেছে। তাঁরা অস্বস্তির দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

এমন সম্মানীয় তিন ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ভদ্রভাবে গতিরোধ করায় আমার মা-বাবা যেন একটু বিব্রতই বোধ করলেন। এখানে একটু পারিবারিক কথা বলে নিই। আমাদের পরিবার আর যাই হোক, অন্তত গোঁরা নয়। বাবা নিজেকে মনে করেন সদ্য স্বাধীন ভারতের এক অংশ, আধুনিক এবং আইসক্রিমের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ। আইসক্রিমের কথা বললাম এ কারণে যে, গরমের দিনে আইসক্রিম যেমন ছেলে-বুড়ো সবার প্রিয়, বাবারও তেমনি হিন্দু-মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ

সব ধর্মের লোকের প্রতি সমান আগ্রহ। তিনি তাঁর শরীরে কোন ধর্মীয় মেরুদণ্ড বহন করেন না। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, যথারীতি ব্যস্ত থাকতেন ব্যবসা নিয়ে, পেশাদারী মনোভাবের। কি করে সিংহের বংশবৃদ্ধি করা যায়, অসুস্থ প্রাণীকে কি করে সুস্থ করে তোলা যাবে, নতুন কোন প্রাণী আনা যায় কিনা—এইসব চিন্তাতেই সব সময় মগ্ন থাকতেন। অবশ্য এটা ঠিক, নতুন কোন প্রাণী চিড়িয়াখানায় তুললে তিনি যাজক ডেকে আশীর্বাদ করাতেন। এছাড়া চিড়িয়াখানায় দু'টি দেবমূর্তি পড়িয়েছেন। একটি গণেশের, অন্যটি হনুমানের। প্রাণী এবং প্রাণী সদৃশ বস্তুই হয়তো বেছে বেছে এ মূর্তি দু'টিই বানিয়েছেন তিনি। বাবার হিসাবী মূল্যায়ন হচ্ছে—এ দুটি তাঁর ব্যবসার উন্নতির জন্য, মোটেও তাঁর আত্মার উন্নতির জন্য নয়। মা ছিলেন স্বল্পবাক, ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ এবং খানিকটা বোধ হয় বিব্রতও। হিন্দু ঘরে লালিত-পালিত হওয়া এবং ব্যাপ্টিস্ট শিক্ষা স্পষ্টতই তাঁকে ধর্মের ব্যাপারে ধন্দে ফেলে দিয়েছিলো, যা তাঁকে করে তুলেছে শান্ত এবং ধর্মে অনীহ। ধর্মের ব্যাপারে আমি যে একটু ব্যতিক্রম, তিনি বোধহয় তা টের পেতেন। কিন্তু আমি যখন শিশু মনের কৌতূহল নিয়ে রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে লেখা কমিক্স পড়তাম কিংবা ছোটদের বাইবেল বা অন্য দেবতাদের বিষয়ে লেখা বই পড়তাম—তিনি কিছু বলতেন না। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় পাঠক। তিনি বরং আমাকে এসব বইয়ে মগ্ন থাকতে দেখে খুশিই হতেন; যেহেতু তিনি জানতেন আমি কোন খারাপ বই পড়ছি না। আর রবি? শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি না থেকে যদি ব্যাট থাকতো, যিশু যদি আরও সাধারণ বেশে একজন আম্পায়ার হয়ে তাঁর সামনে আসতেন, যদি হজরত মুহম্মদ (সাঃ) তাকে বোলিংয়ের কোন কৌশল দেখাতেন, তা হলে হয়তো রবির ধর্মে মন ধরতো।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছিলো। ভারিক্কি গলায় কথা বলে উঠে যাজক এই নীরবতা ভাঙলেন, 'পাইসাইন একজন ভালো খ্রিস্টান বালক। আশা করি তাকে শিগগিরই আমাদের গির্জায় দেখতে পাবো।"

আমার মা-বাবা, পণ্ডিত এবং ইমাম সাহেব আশ্চর্য হয়ে তাকালেন।

"আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। সে খুব ভালো মুসলিম বালক। সে প্রতি শুক্রবারই জুমা নামাজ পড়তে আসে এবং পাবিত্র কোরান সম্বন্ধে তার জ্ঞান চমৎকারভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।" যাজকের কথার পিঠে বলে উঠলেন ইমাম সাহেব।

আমার বাবা-মা, পণ্ডিত এবং অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকালেন। পণ্ডিত বলে উঠলেন, "আপনারা দু'জনই ভুল করছেন। সে একজন ভালো হিন্দু ছেলে। আমি তাকে সব সময়ই মন্দির দর্শন এবং পূজা করতে দেখি।"

আমার বাবা-মা, যাজক এবং ইমাম সাহেব আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। "আমি কোন ভুল করিনি," বললেন যাজক। "আমি এই বালককে চিনি। সে পাইসাইন মলিটর প্যাটেল এবং সে একজন খ্রিস্টান।"

"আমিও তাকে চিনি এবং আমি আপনাকে বলছি সে একজন মুসলমান।" জোর দিয়ে বললেন ইমাম সাহেব।

"যত সব বোকা!" চড়া গড়ায় পণ্ডিত বললেন, "পাইসাইন একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছে, একজন হিন্দুর জীবনযাপন করছে এবং একজন হিন্দু হিসেবেই সে মারা যাবে!"

তিন জ্ঞানী ব্যক্তি পরস্পরের দিকে নিঃশ্বাসহীন, রাগী চোখে তাকালেন এবং পরস্পরকে অবিশ্বাস করতে লাগলেন।

"ঈশ্বর! তাঁদের ক্রোধের দৃষ্টি আমার দিক থেকে সরিয়ে রাখো"—আমি মনে মনে যপতে থাকলাম।

সব চোখ আমার ওপর স্থির হলো।

"পাইসাইন, একি সত্যি হতে পারে?" ইমাম সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হিন্দু এবং খ্রিস্টানরা মূর্তি পূজারি। তাদের অনেক খোদা।"

"এবং মুসলমানদের অনেক মত," পণ্ডিত উত্তরে বললেন।

যাজক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁদের উভয়ের প্রতি তাকালেন। "পাইসাইন!" তিনি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, "যিশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা।"

"বাজে কথা! খ্রিস্টানরা ধর্মের কিছুই জানে না।" পণ্ডিত বললেন।

"তারা অনেক আগেই আল্লাহর পথ থেকে সরে গেছে।" ইমাম সাহেব বললেন।

"তোমাদের ধর্মে ঈশ্বর কোথায়?" মুখ ঝামটা দিলে বলে উঠলেন যাজক।

"তোমাদের একটা ঐন্দ্রজালিক উদাহরণ নেই এর জন্য। ইন্দ্রজাল ছাড়া এ আবার কেমন ধর্ম?"

"এটা কোন সার্কাস নয় যে মৃতব্যক্তি সব সময় সমাধি থেকে জেগে উঠবে—সেই জন্য! আমরা মুসলমানরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জাদুতেই কেবল মনোযোগী। পাখিরা ওড়ে, বৃষ্টি হয়, শস্য ফলে—আমাদের জন্য এ জাদুই যথেষ্ট।"

"পালক এবং বৃষ্টি খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু আমরা জানাতে চাই ঈশ্বর সত্যি সত্যি আমাদের সাথে আছেন।"

"তাই নাকি! আচ্ছা, যে ঈশ্বর আপনাদের মাঝে থেকে আপনাদের এতো উপকার করলেন, তাঁকে আপনারা হত্যার চেষ্টা করলেন! আপনারা তাঁকে বড়ো বড়ো পেরেক মেরে ক্রুশে ঝোলালেন! কোনো নবীর প্রতি এ কি কোনো সভ্য আচরণ? হজরত মুহম্মদ (সাঃ) আমাদের এই মহান বাণী শোনালেন যে—আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই আর তিনি পরিণত বৃদ্ধ বয়সেই ইন্তেকাল করেন।"

"ঈশ্বরের কথা বলছেন? মরুভূমির অশিক্ষিত আপনাদের বণিকের কাছে? ওগুলো হচ্ছে উঠের দোলানিতে মূর্ছা যাওয়া মুখে ফেনা ওঠা মৃগীরোগীর কথাবার্তা—কিছুতেই পবিত্র ওহি নয়। ওই ভিরমি লাগা অবস্থা অথবা তেজী রোদ হয়তো তাঁর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করে থাকবে।"

"আজ যদি নবী করিম (সাঃ) বেঁচে থাকতেন তা হলে তিনিই পারতেন আপনার কথার যথার্থ উত্তর দিতে," ইমাম সাহেব চোখ কুঁচকে বললেন।

"উত্তম, তিনি নেই! যিশু বেঁচে আছেন আর আপনার বৃদ্ধ সাঃ মৃত! মৃত! মৃত!"

এঁদের থামিয়ে শান্ত কণ্ঠে পণ্ডিত তামিল ভাষায় বলে উঠলেন, "আসল কথা হচ্ছে পাইসাইন কেন এইসব বিদেশী ভাষার পিছনে সময় নষ্ট করছে?"

যাজক এবং ইমাম সাহেব উত্তেজনায় হঠাৎ লাফিয়ে এগিয়ে এলেন আরও।

"ঈশ্বর শাশ্বত," যাজক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন।

ইমাম সাহেব সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে জোর গলায় বললেন, "আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়।"

"এবং মুসলমানরা তাদের একমাত্র আল্লাহ্‌কে নিয়েই সমস্যা বাধায় এবং দাঙ্গা উস্কে দেয়। এতেই প্রমাণিত হয় ইসলাম কতো খারাপ এবং মুসলমানরা কতো সভ্য।"—পণ্ডিত বলে উঠলেন।

"বলুন হিন্দু ধর্ম হচ্ছে বর্ণপ্রথার দাস-সর্দার। হিন্দুরা মানুষকে ক্রীতদাস বানায় এবং পুতুলকে পোশাক পরিয়ে পূজা করে।" ইমাম সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

"তারা হচ্ছে স্বর্ণালি গো-শাবকের ভক্ত। গরুর সামনে তারা হাঁট গেড়ে বসে।" যাজকের কণ্ঠে অভিযোগ।

এভাবে তাঁরা একে আরেকজনের প্রতি বিষোদ্গার কতোক্ষণ চালিয়ে যেতেন বলা মুশকিল। কিন্তু বাবা হাত তুলে তাঁদের থামিয়ে বলে উঠলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে শান্ত হোন। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এ দেশে সবারই যার যার মতো অনুশীলনের স্বাধীনতা রয়েছে।"

তিন আধ্যাত্মিক নেতাই তাঁর দিকে ফিরলেন।

"জি হ্যাঁ, অনুশীলন....।" তিনজনই সায় দিলেন। তিনজনই যাঁর যাঁর পক্ষে গর্জন করতে লাগলেন। বাবা এবং মা অনেকটা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

পণ্ডিত আবার বলে উঠলেন, "মি. প্যাটেল, পাইসাইনের ধর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হয়। এমন দুর্দিনে এমন একজন ছেলেকে ভগবানপ্রেমী হতে দেখে কী যে ভালো লাগে।" ইমাম সাহেব এবং যাজক মাথা দুলিয়ে বললেন, "কিন্তু সে একজন হিন্দু, খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান হতে পারে না। অসম্ভব। তাকেই তার পথ পছন্দ করে নিতে হবে।"

"আমি এটাকেও কোন অন্যায় মনে করি না। কিন্তু আমি ধরেই নিচ্ছি আপনারাই ঠিক।" বাবা উত্তর দিলেন।

তিনজনই বিড়বিড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে একমত হলেন যে, তাকেই তার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। মা আমার দিকে তাকালেন।

এক ভীষণ ভারি নীরবতা আমার কাঁধে চেপে বসলো।

"হুম্, পাইসাইন?" মা আমাকে ঝাকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রশ্নটি নিয়ে এখন কী ভাবছো?"

"বাপু গান্ধী বলেছেন, 'সব ধর্মই সত্য,' আমি শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাই।" আমি বোকার মতো বলে ফেললাম এবং লজ্জায় লাল হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তার পাশেই ছিলো মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি। হয়তো এ কারণেই আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিলো। বাবা গলা খাকারি দিয়ে নিচু গলায় বলে উঠলেন, "আমার মনে হয় আমরা সবাই সে চেষ্টাই করি—ঈশ্বরকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ হই।"

বাবার কথা শুনে আমি খুব মজা পাচ্ছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পর বাবাকে কখনও মন্দিরে যেতে দেখিনি। কিন্তু মনে হলো তার এ কথা কাজে দিয়েছিলো। তিন জ্ঞানী ব্যক্তি অনেকটা জোর করে ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে সস্মত দৃষ্টি বিনিময় করে চলে গেলেন।

বাবা আমার দিকে এক সেকেন্ডের জন্য তাকালেন। তার যেন মনটা এতে একটু ভালো হয়ে গেলো। বললেন, "কেউ আইসক্রিম খাবে?" এবং কাছের আইসক্রিম দোকানের কাছে গেলেন এবং আইসক্রিম কিনলেন। মা আমার দিকে প্রশ্রয়ের এবং সস্মতির দৃষ্টিতে তাকালেন।

এই হচ্ছে আমার আন্তঃধর্ম বিতর্কের সূচনা পর্ব। বাবা তিনটি আইসক্রিম এবং স্যান্ডউইচ কিনে আনলেন। খেতে খেতে আমরা ছুটির দিনের ভ্রমণ উপভোগ করতে লাগলাম।

২৪

খুনসুটি করার এক উপলক্ষ পেয়ে গেলো রবি। আমাকে পেলেই শুরু হতো তার মস্করা।

"তাহলে স্বামী মিত, আপনি কি এবার হজে যাচ্ছেন?" দু'হাতের তালু এক করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললো রবি।

"মক্কা কি আপনাকে ইশারায় ডাকছে?" খ্রিস্টানদের মতো বুকে ক্রস করে বললো।

"মহান পোপ হিসেবে অভিষিক্ত করার জন্য রোম কি আপনাকে ডাকছে?" সে তার ঠাট্টার বোঁচা আরও একটু শানিয়ে নিতে শূন্যে আঙুল দিয়ে একটি গ্রীক অক্ষর লিখলো। আর অবশ্যই সে π (পাই) অক্ষরটি।

"আপনি কি এখনও আপনার টিকি কেটে ইহুদী হওয়ার সময় পাননি? আপনি যদি বৃহস্পতিবার মন্দিরে, শুক্রবার মসজিদে, শনিবার সিনাগাগে (ইহুদীদের উপাসনালয়), এবং এভাবে রবিবার গির্জায় যেতে থাকেন; যদি আরও তিনটি ধর্ম যোগাড় করতে না পারেন তা হলে সারাজীবন সপ্তাহের বাকি তিনটি দিন আপনাকে ছুটির দিন হিসেবেই কাটাতে হবে।"

এবং এ ধরনের আরও কত্তো ধরনের মস্করা যে করতে লাগলো তার ইয়ত্তা নেই।

২৫

এখানেই এর শেষ নয়। কিছু কিছু লোক আছে যারা নিজেরাই ঈশ্বরকে রক্ষা করতে, ধর্মকে বাঁচাতে অতি উৎসাহী হয়ে নিজেদের ঘাড়ে সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ধর্মের নামে এরা জান কোরবানেও কুণ্ঠিত হয় না। অথচ এরাই যখন কোন বিধবা কুষ্ঠ রোগীকে ভিক্ষা করতে দেখে, চট পরা কোন টোকাইয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তো বলে, "বাহ! ভালো ব্যবসা ফেঁদেছে।" এরাই আবার ঈশ্বর সম্বন্ধে সামান্য বিরূপ মন্তব্য শোনা মাত্র খেপে যায়। তখন এ ব্যাপারে তারা যে সমাধান দেয় তা হয় ভয়াবহ।

এরা বুঝতে পারে না ঈশ্বরকে লালন করতে হয় অন্তরে। বাইরে আস্ফালন করে তাঁকে রক্ষা করা যায় না। এই ক্রোধ তাদের নিজেদের ওপরই প্রয়োগ করা উচিত। ভালোর যুদ্ধক্ষেত্র মোটেও খোলা প্রান্তরে নয় বরং প্রত্যেকের হৃদয় মন্দিরে। অন্যদিকে বিধবা ভিক্ষুক বা টোকাইদের জীবন হচ্ছে দুর্বিষহ। নিজেদের যারা সত্যিকারের ধার্মিক মনে করেন, ঈশ্বরকে বাঁচাতে নয় বরং এই দুস্থদের বাঁচাতেই তাদের ছুটে যাওয়া উচিত।

এক জড়বুদ্ধির মুসলমান আমাকে একবার বড়ো মসজিদে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করেছিলো। আরেকবার গির্জায় প্রার্থনা করতে গেছি—এক যাজক আমার দিকে কটমটিয়ে তাকালো। বাস, আমার আর সেদিন গির্জায় শান্তিতে প্রার্থনা করা হলো না। একবার এক ব্রাহ্মণ আমাকে মন্দিরে দেখতে পেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। আমার ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ গোপনে চুপিসারে বাবার কাছে লাগানো হতো।

এই সংকীর্ণমনারা কি ঈশ্বরের ভালো করেন?

আমার মতে ধর্ম আমাদের মর্যাদা বাড়ায়, নৈতিক বিচ্যুতি ঘটায় না।
এরপর থেকে গির্জায় আমি ভিড় এড়িয়ে চলতাম। শুক্রবার জুমার নামাজের পর আমি আর মসজিদে অপেক্ষা করতাম না। আর মন্দিরে যেতাম গাদাগাদি ভিড়ে, যাতে ব্রাহ্মণরা আমার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় না পায়।

২৬

সমুদ্র সৈকতের বালু বেলায় সেদিনের ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে। আমি বুকে সাহস সঞ্চার করে বাবার অফিসে ঢুকে পড়লাম।

"বাবা?"

"হুঁ, পাইসাইন।"

"আমি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে চাই এবং আমার একটি জায়নামাজ লাগবে।"

আমার কথা বুঝতে তাঁর একটু সময় লাগলো। কয়েক সেকেন্ড পর তিনি টেবিল থেকে মাথা তুললেন।

"একটি কি? কি?"

"আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে নামাজ পড়তে চাই। আর এতে যাতে আমার প্যান্ট নোংরা না হয় তার জন্য আমার একটি জায়নামাজের প্রয়োজন। আর একটি খ্রিস্টান স্কুলে পড়ি, দীক্ষা নেয়া একজন সাচ্চা খ্রিস্টান না হলে ব্যাপারটা লজ্জার হয় না?

"তুমি বাইরে গিয়ে কেন নামাজ পড়তে চাও? আর তুমি নামাজই বা কেন পড়তে চাও?"

"কারণ আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি।"

"আচ্ছা!" মনে হলো আমার উত্তর শুনে তিনি একটু হোঁচট খেলেন। টেবিল থেকে পুরোপুরি মুখ তুলে তিনি চেয়ারে পিঠ ঠেকালেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। আমি ভাবলাম তিনি হয়তো আবার আমাকে আইসক্রিম কিনে খাওয়াবেন।

"দেখ, পেটিট সেমিনারি স্কুল নামেই খ্রিস্টান। সেখানে অনেক হিন্দু ছাত্র পড়ে যারা খ্রিস্টান হতে হয়নি। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা না নিয়েও তুমি এখানে ভালো শিক্ষা পেতে পারো। তুমি আল্লার ইবাদতে নামাজ পড়লেও এখানে কিছু যায় আসে না।"

"কিন্তু আমি নামাজও পড়তে চাই, খ্রিস্টানও হতে চাই।"

"একসাথে তুমি দু'টোই করতে পারো না। তোমাকে অবশ্যই যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে।"

"আমি দু'টোই একসাথে হতে পারবো না কেন?"

"এগুলো আলাদা আলাদা ধর্ম। তাদের কোনকিছুতেই মিল নেই।"

"তারা ঠিক কথা বলে না। তারা উভয়েই দাবি করে নবী ইব্রাহিম তাদের ধর্মের। মুসলমানরা বলে হিব্রুদের ঈশ্বর, খ্রিস্টানদের ঈশ্বর আর তাঁদের আল্লাহ্ একই ব্যক্তি। তারা দাউদ (ডেভিড), মুসা (মোজেজ) এবং ইসাকে (যিশু) নবী মানে।"

"এগুলো নিয়ে আমাদের এতো মাথা ঘামাতে হবে কেন পাইসাইন? আমরা 'ভারতীয়', ব্যস।"

"শত শত বছর ধরে খ্রিস্টান এবং মুসলমানেরা ভারতে বাস করছে। কেউ কেউ বলে যিশুকে কাশ্মীরে কবর দেয়া হয়েছিলো।"

তিনি কিছু বললেন না। শুধু আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। হঠাৎ তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"এ ব্যাপারে তোমার মার সাথে কথা বলো।"

মা বই পড়ছিলেন।

"মা?"

"কি, সোনামণি?"

"আমি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিতে চাই এবং নামাজ পড়ার জন্য জায়নামাজ কিনতে চাই।"

"বাবাকে বলো।"

"বলেছিলাম। তিনি তোমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে বলেছেন।"

"সে তাই বলেছে?" তিনি বই নামিয়ে রাখলেন। তারপর জানালা দিয়ে চিড়িয়াখানার দিকে তাকালেন। আমি নিশ্চিত ঠিক ঐ সময়ে বাবা তাঁর ঘাড়ে বিরাগের শীতল হাওয়া অনুভব করছিলেন। মা বইয়ের তাকের দিকে ফিরলেন। "এই দেখ, এখানে একটা মজার বই আছে। এটি তোমার খুব ভালো লাগবে।" বলেই তিনি একটি বইয়ের দিকে হাত বাড়ালেন। বইটি ছিলো বর্বাট লুইস স্টিভেনসনের। আমাকে ভোলাবার এটা মার পুরনো কৌশল।

"আমি তো এটা পড়েছি মা! তিনবার।"

"ওহ্"। তাঁর হাত এবার বামদিকে সরলো।

"কোনান ডয়েল! এটাওতো পড়েছি।" আমি বললাম।

তাঁর হাত ডানদিকে ছুটে গেলো। "আর কে, নারায়ণ? তুমি নিশ্চয়ই নারায়ণের সব বই পড়েনি!"

"আমার ব্যাপারগুলো খুব জরুরি, মা।"

"রবিনসন ক্রুসো!"

"মা!!"

"কিন্তু পাইসাইন!" মা বলতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর চেয়ারে ফিরে গেলেন। তাঁকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিলো। আমি বুঝতে পারলাম এখন তাঁকে ঠিকমতো চেপে ধরতে পারলে কাজ হবে। তিনি একটি কুশন জায়গামতো রাখতে রাখতে বললেন, "তোমার বাবা আর আমার কাছে তোমার এই ধর্মীয় আরচণ রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

"এটা তো একটা রহস্যই।"

"হুম। আমি ঐ অর্থে বলিনি। শোনে, লক্ষীসোনা, তুমি যদি ধার্মিকই হতে চাও তা হলে তোমাকে হয় একজন হিন্দু, নয় খ্রিস্টান নয় মুসলমান হতে হবে। ধর্মীয় নেতারা সেদিন ময়দানে কি বলেছেন মনে নেই?"

"আমি বুঝতে পারছি না আমি তিনটি ধর্মই কেনো পালন করতে পারবো না। মামাজির দুটো পাসপোর্ট। একটি ফরাসী অন্যটি ভারতীয়। তাহলে আমি কেন একইসাথে একজন হিন্দু, খ্রিস্টান এবং মুসলমান হতে পারবো না।"

"এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ফ্রান্স আর ভারত এই পৃথিবীর বুকেরই দুটো দেশ।"

"আকাশে কয়টা জাতি আছে?"

তিনি এক মুহূর্ত ভাবলেন। "একটি। ব্যাপার তো সেটাই। এক জাতি, এক পাসপোর্ট।"

"আকাশে তাহলে একটি জাতি!"

"হ্যাঁ। নতুবা একটিও নেই। সেখানে ঐ বিকল্পও আছে, তুমি জানো। তুমি যাচ্ছো পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে।"

"আকাশে যদি একটিই জাতি থাকে তাহলে তো সেখানে সব পাসপোর্টই বৈধ, তাই বলো?"

অনিশ্চয়তার কালো মেঘ নেমে এলো তাঁর মুখে।

"বাপু গান্ধী বলেন,—"

"হ্যাঁ, অমি জানি বাপু গান্ধী কী বলেছেন।" তিনি তাঁর একটি হাত কপালে ঠেকালেন। তাঁকে কিছুটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। "হায় পোড়া কপাল," এক বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন তিনি।

২৭

সেদিন সন্ধ্যায় আড়িপেতে শুনলাম বাবা-মা কি বলছেন।

"তুমি হ্যাঁ বললে?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার ধারণা সে তোমাকেও এটা বলেছে। তুমি তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছো।" উত্তরে মা বললেন।

"আমি পাঠিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"আমার কাজের খুব তাড়া ছিলো।"

"এখন তো তুমি ব্যস্ত নও। এটা তো তোমাকে দেখতে হচ্ছে না! আরামসে সময় কাটাও। আর যদি তার রুমে গিয়ে তার পায়ের তলা থেকে জায়নামাজ টেনে সরিয়ে নিয়ে তার সাথে খ্রিস্টান ব্যাপ্টিজম নিয়ে আলাপ করতে চাও তো যাও। আমি আপত্তি করবো না।

"না, না।" কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলাম বাবা চেয়ারে বরং আরও যুত করে বসলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো।

"ধর্মগুলো ওকে কেমন আকর্ষণ করেছে দেখো। যেন কুকুরের চারপাশে ভন ভন করে মাছি," একটু থেমে বাবা আবার বললেন, "আমি এটা বুঝি না, আমরা আধুনিক ভারতীয় পরিবারের। আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি আধুনিক। ভারত একটি আধুনিক এবং উন্নত জাতি হিসাবে উন্নয়নের চূড়ায় উঠতে চলেছে আর সেখানে আমরা এমন এক ছেলের জন্ম দিয়েছি যে কিনা শ্রী রামকৃষ্ণের পুনরবতার!"

"মিসেস গান্ধী যদি তোমাদের আধুনিকতা আর উন্নয়নের প্রতীক হন তবে আমি ওঁকে পছন্দ করবো কিনা ভেবে দেখতে হবে।" মা বললেন।

"মিসেস গান্ধী উত্তরে যাবেন। আমাদের অগ্রযাত্রা থামানো যাবে না। উন্নয়ন যাত্রার এই তূর্যনাদে শরিক হয়ে আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। প্রযুক্তি সাহায্য করে আর তার ধারণা ছড়িয়ে পড়ে—প্রকৃতির এই হচ্ছে দুটি নিয়ম। তুমি যদি প্রযুক্তিকে কাজে না লাগাও, তুমি

যদি তার ধারণাকে, মঙ্গল চেতনাকে বাধা দাও তাহলে ডাইনোসরের মতো তোমার অস্তিত্বও একদিন বিলীন হবে। মিসেস গান্ধী অব্যর্থভাবে উত্তরে যাবেন। এক নতুন ভারত চমকে দেবে পৃথিবীর মানচিত্র।"

(অবশ্যই তিনি উত্তরে গিয়েছিলেন এবং নয়া ভারত বা তার একটি পরিবার কানাডায় চলে যেতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো!)

বাবা বলে যেতে লাগলেন, "তুমি শুনেছিলে যখন সে বলেছিলো, 'বাপু গান্ধি বলেছেন, "সব ধর্মই সত্য"'?"

"হ্যাঁ।"

"বাপু গান্ধী? ছেলেটি কি গান্ধীজির ভক্ত হয়ে উঠছে? বাবা গান্ধীর পরে কে? চাচা যিশু? আর এ কী আহাম্মকের কাণ্ড! সে কি সত্যিই মুসলমান হয়েছে?"

"আমার তাই মনে হয়।"

"একজন মুসলমান! একজন ভক্ত হিন্দু হোক ঠিক আছে, মেনে নেয়া যায়। তার সাথে যদি খ্রিস্টান হয় আমি আশ্চর্য হবো, তবে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারবো। খ্রিস্টানরা এখানে অনেককাল ধরে আছে, সেইন্ট টমাস, সেইন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার, মিশনারিরা এবং আরও অনেকে। ভালো ভালো কিছু স্কুলের জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী।"

"হ্যাঁ।"

"আর সব না হয় মেনে নেয়া যায়, কিন্তু মুসলমান? আমাদের কৃষ্টির কাছে এটা সম্পূর্ণ বিদেশী। তারা বহিরাগত।"

"তারাও এখানে বহুকাল ধরে আছে। এখানে তাদের সংখ্যা খ্রিস্টানদের চেয়ে শতগুণে বেশি।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। তারা বহিরাগত।"

"মনে হয় পাইসাইন ভিন্নধর্মী প্রগতির ড্রামবিটের সাথে মার্চ করছে।"

"তুমি তোমার ছেলের পক্ষে ওকালতি করছো? সে যে মুসলমান হওয়ার মকশো করছে এতে তুমি কিছু মনে করছো না?"

"আমরা কী করতে পারি সন্তোষ? সে এটা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে এবং এতে কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না। হতে পারে এটি একটি পর্যায় মাত্র। মিসেস গান্ধীর মতো সেও তো উত্তরে যেতে পারে!"

"সে কেন তার বয়সী ছেলেদের মতো স্বাভাবিক নয়? রবিকে দেখো। তার সমস্ত চিন্তা ক্রিকেট, সিনেমা আর সঙ্গীত নিয়ে।"

"তুমি কি মনে করো সেটাই ভালো?"

"না, না! ওহ্ আবি ভেবে পাচ্ছি না কী করবো। ওকে পথে আনতে হয়তো অনেকদিন লাগবে।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আমি ভেবে পাচ্ছি না সে এই আগ্রহ নিয়ে আর কতোদূর এগুবে!"

মা বাঁকা হেসে বললেন, "গত সপ্তাহে সে একটি বই শেষ করেছে। বইটির নাম, *'দি ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'*।"

"দি ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট! আমি আবার বলছি, আমার ভীষণ আশ্চর্য লাগছে সে এই বাতিক আর কতোকাল চালাবে!" বাবা চিৎকার করে বললেন।

তাঁরা এরপর হেসে উঠলেন।

২৮

আমি আমার জায়নামাজটিকে খুব ভালোবাসতাম। যদিও এটার মান আহামরি কিছু ছিলো না, কিন্তু তবু এটি সুন্দরের প্রতীক হয়ে আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতো। কী ইসলাম ব্যাপার—আমি এটি হারিয়ে ফেলেছি। যখন আমি এটি বিছাতাম তখন এর তলার মাটির জন্য এবং আমার চারপাশের সবকিছুর জন্য আমি খুব দরদ অনুভব করতাম। মনে হতো কী আসে না এই জায়নামাজ, কারণ এটিতে দাঁড়ালেই আমার মনে পড়ে যেতো এই মাটি, আকাশ, সাগর, বনানী—এই বিশ্ব নিখিল সব মহান আল্লাহর সৃষ্টি। লালেন ওপর সোনালি কাজ করা এই জায়নামাজে আমি এক মহান আধ্যাত্মিক পুলক অনুভব করতাম।

বাইরে নামাজ পড়তে আমি খুব ভালোবাসতাম। বেশিরভাগ সময়ে আমি এটি বাড়ির পিছনে উঠোনের এক কোনায় বিছাতাম। পলাশগাছের ছায়ায় ছিলো এক নিরালা জায়গা। এর পাশেই ছিলো এক দেয়াল, যাতে হাওয়ায় দোল খেতো থোকা থোকা লাল মাধবীলতা। চারপাশের গাছে গাছে মধুর কাকলিতে বাতাসকে ছন্দোময় করতো ময়না, টিয়ে, দোয়েল আরও কতো গায়ক পাখি। আমার চারপাশের এই যে প্রকৃতি ঋতু পরিবর্তনে এর কতোই না রূপ বদল হতো। এমনকি দিনে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম তাতে পাঁচবারই বদলে যেতো আমাকে ঘিরে থাকা দৃশ্যপট। কিন্তু যা ছিলো আমার স্মৃতিতে তা কখনও বদলাতো না। কেবলমাত্র হওয়ার সুবিধার জন্য আমি একটা চিহ্ন এঁকে নিয়েছিলাম।

কখনও কখনও নামাজ পড়া শেষ করে জায়নামাজ গুটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেতাম বাবা বা মা বা রবি তাকিয়ে আছে।

আমার খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা লাভের পর্বটি ছিলো একটু আনাড়ি ধরনের। মা বেশ ভালোই সাহায্য করতেন, বাবা এমনভাবে তাকিয়ে থাকতেন যেন মনে হতো পাথর কুঁদে তাঁর চোখ দুটো তৈরি করা হয়েছে। ক্রিকেট ম্যাচের অজুহাত দেখিয়ে রবি অনুপস্থিত ছিলো। একটি বড়ো কাঁচপাত্র থেকে খ্রিষ্টান ধর্মানুযায়ী পবিত্র বারি ফোঁটায় ফোঁটায় আমার মাথায় পড়ছিলো আর আমার মনে হচ্ছিলো, মৌসুমি বৃষ্টিতে আমার সব ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

২৯

মানুষ কেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়? কী তাদের শেকড় ছিঁড়ে, নিজের চেনা পরিবেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশে অনিশ্চেতের দিকে তাড়িয়ে নেয়? নিয়মবদ্ধ প্রথার এভারেস্ট চূড়া ডিঙিয়ে কেনো সে বেছে নেয় নিঃস্ব ভিখিরির জীবন? এই শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে তাকে কেন ঢুকতে হবে যেখানে সবকিছু অচেনা, অদ্ভুত এবং কঠিনসাধ্য?

এর উত্তর একটিই : মানুষ অধিকতর সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় ঘুরে বেড়ায়।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়টা ছিলো ভারতের জন্য অত্যন্ত খারাপ, দুর্যোগপূর্ণ। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বাবার কপালে ভাঁজ পড়া আর তাঁর চোখ কুঁচকে ওঠা দেখে আমি

এটা বুঝতে পারতাম। আরও বুঝতে পারতাম বাবা-মা এবং মামাজির কথাবার্তা থেকে। তাঁরা যা আলোচনা করতেন তার গূঢ় অর্থ যে আমি বুঝতে পারতাম না তা নয়, আসলে এসবে আমার কোন আগ্রহ ছিলো না। ওবাং-ওটাংগুলো আগের মতোই চাপাতি দেখলে পাগল হয়ে যেতো, বানর জিজেস করতো না দিল্লীর কী খবর, গণ্ডার এবং ছাগল আগের মতোই শান্তিতে বাস করছে. পাখি কিচিরমিচির করছে, মেঘ বয়ে আনছে বৃষ্টি, সূর্য আগের মতোই উত্তপ্ত, বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে পৃথিবী; আর ছিলেন ঈশ্বর—আমার জন্য আর কী চাই?

মিসেস গান্ধী শেষপর্যন্ত বাবাকে তাঁর কারিশমা দেখিয়েই ছাড়লেন। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তামিলনাড়ু তে দিল্লী তার শাসন জারি করে। তামিলনাড়ু ছিলো মিসেস গান্ধীর সবচেয়ে বড়ো সমালোচক। মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হলো আর তাঁকে করা হলো গৃহবন্দী। বাবার মূল্যায়নে এ ছিলো ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী আচরণ। চিড়িয়াখানার উট বুঝতেও পারলো না বাবা তাঁর বিশ্বাসের পাছায় কতো বড়ো লাথি মেলেন।

বাবা চিল্লিয়ে বললেন, "শিগগিরই তিনি আমাদের চিড়িয়াখানায় আসবেন এবং বলবেন, এই চিড়িয়াখানার ভার আমি নিয়ে নিলাম কারণ আমার জেলখানায় আর জায়গা নেই। আমরা কি দেশাইকে সিংহের সাথে রাখতে পারি?"

মোরারজি দেশাই ছিলেন একজন বিরোধী রাজনীতিক, মিসেস গান্ধীর বন্ধু ছিলেন না। বাবার একের পর এক হতাশা আর আক্ষেপের উক্তি আমাকে অস্থির করে তুললো। ইন্দিরা গান্ধী বোমা মেরে চিড়িয়াখানা উড়িয়ে দিলেও আর বাবার তাতে কোন ক্ষতি বা প্রতিক্রিয়া না হলে আমার কাছে ভাববার মতো এসব কোন বিষয়ই নয়। আমি কামনা করতাম বাবাকে যেন আর আঘাত সইতে না হয়। কোন পুত্রের জন্য তার পিতার বিধ্বস্ত অবস্থা খুবই কষ্টের, খুবই যন্ত্রণার।

বাবা ছিলেন খুবই উদ্বিগ্ন। যে কোন ব্যবসাই ঝুঁকির। চিড়িয়াখানা একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। পাবলিক লাইব্রেরির মতো, জাদুঘরের মতো এটি বিজ্ঞান এবং শিক্ষার সেবা করে থাকে। বৃহৎ কল্যাণ আর বৃহৎ মুনাফা হাত ধরে চলে না। আর তাই বাবার এই চিড়িয়াখানা যতোটা ছিলো বৃহৎ কল্যাণের ততোটা বৃহৎ মুনাফার ছিলো না। সত্যি কথা বলতে কি আমরা তেমন ধনী ছিলাম না আর কানাডার জীবন মানের তুলনায় তো নয়ই। জীব-জন্তুর এই বিশাল পরিবার নিয়ে আমরা আসলে ছিলাম এক গরিব পরিবার। এটা তখন এমন কোন বড়ো ব্যবসা ছিলো না যে আইনের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে আবার এর আয়োজন এতো ক্ষুদ্রও ছিলো না যে এই আয়েই ভালোমতো চলতে পারে। একটা চিড়িয়াখানার উন্নতির জন্য প্রয়োজন সংসদীয় গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং সর্বক্ষেত্রে এখানে প্রয়োজন ছিলো ভারতীয় সংবিধানের যথাযথ প্রতিফলন। দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থ রাজনীতি ব্যবসার জন্য খুবই খারাপ।

উদ্বেগ আকুল হয়েই মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে যায়। ভবিষ্যত অন্ধকার দেখলে, সন্তানের ভবিষ্যত অনিশ্চিত জানলে এই দুঃসময়ের আশু পরিবর্তনের লক্ষণ না দেখলে মানুষ অন্য জায়গায় ছুটে গিয়ে এইসব সমস্যার সমাধান করতে চায়। নতুন ভারতকে নিয়ে বাবার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। মা রাজি হলেন এবং আমরা আমাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেললাম।

একদিন সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে বাবা ঘোষণা করলেন। রবি আর আমি তড়িতাহতের মতো স্তম্ভিত হলাম। *কানাডা!* যদি এটা পাশের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ হতো, এমনকি শুধু একটি প্রণালী

(পক প্রণালী) পার হলেই যে দেশ সেই শ্রীলঙ্কাও হতো তবু না হয় কথা ছিলো কিন্তু এ যে কানাডা, যার অবস্থান ভূগোলকের ঠিক উল্টোদিকে! আমাদের চেনা-জানার অনেক বাইরের দেশ।

৩০

তিনি বিবাহিত। জুতো খোলার জন্য নিচু হতেই শুনলাম তিনি আমাকে বলছেন, "আসুন আমার স্ত্রীর সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।" আমি মাথা তুলতেই দেখলাম তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে....মিসেস প্যাটেল। "হ্যালো"—বলেই হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "পাইসাইন আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে।" একই কথা আমি তাঁকে শোনাতে পারলাম না। তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিলো না। তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন। তাই আমাদের আলাপ হলো সংক্ষিপ্ত। তিনিও ভারতীয়। তবে উচ্চারণটা কানাডিয়ানদের মতোই প্রায়। মনে হয় কানাডায় তিনি দ্বিতীয় প্রজন্মের। বয়সে তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে খানিকটা ছোটই হবেন। গায়ের রঙও স্বামীর চেয়ে আরেকটু শ্যামলা। ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। উজ্জ্বল কালো চোখ, দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা। তাঁর হাতে ধরা ছিলো ধবধবে সাদা ল্যাব-কোট। ডাক্তারদের এ্যাপ্রোনের মতো। তিনি একজন ফার্মাসিস্ট। যখন আমি বললাম, "আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগছে মিসেস প্যাটেল" তিনি উত্তরে বললেন, "প্লিজ, আমাকে মীনা বলে ডাকবেন।" এরপর দ্রুত স্বামীকে চুমু খেয়ে কাজে বেরুলেন তিনি।

এই বাড়িটাকে বাড়ি না বলে প্রতিমার বাক্সো বললেও চলে। ঢুকতেই স্বামী-স্ত্রীর ছবি। সারাঘর এমনি আরও কতো যে ছবি, প্রতিমা, মূর্তি! কিন্তু আমি এগুলো দেখছিলাম না। তিনি একজন লাজুক মানুষ। জীবন তাঁকে শিখিয়েছিলো নিজের কাছে যা মূল্যবান তা অন্যের কাছে জাহির করতে নেই।

মিসেস প্যাটেলই কি তা হলে আমার জন্য এই মজার মজার হজমিগুলো রান্না করেন?

"আপনার জন্য এই বিশেষ চাটনি বানিয়েছি," বলে হাসলেন তিনি।

৩১

মি. এবং মি. কুমারের একবার সাক্ষাত ঘটেছিলো। মি. এবং মি. কুমার—মানে সেই রুটির দোকানি আর শিক্ষক সতীশ কুমার। রুটির দোকানি মি. কুমার চিড়িয়াখানা দেখতে চেয়েছিলেন। "এতো বছর এখানে আছি অথচ দেখো, তোমাদের চিড়িয়াখানাটাই দেখা হয়নি। এটা এতো কাছে তবু দেখার সময় হয়নি। তুমি কি আমাকে এটি দেখাবে?"—তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, অবশ্যই", আমি বললাম, "এটা মাত্র এক ঘণ্টার ব্যাপার।"

আমরা ঠিক করলাম পরদিন স্কুল ছুটির পর চিড়িয়াখানার মেইন গেটে আমাদের দেখা হবে।

আমি সারাটাদিন উদ্বিগ্নে কাটালাম। মনে মনে নিজেকে খুব বকলাম, "তুমি একটা বুদ্ধু! কেন তুমি মেইন গেটের কথা বলতে গেলে? প্রায়সময়ই সেখানে লোকের ভিড় থাকে। তুমি কি ভুলে গেছো দেখতে কি সাদাসিধা তিনি? ভিড়ের ভেতর কিছুতেই তুমি তাকে চিনতে পারবে না।" আমি যদি তাঁকে না চিনে তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যাই তাহলে তিনি খুব আঘাত পাবেন। তিনি ভাবতে পারেন আমি মন পরিবর্তন করেছি এবং একজন গরিব মুসলমান রুটির দোকানির সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। সে ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা না বলেই চলে যাবেন। পরে দেখা হলে আমি যদি বলি চোখে রোদ পড়ার কারণে আমি তাঁকে দেখতে পাইনি—তিনি হয়তো এটা মেনে নেবেন কিন্তু আর কোনোদিনই হয়তো চিড়িয়াখানা দেখতে আসবেন না। যে করেই হোক তাঁকে চিনতেই হবে। আমি তাই ঠিক করলাম—লুকিয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবো। তাঁকে ঠিকমতো চিনে তবেই এগিয়ে যাবো। কিন্তু যদি তাঁকে চিনতে না পারি!

আমি ধন্ধে পড়ে গেলাম।

সময়মতো আমি মেইন গেটে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং দু'হাতে চোখ কচলাতে থাকলাম।

"তুই এখানে কি করছিস?"

রাজ। আমার বন্ধু।

"আমি ব্যস্ত।"

"তুই তো চোখ কচলাতে ব্যস্ত!"

" যা, ভাগ!"

"চল, বীচ রোডে যাই।"

"আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।"

"আচ্ছা! কিন্তু এভাবে চোখ কচলাতে থাকলে তো তাকে দেখতেই পাবি না!"

"বুদ্ধি দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। বীচ রোড়ে গিয়ে খেলগে, যা।"

"সরকারি পার্কে গেলে কেমন হয়?"

"বলেছি তো যাবো না।"

"চল না!"

"রাজ, প্লিজ, যা তো এখন!"

রাজ চলে গেলো। আমি আবার চোখ কচলাতে থাকলাম।

"অঙ্কের হোমওয়ার্কগুলো পারছি না। একটু দেখিয়ে দিবি, পাই?"

অজিত। আরেক বন্ধু।

"পরে। এখন যা।"

"আরে! পাইসাইন!"

মিসেস রাধাকৃষ্ণ। মার একজন বান্ধবি। অল্প কথায় তাঁকে তাঁর পথ দেখিয়ে দিলাম।

"খোকা, বলতে পারো ল্যাপোর্ট স্ট্রীট কোন্ দিকে?"

একজন আগন্তুক।

"ঐ দিকে।"

"চিড়িয়াখানায় ঢুকতে কতো লাগে?"

আরেক আগন্তুক।

"পাঁচ রুপী। ঐদিকে টিকেটঘর।"
"তোমার চোখে কি ক্লোরিন ঢুকেছে?"
মামাজির গলা।
"আরে! মামাজি! না, চোখে কিছু ঢোকেনি।"
"তোমার বাবা কি আশপাশে আছে?"
"মনে হয়।"
"আচ্ছা চলি, কাল সকালে দেখা হবে।"
"জি, মামাজি।"
"আমি এখানে, পাইসাইন!"

চোখের ওপর আমার হাত থেমে গেলো। সেই কণ্ঠ! একেবারেই সাধারণ। সাধারণের ভেতর অসাধারণ। আমি অনুভব করলাম আমার ভেতর থেকে হাসি ঠেলে বেরুতে চাইছে।

"আস্সালামু ওয়ালাইকুম মিস্টার কুমার! আপনাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে!"
"ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমার চোখে কি কোন অসুখ করেছে?"
"না, তেমন কিছু হয় নি। মনে হয় ধুলা গেছে।"
"খুব লাল হয়েছে।"
"ও কিছু না।"

তিনি টিকিটঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তাকে ফেরালাম।

"না, না। আপনার টিকেট লাগবে না। টিকেট মাস্টার!"

আমি গর্বের সাথে টিকেট কালেক্টরকে টিকেট না দিতে ইশারা করলাম এবং মি. কুমারকে চিড়িয়াখানার ভেতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম।

তিনি যা দেখছিলেন তাতেই আশ্চর্য হচ্ছিলেন। লম্বা লম্বা গাছের পাতা লম্বা গলা বাড়িয়ে জিরাফ কিভাবে খাচ্ছিলো, মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের কিভাবে তৃণভোজী প্রাণী খেতে দেয়া হয়, কিভাবে তৃণভোজীদের আবার ঘাস খাওয়ানো হয়, খাবার খেতে কিভাবে কোন কোন পাখি সরু লম্বা ঠোঁট ব্যবহার করে—এই ধরনের তিনি যা কিছু দেখছিলেন তাতেই মুগ্ধ হচ্ছিলেন।

পবিত্র কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি এসবের মাঝেও মহান আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন।

আমরা জেব্রার কাছে এলাম। মি. কুমার জীবনে এমন প্রাণীর নাম শোনেননি। দেখা তো দূরের কথা। জেব্রা দেখে তিনি যেনো বোবা হয়ে গেলেন।

"এগুলোকে বলে জেব্রা।" আমি বললাম।
"এগুলোকে কি ব্রাশ দিয়ে রং করা হয়েছে?"
"না, না। প্রাকৃতিকভাবেই এগুলো দেখতে এমন।"
"বৃষ্টি নামলে কি হয়?"
"কিছুই না।"
"ডোরা সাদা দাগগুলো ধুয়ে যায় না?"
"না।"

আমি কিছু গাজর নিয়ে এসেছিলাম। গাজরগুলো ছিলো বড়ো এবং মোটাসোটা। ব্যাগ থেকে একটি গাজর তুললাম। এমন সময় আমার ডানে মাটি ঘষটানে শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম মি. কুমার আসছেন। তিনি রেলিংয়ের কাছে আসতেই বললাম—

"হ্যালো, স্যার।"
"হ্যালো, পাই।"

লাজুক কিন্তু আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন রুটির দোকানি স্যারের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানালেন। স্যারও একই ভঙ্গিতে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

একটি চটপটে জেব্রা আমার হাতে গাজর দেখে নিচু বেড়া পর্যন্ত দৌড়ে এলো এবং আলতো করে সামনের একটি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো। আমি গাজরটি ভেঙে দু'টুকরো করলাম। এক টুকরো মি. কুমার এবং অন্য টুকরো মিস্টার কুমারকে দিলাম। "ধন্যবাদ পাইসাইন," একজন বললেন। "ধন্যবাদ পাই," অপরজন বললেন। এরপর দু'জনে খুব মজা করে জেব্রাকে গাজর খাওয়ালেন। দু'জনেই বাচ্চাদের মতো এটা উপভোগ করলেন। আমার কী যে ভালো লাগছিলো!

"এটাকে জেব্রা বলে?" জিজ্ঞেস করলেন মি. কুমার।
"জি!" উত্তর দিলাম, "এটা গাধা, ঘোড়া এবং জেব্রা একই পরিবারভুক্ত।"
"একই পরিবারের রোলস-রয়েস", বললেন স্যার।
"কী চমৎকার সৃষ্টি," মিস্টার কুমার বললেন।
"এগুলো হচ্ছে গ্রান্টস জেব্রা।" আমি বললাম।
স্যার জেব্রার বৈজ্ঞানিক নাম বললেন,"ইকুয়াস বারচেল্লি বোহ্মী।"
মি. কুমার বললেন, "আল্লাহ্ আকবর।"
আমি বললাম, "কী চমৎকার।"
এবং আমরা দেখতে থাকলাম।

৩২

পশুদের অদ্ভুত আচরণের অনেক উদাহরণ আছে। ঈশ্বরকে মানুষের আদলে কল্পনা একটি প্রাচীন রেওয়াজ। অন্যদিকে পশুকে মানুষের আদলে কল্পনা করেও অনেক উপকথা চালু আছে। বাস্তবেও পশুদের এমন আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হচ্ছে পোষা কুকুর। এরা মানুষকে অনেকটা নিজেদের সমগোত্রীয় বলেই মনে করে। আর তাই তার মনিবের সাথে তার আচরণ একেবারেই বন্ধুর মতো। লক্ষণীয়, অচেনা মানুষকে কিন্তু এরা ছেড়ে কথা বলে না। মনিবের সাথে যেমন এর বন্ধুর মতো আচরণ, যা মানুষের আচরণের মতোই; অন্যদিকে অপরিচিতদের সাথে এদের আচরণ পশুর মতোই।

আমাদের সোনালি আগোতি আর চিত্রা হরিণ একই ঘেরের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতায় বাস করতো। আমি আগেই বলেছি আমাদের গণ্ডার আর ছাগলের একইসাথে বাস করার কথা। সার্কাসের সিংহ কিভাবে পোষ মেনে থাকে তাও বলেছি।

এমন বাস্তব উদাহরণও আছে যে সমুদ্রে ডুবন্ত নাবিককে এক ঝাঁক ডলফিন মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ভাসিয়ে রেখে তাদের জীবন বাঁচিয়েছে।

একটি বেজির সাথে এক ধেড়ে ইঁদুরের বন্ধুত্ব হয়েছিলো। তারা একই সাথে বাস করতো। কিন্তু ঐ বেজির খাঁচায় অন্য ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে বেজিটি এই অপরিচিত ইঁদুরকে খেয়ে ফেলছে।

আমাদের চিড়িয়াখানাতেই এমনটি ঘটতে দেখা গেছে। আমাদের একটি ইঁদুর ছিলো যে কয়েক সপ্তাহ ভাইপারের (গ্রেট ব্রিটেনের বিষধর সাপ) বাস করেছে। অথচ সাপের এ খাঁচায় অন্য অনেক ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে দু'দিনেই এরা ভাইপারের পেটে হজম হয়ে গেছে। তো আমাদের এই ইঁদুরটি ভাইপারের খাঁচায় বাসা বানিয়ে বেশ ছিলো। নানা ইশারা ইঙ্গিতে এটিকে এর বাসা থেকে বের করে ভাইপারের কাছাকাছি এনে দশর্কদের ক'দিন বেশ মজা দেয়া গিয়েছিলো। এর এই মজার জীবনের ইতি ঘটেছিলো এভাবে : একদিন এক বাচ্চা ভাইপার এটিকে কামড়ে দিলো। ভাইপারটা ঐ মুহূর্তে এই ইঁদুরের সামাজিক মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে থাকবে হয়তো। ব্যাপার যাই হোক ছোট্ট ভাইপারটা একে কামড়ালো, কিন্তু গিলে খেলো না। কিন্তু ঐ মুহূর্তে একটি বড়ো ভাইপার এসে ইঁদুরটাকে গিলে খেলো। এর পর থেকে ঐ ভাইপারের খাঁচায় যতো ইঁদুর দেয়া গেছে সবই প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ভাইপারের পেটে গেছে। আমাদের ব্যবসায় কখনও কখনও কুকুরকে দিয়ে সিংহশাবকের দাইমার কাজ করানো হয়। সিংহশাবক যখন কুকুরের দুধ খায় তখন সে মনে করে তার মায়ের দুধই খাচ্ছে। কুকুরটিও দেখা যায় মাতৃস্নেহে সিংহশাবককে দুধ খাওয়াচ্ছে।

৩৩

তিনি আমাকে পারিবারিক স্মৃতি দেখালেন। প্রথমেই বিয়ের ছবি। কানাডায় এক হিন্দু বিয়ের ছবি। ছবিতে আরও কম বয়সের তিনি, আর কম বয়সের তাঁর স্ত্রী। তাঁরা নায়াগ্রা জলপ্রপাতে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন। তাঁদের তখন মধুর জীবন। ছবিতে হাসি দেখলেই তা বোঝা যায়। আমরা আরও অতীতে চলে গেলাম। টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবনের ছবি। তাঁর বন্ধুদের সাথে। সেন্ট মাইক'স-এ। তাঁর রুমে। দেওয়ালির দিন গেরার্ড স্ট্রীটে। সেই বাসিল'স গির্জায় সাদা গাউনে, পড়ছেন। অন্যধরনের সাদা গাউন পরে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের পরীক্ষাগারে। সব ছবিতেই ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। কিন্তু তাঁর চোখ বলছে অন্য কথা।

ব্রাজিলের ছবি। তিন আগুলে স্লথের সাথে অনেক ছবি, সিটু জঙ্গলে। এ্যালবামের আর একটি পাতা উল্টাতেই প্রশান্ত মহাসাগরের এপারের কাহিনী শেষ। তারপর কয়েক পাতা খালি। প্রশান্তের ওপারের অর্থাৎ পন্ডিচেরির কথা উঠতেই বললেন ওখানে প্রতি পরব-অনুষ্ঠানেই ছবি তোলা হতো। কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। কিছু ছবি অবশ্য আছে। সেই ঘটনার পর এগুলো মামাজি তাঁর সংগ্রহ থেকে ডাকে পাঠিয়েছেন।

চিড়িয়াখানায় এক ভি.আই.পির পরিদর্শনের ছবি। সাদা-কালো ছবিতে সাজানো আরেক জগত আমার সামনে তুলে ধরা হলো। ভি.আই.পির ছবির কোনার দিকে আমার চোখ আটকে গেলো। কম বয়সের মি. আদিরূপ স্বামীকে চিনতে পারলাম।

"মামাজি?"—জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ।" তাঁর উত্তর।

মন্ত্রীর পাশে আরেকজন লোক, কালো ফ্রেমের চশমা, খুব পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। সম্ভবত মি. প্যাটেল।

"আপনার বাবা?" ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি জানি না তিনি কে।" তিনি মাথা নেড়ে বললেন। কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর তিনি বললেন, "আমার বাবা ছবিগুলো তুলেছিলেন।

একই পাতায় আরেকটি গ্রুপ ছবি। বেশিরভাগই স্কুল ছাত্র। তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন, "এই হচ্ছে রিচার্ড পার্কার।"

আমি বেশ মজা পেলাম। আরও ঝুঁকিয়ে দেখলাম। ছবিটা সাদা-কালো, তার ওপর আবার কিছুটা অস্পষ্ট। রিচার্ড পার্কার এক কোনায়, অন্যদিকে তাকিয়ে। চেহারাটা আমার কাছে স্পষ্ট হলো না।

পরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাজুড়ে এক রঙিন ছবি। ছবিটা অরবিন্দ আশ্রমের। একটা বড়ো আউটডোর সুইমিংপুল, টলটলে স্বচ্ছ পানি। পরের ছবিটা পেটিট সেমিনারি স্কুলের প্রবেশদ্বারের। একটা অর্ধবৃত্তাকার কাঠামোয় স্কুলের মোটা লেখা : ভালো না হলে মহান হওয়া যায় না।

তারপর চারটি ছবিতে পুরো শৈশব।

তিনি বিষণ্ন হয়ে উঠলেন।

"সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে," তিনি বলতে শুরু করলেন, "মার সম্বন্ধে আমি খুব অল্পই মনে করতে পারি। আমার মনের ভেতর তাঁকে ঠিকই দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর অবয়বটা ঠিক ধরা দেয় না; এটা মনে হয় মনের ভেতর এই ভেসে উঠছে, টের পাওয়ার আগেই তা আবার হারিয়ে যায়। তাঁর কণ্ঠস্বরের বেলায়ও একই কথা। যদি তাঁকে আবার খুঁজে পেতাম, তাহলে হয়তো আমার সমস্ত স্মৃতি আবার ফিরে আসতো। কিন্তু তা বোধ হয় আর হবে না। আপনার মা দেখতে কেমন ছিলেন এটা স্মরণ করতে না পারা যে কতোটা কষ্টের!"

তিনি এ্যালবাম বন্ধ করলেন।

৩৪

বাবা বললেন, "আমরা কলম্বাসের মতো জাহাজে করে যাব!"

"কলম্বাসের ইচ্ছে ছিলো ভারতকে খুঁজে বের করার," আমি অনেকটা রাগের সাথে বললাম।

একটি নতুন দেশে নতুন জীবনের আশায় আমরা চিড়িয়াখানা এবং এর অনুষঙ্গিক সবকিছু বিক্রি করে দিলাম। এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যত গড়ার জন্য এবং অভিবাসনের নানামুখী খরচে আমাদের এক বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ করি (আজ ভাবি এগুলো কী বোকার কাজই না

ছিলো!)। আমরা আমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলো ভারতীয় চিড়িয়াখানাগুলোকে বিক্রি করতে পারতাম, কিন্তু আমেরিকার চিড়িয়াখানাগুলো আরও বেশি দামে কিনতে আগ্রহী ছিলো। কিন্তু পথে প্রজাতিসমূহের ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তি (CITES) সবে স্বাক্ষরিত হয়েছে। জঙ্গল থেকে প্রাণী সংগ্রহে করা এই চুক্তির বলে বেআইনী হয়ে গেলো। চিড়িয়াখানাগুলোকে তাই প্রাণী সংগ্রহে এখন অন্য চিড়িয়াখানার ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের জীবজন্তু কেনার জন্য তাই হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। যেসব চিড়িয়াখানা আমাদের প্রাণীগুলো কিনলো তারা হচ্ছে সিকাগোর লিঙ্কন জু, ব্যবসা শুরু করতে যাওয়া মিনেসোটা জু এবং লস এঞ্জেলেস, সুইসভিল, ওকলাহামা সিটি এবং সিনসিনাতির চিড়িয়াখানাগুলো।

আর দুটি জন্তুকে পাঠানো হলো কানাডার চিড়িয়াখানায়। সেই জন্তু দুটি হচ্ছে রবি এবং আমি। আমরা যেতে চাইনি। আমরা এমন দেশে যেতে চাইছিলাম না যেখানে সব সময় হু হু করে বাতাস বয় আর হিমাঙ্কের ২শ' ডিগ্রী নিচে থাকে তাপমাত্রা। ক্রিকেট মানচিত্রে কানাডার নাম নেই।

নথিপত্র চালাচালি করতে হলো পাহাড় প্রমাণ। ডাকটিকেট লাগাতেই বোধ হয় কয়েক লিটার পানি লেগেছিলো। চিড়িয়াখানা ব্যবসায় একটি চুটকি চালু আছে—একটি (ইঁদুর জাতীয় পতঙ্গভুক ক্ষুদ্র প্রাণী) কেনা-বেচা করতে হাতির ওজনের কাগজপত্র চালাচালি করতে হয় আর একটি হাতি কেনা-বেচা করতে লাগে তিমির ওজনের সমান কাগজপত্র। আর এ জন্য কোন বোকাও তিমির ব্যবসা করবে না কারণ তখন হয়তো পৃথিবীর ওজনের সমান ওজনের কাগজ চালাচালি করতে হবে।

ব্যাপারটা অদ্ভুতই বলতে হবে। চিড়িয়াখানার সমস্ত প্রাণী যেন বোবা হয়ে গেছে। ওরা কি বুঝেছে কে জানে—সবাই যেন একযোগে নীরবতা পালন শুরু করেছে। হাতে একটি চিঠি দোলাতে দোলাতে বাবা একদিন চিৎকার করে উঠলেন, "একটি ক্যাটারেক্ট অপারেশন, বুঝলে। তারা আমাদের জলহস্তিটিকে কিনতে রাজি আছে যদি আমরা এর ডান চোখের ছানির ক্যাটারেক্ট অপারেশন করাই। তারপর হয়তো বলবে গণ্ডারের নাক কাটতে হবে! যত্তোসব!" প্রত্যেকটি প্রাণীর বিক্রির ব্যাপারেই এরকম কমবেশি ঝামেলা হতে লাগলো। একটি চিড়িয়াখানা তাদের বাচ্চাদের চিড়িয়াখানার জন্য একটি ব্রাহ্মণ গরু চেয়ে বসলো। বাবা অনেক খুঁজে শেষে নধরকান্তি গভীর কালোচোখের, খাড়া-চোখা শিঙের একটি গরু কিনে দিয়েছিলেন।

সেদিন তিনজন আমেরিকানের একটি দল এলো। গায়ের রং গোলাপী মোটা-সোটা গড়নের, কিন্তু আচরণ অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। এর আগে আমি কোন আমেরিকান দেখিনি। দারুণ কৌতূহল নিয়ে আমি তাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। তারা আমাদের জন্তুগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছিলো। ওগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে স্টেটেস্কোপ দিয়ে এগুলোর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করছিলো। মল-মূত্র পরীক্ষা করছিলো, রক্ত নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করছিলো আরও কত্তো কী! এই অভাগা জন্তুগুলোর জন্য আমার খুব মায়া হচ্ছিলো। এদের পরীক্ষার ধরণ-ধারণ দেখে মনে হচ্ছিলো এগুলোকে তারা আমেরিকান মিলিটারিতে ভর্তি করবে।

পরিণামে জন্তুগুলোরও আমাদের মতো কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে হলো। তবে তারা হবে ভবিষ্যত ইয়াঙ্কি আর আমরা ভবিষ্যত কানাডিয়ান।

৩৫

২১ জুন, ১৯৭৭ আমরা মাদ্রাজ ত্যাগ করলাম। আমাদের জাহাজের নাম ছিলো সিমিটসুম। এটি ছিলো পানামায় নিবন্ধিত জাপানী জাহাজ। এটি ছিলো বেশ বড়ো এক মালবাহী জাহাজ এবং দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। এর অফিসাররা ছিলো জাপানী কিন্তু ক্রুরা তাইওয়ানিজ। পন্ডিচেরিতে আমাদের শেষ দিনটিতে মামাজির কাছ থেকে বিদায় নিলাম, মি. এবং মি. কুমারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, বিদায় নিলাম অনেক বন্ধু, এমনকি অনেক আগন্তুকের কাছ থেকেও। মা তাঁর সবচেয়ে সুন্দর শাড়িটি পরেছিলেন। খুব পরিপাটি করে সেজেছিলেন মা। তাঁকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। এবং বিষণ্ণও লাগছিলো। ভারতকে ছেড়ে যেতে, এর মৌসুমী বায়ু, সমুদ্র সৈকত, পাথরের মন্দির, গরুর গাড়ি, কাবেরি নদীকে ছেড়ে যেতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

যাত্রার একদিন আগে মা হঠাৎ এক সিগারেটের হকার কে ডেকে বললেন, "এক-দুই প্যাকেট সিগারেট পাওয়া যাবে?"

বাবা থতমথ খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কানাডায়ও তো সিগারেট পাওয়া যায়। আর তুমি সিগারেটই বা কিনতে চাচ্ছো কেন? আমরা কি সিগারেট খাই?

হ্যাঁ কানাডায় সিগারেট পাওয়া যায়—কিন্তু সেখানে কি গোল্ডলিফ সিগারেট পাওয়া যায়? অরণ আইসক্রিম পাওয়া যায়? হিরো বাইসাইকেল? অনিডা টেলিভিশন? এ্যাম্বাসেডার গাড়ি? আমার মনে হচ্ছিলো এমন প্রশ্নই মার মনে উদয় হচ্ছিলো।

পশুগুলোকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে খাঁচায় ভরা হলো। খাঁচাগুলো জাহাজে তোলা হলো এবং বাঁধাছাদা করা হলো। জাহাজে খাদ্য এবং পানীয় ভরা হলো। সমস্ত প্রস্তুতি শেষে ভেঁপু বেজে উঠলো। জাহাজ চলতে শুরু করলো। আমি হাত নেড়ে ভারতকে বিদায় জানালাম। চারদিক রোদ চকচক করছিলো। ধীরে ধীরে হাওয়া বইছিলো। আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিলো এক ঝাঁক গাংচিল। আমি ভয়ে উত্তেজিত ছিলাম।

মানুষ যেরকম চায় ব্যাপারগুলো সেরকম ঘটে না। কিন্তু মানুষ কি বা করতে পারে। জীবন যেভাবে, যেরূপে আসে সেভাবেই আপনাকে তা গ্রহণ করতে হয় এবং আপনাকে চেষ্টা করতে হয় যে জীবন আপনি পেয়েছেন তাকে তার সেরা পর্যায়ে উন্নীত করার।

৩৬

ভারতের নগরগুলো বড়ো বড়ো এবং জনবহুল। কিন্তু আপনি যখন সেই নগরী ছেড়ে অনেক কম জনসংখ্যার কোন দেশে যাবেন দেখবেন রাস্তাঘাট কী ফাঁকা আর অনেক খুঁজে তবে হয়তো কোন জনমানুষ দেখতে পাবেন। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম সেখানে কি করে ৯৫০ মিলিয়ন ভারতীয় বাস করে।

তাঁর বাড়ি সম্বন্ধেও আমি একই কথা বলতে পারি। আমি একটু আগেভাগেই চলে এসেছিলাম। সামনের বারান্দার সিমেন্টের সিঁড়িতে যখন পা রাখলাম—এক কিশোর ছুটে বেরিয়ে সামনের দরোজা দিয়ে। সে বেসবল খেলার পোশাক পরে ছিলো এবং তার হাতে ছিলো বেসবল খেলার সরঞ্জাম আর সে ছিলো ব্যস্তসমস্ত। আমাকে দেখেই সে ব্রেক কষে থেমে গেলো এবং চমকে উঠলো। সে চারদিকে তাকালো এবং বাড়ির ভেতরকে উদ্দেশ করে চিৎকার বললো, "বাবা! এই যে লেখক এসেছেন।" এরপর সে আমার দিকে ফিরে বললো, "হাই!" তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলো।

তার বাবা সামনের দরোজায় উদয় হলো, এবং বললো, "হ্যালো।"

"ওটি আপনার ছেলে?" কৌতূহল না চাপতে পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঠোঁটের কোনায় হাসি ধরে রেখে তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আমি দুঃখিত, তার সাথে আপনার ভালোমতো সাক্ষাত হলো না। ওর আবার প্রাকটিসের তাড়া। ওর নাম নিখিল। সবাই ওকে নিক্ বলে ডাকে।"

হলঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, "আপনার যে একটি ছেলে আছে জানতাম না।" একটি ছোট কালো এবং বাদামী রঙের কুকুর আমার দিকে দৌড়ে এলো। সে আমার পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠলো। "আর জানতাম না আপনার একটি কুকুর আছে।" আমি যোগ করলাম।

"সে বকুর মতো। টাটা, নেমে আয়।"

কিন্তু টাটা তাঁর কথা শুনলো না। আমি শুনতে পেলাম "হ্যালো।" খুব টেনে টেনে নরম গলায় কথাটি উচ্চারিত হলো।

আমি সেদিকে ফিরলাম। সোফায় পিঠ ঠেকিয়ে, আমার দিকে লাজুকভাবে তাকিয়ে আছে গোলাপী রঙের ছোট্ট এক মেয়ে। তার হাতে ধরা ছিলো কমলা রঙের একটি বিড়াল। বিড়াল তার হাতে ধরা থাকলেও শরীরের বাকি অংশ ঝুলে আছে মেঝে পর্যন্ত। এভাবে ঝুলে থাকলেও মনে হলো বিড়ালটি বেশ আরামেই আছে।

"এবং এটি আপনার মেয়ে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ। উষা, লক্ষ্মীসোনা ওভাবে যে ধরে আছো ওতে কি মোক্কাসিন আরাম বোধ করছে?"

উষা মোক্কাসিনকে নামিয়ে দিলো।

"হ্যালো উষা!" আমি মেয়েটির সাথে খাতির জমাতে চাইলাম। সে বাবার কাছে গেলো এবং বাবার পায়ের পিছন থেকে আমার দিকে উঁকি মারতে লাগলো।

পাইসাইন প্যান্টেল, সবাই যাকে পাই প্যান্টেল বলে চেনে, নিচু হয়ে মেয়েকে কোলে নিলেন।

"উষা, তোমার ক'বছর?" উষাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে কোন উত্তর দিলো না।

"বলো না মা, হুমম্! তুমি তো জান তোমার বয়স কতো—এক-দুই-তিন চার।"

গোনার সাথে সাথে তিনি তর্জনী দিয়ে মেয়ের নাক টিপে দিচ্ছিলেন। উষাও মনে হলো এমন আদরই চাইছিলো। বোঝা যাচ্ছিলো ও খুব মজা পাচ্ছে। সে তার বাবার কাধে মুখ গুঁজে দিয়ে আরাম খাচ্ছিলো।

এই গল্পের এক সুখী সমাপ্তি আছে।

দ্বিতীয় ভাগ
প্রশান্ত মহাসাগর

৩৭

জাহাজটা ডুবে গেলো। এর আওয়াজ এমন প্রচণ্ড ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো লোহা-লক্কড়ের বিশাল এক দৈত্য কোন বিস্ফোরণে ভেঙ্গে পড়েছে। সমস্ত কিছু নিমিষে বিশাল জলরাশিতে তলিয়ে গেলো। প্রচণ্ড গর্জনে ফুঁসছিলো সমুদ্র, বাতাস এবং আমার হৃদয়। জীবনতরী থেকে আমি কিছু একটা দেখতে পেলাম।

আমি চিৎকার করে উঠলাম," এই—তুমি কি রিচার্ড পার্কার? কিছুই তো ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। ওহ্, হারামির বৃষ্টি কি থামতে পারে না! রিচার্ড পার্কার? রিচার্ড পাকার? হ্যাঁ, এটা তুমি, নিশ্চয়ই তুমি।"

আমি তার মাথা দেখতে পাচ্ছি। সে প্রাণপনে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে।

"হে যিশু, মেরি, মোহাম্মদ (সাঃ) এবং বিষ্ণু! ওহ্ রিচার্ড পার্কার, তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে!' হাল ছেড়ে দিও না, প্লিজ! এই জীবনতরীর দিকে এসো। তুমি কি এই বাঁশি শুনতে পাচ্ছো? ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! তুমি ঠিক শুনতে পাচ্ছো। সাঁতরাও, সাঁতরাও! তুমি না খুব ভালো সাঁতারু! এ তো এক শ' ফুটও না।"

সে আমাকে দেখতে পেলো। তাকে খুবই আতঙ্কিত লাগছিলো। সে আমার দিকে সাঁতরাতে লাগলো। তার চারপাশের পানি ভীষণভাবে ফুঁসে ফুঁসে উঠছিলো। তাকে খুব ছোট এবং অসহায় লাগছিলো।

"রিচার্ড পার্কার, তুমি কি বুঝতে পারছো আমরা কী বিপদে পড়েছি! বলো এটা দুঃস্বপ্ন। বলো যা কিছু ঘটছে এগুলো সত্য নয়। বলো আমি এখনও জাহাজের বাঙ্কে শুয়ে আছি এবং বালিশে মাথা নাড়াচ্ছি আর গড়াগড়ি করছি—যেন এখনই দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যাবে! বলো আমি এখনও সুখে আছি। মা—আমার লক্ষ্মী মা, আমার জ্ঞানী পবিত্র মা, কোথায় তুমি? আর বাবা তুমি, আমার মহান পিতা? আর রবি, আমার শৈশবের মহা নায়ক—কোথায় তোমরা? বিষ্ণু রক্ষা করো, আল্লাহ্ রহম করো, যিশু বাঁচাও—আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই!

আমার শরীরের কোথাও জখম হয়নি। তা সত্ত্বেও এখন ব্যথা, এমন স্নায়বিক বৈকল্য, এমন হৃদয় খামচে ধরা যন্ত্রণা আমাকে এর আগে কখনও সইতে হয়নি।

সে বোধ হয় আর পারছে না। সে বোধ হয় ডুবে যাবে। সে খুব সামান্যই সামনে এগুতে পারছিলো, তার নড়াচড়া খুব দুর্বল। তার নাক মুখ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। শুধু তার চোখ দু'টি আমার ওপর স্থির হয়ে ছিলো।

"তুমি কী করছো, রিচার্ড পার্কার? তোমার কি জীবনের মায়া নেই? তাহলে সাঁতরাতে থাকো! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! পা দিয়ে আঘাত করো বেজন্মা বেহায়া পানিকে। লাথি মারো! লাথি মারো! লাথি মারো!"

সে পানিতে আবার নড়েচড়ে উঠলো এবং সাঁতরাতে লাগলো। কোথায় আমার বিস্তারিত পরিবার—পশু, পাখি, সরীসৃপ? তাদেরও সলিল সমাধি হয়েছে। আমার জীবনের সমস্ত অবলম্বন ধ্বংস হয়ে গেছে। কোনো অন্যায় না করেই আমাকে দোজখের যন্ত্রণা সইতে হবে। এটা কোন কার্যকারণের ফল, রিচার্ড পার্কার? বাস্তবতা—তথা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের জন্য এই যে পরিশ্রম, তার কী মূল্য আছে? কেন আমরা সেই সব প্রশ্ন ছুড়ে দিই যার কোন উত্তর নেই? এতো অল্প মাছ ধরার জন্য কেনো এতো বিশাল জাল ফেলা হয়েছে?"

তার মাথাটা শুধু পানির ওপরে। সে উপরের দিকে এমন করুণভাবে তাকাচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো এই শেষবারের মতো সে আকাশ দেখে নিচ্ছে। জীবন তরীতে দড়িবাঁধা একটি বয়া ছিলো। এটা তুলে আমি বাতাসে দোলাতে থাকলাম।

"তুমি কি এই বয়া দেখতে পাচ্ছো, রিচার্ড পার্কার? দেখতে পাচ্ছো? ধরো! এটা ধরো। হপ্‌প্‌! আমি আবার ছুঁড়ে দিচ্ছি ধরো, হপ্‌প্‌প্‌!"

সে বেশ দূরে ছিলো। কিন্তু আমার এভাবে বয়া ছোড়াছুড়ি তার ভেতর আশা জাগালো। সে তেজের সাথে এবার পানি ভাঙতে লাগলো।

"এই তো তুমি পারছো। আরও জোরে, এই তো, আর একটু পথ, এক-দুই, এক-দুই, এক-দুই। যখনই পারো দম নিয়ে নাও। ঢেউয়ের দিকে নজর রেখো! ট্রিইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইই! "

আমার হৃৎপিণ্ড মনে হয় শীতে জমে যাচ্ছে। দুঃখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিলো। কিন্তু এখন ভয় পাওয়ার সময় নেই। আমার ভেতরে কী একটা শক্তি যেনো কাজ করছিলো যে এতো সহজে জীবন ত্যাগে রাজি ছিলো না, যে অতো আগে হাল ছাড়তে চায় না, যে শেষপর্যন্ত লড়াই করে যেতে চায়।

"এটা কি নির্মম পরিহাস নয়, রিচার্ড পার্কার? এই নরকেও আমাদের অমরত্বের ভয়? দেখো, কতো কাছে এসে গেছো তুমি? ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! হুর্‌রা, হুর্‌রা! এই তো পেরেছো, ধরো! হাম্পপ্‌প্‌!"

এবার আমি সর্বশক্তি দিয়ে বয়াটা ছুড়ে দিলাম। এটা ঠিক তার সামনে পানিতে গিয়ে পড়লো। শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে এবার সামনে বেড়ে ধরে ফেললো সে বয়াটি।

"শক্ত করে ধরো, আমি তোমাকে টেনে তুলছি। ছেড়ে দিও না। তাকিয়ে থাকো। তুমি তোমার চোখ কাজে লাগাও আমিও আমার হাত কাজে লাগিয়ে তোমাকে টেনে তুলছি। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করো! একসাথে? আমরা একসাথে থাকবো? (আমার রবির সেই ভয় দেখানোর কথা মনে পড়ে গেলো)। আমার এবার ভয় ধরে গেলো। একসাথে থাকবো—পাগল!"

চমকে উঠলাম—এ আমি কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম। আমি দড়িতে একটা ঝটকা টান দিলাম।

"বয়াটা ছেড়ে দাও, রিচার্ড পার্কার। বয়াটা ছেড়ে দাও বলছি! আমি তোমাকে এখানে চাই না, বুঝতে পারছো? অন্য কোথাও যাও। আমাকে একা থাকতে দাও। দূর হয়ে যাও, ডুবে মরো, মরো!"

সে খুব তেজের সাথে পা চালাচ্ছিলো। আমি একটি বৈঠা নিলাম। বৈঠাটা দিয়ে তাকে ঠেলা দিলাম। বোঝালাম যে আমি ওকে ঠেলে সরাতে চাইছি। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম এবং বৈঠাটি আমার হাত থেকে ছুটে গেলো।

আমি আরেকটি বৈঠা নিলাম। নৌকার মাথাকাঠে বৈঠা রেখে দাঁড় টানার যে গর্ত থাকে সেইখানে বৈঠা রেখে চাড় দিয়ে আমি জীবন তরীকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। বরং জীবন তরীর এক মাথা তার দিকে এগিয়ে গেলো।

আমার তার মাথায় আঘাত করা দরকার। বইঠা তুললাম। কিন্তু সে এতো ক্ষিপ্র ছিলো যে আমি বৈঠা তুলতে তুলতেই উঠে পড়লো জীবন তরীতে।

"হায় ঈশ্বর!"

রবি ঠিকই বলেছিলো। সত্যি সত্যিই আমি সেদিনকার বাঘের খাঁচার পরবর্তী ছাগল হতে যাচ্ছি। একটি ভেজা, শীতে কাঁপা, অর্ধমৃত, তিন বছরের প্রাপ্ত বয়স্ক রয়াল বেঙ্গল টাইগার এখন আমার জীবন তরীর সহযাত্রী। রিচার্ড পার্কার টলতে টলতে তারপুলিনের ওপর উঠে দাঁড়ালো। আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো সে, কান দু'টি খাড়া হয়ে উঠলো। তার মাথাটা এখন বয়াটার মতো বড়ো হয়ে উঠলো—আর দাঁতগুলো আমার পিলে কাঁপিয়ে দিলো।

আমি চারদিকে তাকালাম। জেব্রাটাকে ডিঙিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিলাম।

৩৮

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না দিনের পর দিন একই রকম দেখতে, একটুও পরিবর্তন ছাড়া এই সমুদ্রতলে জাহাজটা বলদের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে কেনো! রোদ উঠছে, বৃষ্টি নামছে, বাতাস বইছে, স্রোত বয়ে যাচ্ছে, ঢেউয়ের পাহাড় হচ্ছে, দুই ঢেউয়ের মাঝখানে পানির বিশাল উপত্যকা হচ্ছে—কিন্তু এই গোঁয়ার সিমিটসুম জাহাজ কোন তোয়াক্কা করছে না। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

এই সমুদ্রযাত্রার জন্য আমি এক বিশ্ব মানচিত্র কিনেছিলাম। আমাদের কেবিনে সুবিধামতো জায়গায় এটি টাঙিয়ে নিয়েছিলাম। প্রতিদিন সকালে আমি ব্রিজের কন্ট্রোলরুম থেকে আমাদের অবস্থান জেনে এসে আমার ম্যাপে দাগ দিয়ে রাখতাম।

আমরা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে সিঙ্গাপুর ঘুরে ম্যানিলা পৌঁছলাম। এ সমুদ্র যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করছিলাম। বিশাল সমুদ্রে জাহাজে বাস করছি—এ যে আমার জন্য কী রোমাঞ্চের, কী উত্তেজনার! পশু-পাখির দেখ-ভাল করার জন্য প্রায় সারাদিনই আমাদের ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিলো। প্রতিরাতেই আমরা ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে বিছানায় যেতাম। ম্যানিলায় আমাদের দু'দিন যাত্রাবিরতি করতে হয়েছিলো। এখান থেকে জাহাজে টাটকা রসদ আর কিছু মালপত্র তোলা হয়। জাহাজের কোন এই ইঞ্জিন নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো—এই দু'দিনে তাও ঠিক করা হলো। টাটকা রসদের মধ্যে এক টন কলাও ছিলো। এখানে যেসব মালপত্র তোলা হলো তার মধ্যে একটি কঙ্গোর মাদী শিম্পাঞ্জিও ছিলো। আর ছিলো চার পাউন্ড বড়ো কালো মাকড়শা। শিম্পাঞ্জিরা কালো মাকড়শা দেখলে ভয়ে কাঁপতে থাকে আর ভেংচি কাটতে থাকে। রবির সারাদিন কাটতো লোকজনের এটা সেটা কাজকর্ম দেখে।

আমরা ম্যানিলা ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়লাম। যাত্রার চতুর্থদিন মাঝ দরিয়ায় আমাদের জাহাজ ডুবে গেলো। আমার চোখের সামনে এক বিশাল পর্বত ধসে পড়লো এবং আমার পায়ের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমার চারপাশে এক বদহজম হওয়া জাহাজের উগরানো বমি ছড়িয়ে

পড়ছিলো। আমার পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমার জন্য এ এক প্রচণ্ড আঘাত। এক বিশাল শূন্যতা আমার ভেতরটা কাঁপিয়ে দিলো। মৃত্যুপুরির নীরবতা আমার এই শূন্যতাকে গ্রাস করলো। আমার হৃৎপিণ্ডটা কে যেনো সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরলো। সামনের দিনগুলোর কথা মনে করে ভয় করে গেলো। চারদিক রাশি রাশি সর্ষেফুল দেখতে লাগলাম।

আমার মনে হয় এটা কোনো বিস্ফোরণ ছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। এটি যখন ঘটেছিলো তখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। এটি কোনো শৌখিন যাত্রীবাহী জাহাজ ছিলো না। তাই থাকার কেবিনগুলো তেমন আরামদায়ক ছিলো না—যেমনটি প্যাসেঞ্জার জাহাজে থাকে। সবসময়ই বাইরের সব শব্দ কেবিন থেকে শোনা যেতো। এতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে নানা ধরনের শব্দের মধ্যেও বাচ্চাদের মতো ঘুমাতাম। রবি যথারীতি নাক ডাকতো— আমিও ঘুমের মধ্যে কথা বলতাম। তাই এই বিস্ফোরণের (যদি হয়ে থাকে) শব্দ এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না যা আমাদের ঘুম ভাঙাতে পারে। তবে আমার ঘুম ভেঙেছিলো। কারণ আমি ভেবেছিলাম রবি আমার কানের কাছে বেলুন ফাটিয়েছে। আমি আমার ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন ভোর ঠিক সাড়ে চারটা। আমি তুলে ঘাড় বাড়িয়ে দেখলাম নিচের বাঙ্কে রবি তখনও ঘুমাচ্ছে।

আমি পোশাক পরে নিচে নেমে এলাম। এমনিতে আমি খুব ঘুম কাতুরে। স্বভাবতই তখনই আবার আমার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। আমি আজও জানি না সেই রাতে আমি উঠে পড়লাম এবং পোশাক পরে নিচে নেমে এলাম। এটা বরং রবি করলে মানাতো। 'ইশারা' শব্দটা ওর খুব পছন্দ। ও হয়তো বলতো 'অভিযানের ইশারা পাচ্ছি' এবং সারা জাহাজ চষে বেড়াতো। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই আবার সবকিছু স্বাভাবিক। শব্দটা মনে হয় চাপা পড়ে গিয়ে থাকবে।

আমি রবিকে ঝাঁকালাম, "এই রবি! ওঠ। কিসের যেন অদ্ভুদ আওয়াজ হলো। চল ঘুরে গিয়ে দেখি।"

রবি ঘুমচোখে আমার দিকে তাকালো এবং মাথা নেড়ে চাদর মুড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

আমি কেবিনের দরজা খুললাম।

আমি করিডোর ধরে এগুতে থাকলাম। দিনরাত এখানে একই রকম আলো থাকে। বাবা-মার কেবিনের সামনে একটু থামলাম। একবার ভাবলাম ডাকি। কিন্তু আমার ঘড়ির দিয়ে তাকিয়ে সাহস হলো না। বাবার বেলা করে ঘুমানোর অভ্যাস। আমি ঠিক করলাম খোলা ডেকে উঠে যাব। বলা যায় না ভোরের আকাশে হয়তো উল্কাপাতও দেখে ফেলতে পারি। রবিকে তাহলে এটা নিয়ে খোঁচানো যাবে। খোলা ডেকটা আমাদের ডেক থেকে আরও দুই ডেক ওপরে। এর মধ্যেই আমি সেই ভুতুড়ে আওয়াজটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

খোলা ডেকে যাওয়ার ভারি দরজাটা খুলতেই টের পেলাম বাইরের আবহাওয়া কেমন। এটাকে কি ঝড় বলা যায়? এটা ঠিক তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো, কিন্তু তা তেমন প্রবল নয়। আমাদের দেশে মৌসুমী ঋতুতে যেমনটি হয়ে থাকে। এবং এর সাথে ছিলো ঝড়ো বাতাস। তেমন কষ্ট না করেই আমি এর ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারলাম। সমুদ্র ছিলো উত্তাল। কিন্তু একজন ডাঙ্গায় কাটানো মানুষের কাছে সমুদ্র সব সময়ই আকর্ষণীয়, সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর। ঢেউগুলো

ফুঁসে উঠছিলো আর তাদের সফেন ছুড়া এসে জাহাজে আছড়ে পড়ছিলো। কিন্তু এ রকমটি আমি আগেও দেখেছি—তখন জাহাজ ভোবেনি। একটি কার্গো জাহাজ খুব মজবুত করে বানানো হয়ে থাকে। এটা এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে প্রচণ্ড ঝড়েও এটি ভেসে থাকতে পারে। আবহাওয়া এতো খারাপ নয় যে জাহাজটা ডুবে যাবে। আমাকে শুধু একটা দরজা বন্ধ করতে হলো— তাতেই ঝড় নেই! আমি ডেকের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি শক্ত করে রেলিং ধরে ধরে এগুতে থাকলাম এবং পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। এটা ছিলো এক দারুণ এ্যাডভেঞ্চার।

"কানাডা, এই আমি আসছি!" বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে চিল্লাতে থাকলাম আমি। আমি যেন হঠাৎ করেই খুব সাহসী হয়ে উঠলাম। অন্ধকার এখনও তেমন ফিকে হয়নি। তারপরও যেটুকু আলো ছিলো তা চারদিকে দেখার জন্য যথেষ্ট। লোকজনের জটলায় ছিলো আলো। প্রকৃতিও ভয়াল নাটক সৃষ্টি করতে পারে। এর মঞ্চটা হচ্ছে বিশাল, আলো প্রক্ষেপণ নাটকীয়, অসংখ্য সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রী, এই নাটকের বাজেট বিরাট অঙ্কের—শুনে শেষ করা যায় না। আমার সামনে দর্শক সারিতে ছিলো ঝড়, বৃষ্টি এবং ভূমিকম্প—হলিউডও যার অর্কেস্ট্রা বাজাতে অক্ষম। কিন্তু এই ভূমিকম্প ঠিক আমার পায়ের তলার মাটিতে এসে থেমে গেলো। আমার পায়ের তলার মাটি ছিলো মজবুত। আমি ছিলাম সিটে বসা নিরাপদ দর্শক।

এটা তখনকার কথা যখন আমি ব্রিজের পাশে রাখা একটা জীবনতরী ধরার জন্য পড়িমরি করে ছুটছি। জীবন তরীটি সোজা ছিলো না। এটা ছিলো একটা ডেভিটের সাথে হেলানো অবস্থায়। আমি সেদিকে ফিরলাম এবং আমার হাতের দিকে তাকালাম। আমার আঙুলের গিটগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিলো। আবহাওয়ার কারণে আমি খুব দৃঢ়ভাবে এটি ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু কেনো যেনো জাহাজের গায়ে পড়ে গেলাম। জাহাজটা বামদিকে কাত হচ্ছিলো— আমার উল্টোদিকে। এটা বেঁচে যাওয়ার লক্ষণ নয়, কিন্তু আমাকে চমকে দেবার মতো অনেক ঘটনা ঘটতে থাকলো। আমি যখন জাহাজের বাইরে তাকালাম তখন জাহাজের উল্টে যাওয়ার গতি কমে এসেছিলো। আমি জাহাজের বিশাল কালো অংশ দেখতে পেলাম।

শীতে কাঁপছিলাম। এতক্ষণে যেনো এক প্রচণ্ড ঝড়কে প্রত্যক্ষ করলাম। এখনই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। আমাকে বেরুতে হবে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললাম।

জাহাজের ভেতর ভীষণ হৈচৈ, আর্তনাদ, আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস কোথাও চোট লাগেনি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। রেলিং ধরে ধরে আমি একেক ধাপে চারধাপের সমান দূরত্ব পার হতে থাকলাম। আমি একতলা নামতেই পানি দেখলাম। অনেক পানি। এটা আমার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। নিচ থেকে প্রচণ্ড গতিতে পানি ঠেলে ঢুকছিলো। পানির তোড়ে সিঁড়ি দেখতে পারছিলাম না। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি ওখানেই ভয়ে আতঙ্কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এরপর কী করতে হবে বুঝতে পারছিলাম না। আমার পরিবারের অন্যরা ঠিক এখানেই—অনেক পানির নিচে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলাম। খোলা ডেকে উঠে এলাম। আবহাওয়া এখন আর উপভোগের বিষয় নেই। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চিত জাহাজটা বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা এখন আর উল্টোদিকে সমান হতে পারছে না। সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে এটা। আমি জাহাজের বাইরে তাকালাম। মন থেকে কিছুইতে মেনে নিতে পারছি না—জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে। চাঁদে আগুন লাগার মতোই এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

অফিসার এবং ক্রুরা কোথায়? তারা কী করছে? জাহাজের সামনের দিকে দেখলাম কয়েকজন লোক দৌড়াচ্ছে। মনে হলো কয়েকটা জিব-জন্তুও দেখলাম। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি আমাকে সেদিকে বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ দিলো না। আবহাওয়া যখন ভালো থাকে তখন হ্যাচ কভারগুলো আমাদের যাতায়াতের জন্য খোলাই থাকে। কিন্তু পশুদের খাঁচা থাকে সব সময় বন্ধ। কারণ এগুলো গবাদিপশু নয়— বিপজ্জনক বন্য জন্তু। আমার মাথার ওপর ব্রিজে মনে হলো কিছুলোক চিৎকার করছে।

জাহাজটা কেঁপে উঠলো এবং মনে হলো ধাতব দানব ভেঙে পড়ছে। এটা আসলে কী ছিলো? এটা কি মানুষ এবং পশুদের সাম্মিলিত মরণ চিৎকার? নাকি জাহাজটা ভূতগ্রস্ত হয়েছিলো? আমি ছিটকে পড়লাম। পরেই উঠে দাঁড়ালাম। আবার জাহাজের বাইরে তাকালাম। সমুদ্র ফুঁসছে। দানবের মতো এগিয়ে আসছে ঢেউ। আমরা ডুবে যাচ্ছি।

আমি স্পষ্ট বানরের চেঁচানি শুনলাম। কিসে যেন ডেকটা কাঁপাচ্ছে। একটি গণ্ডর—ভারতীয় বন্য ষাঁড় বৃষ্টির বাইরে এলে আমি এটিকে তাড়া করলাম। ভয়ে তাল হারিয়ে এটি পড়ে গেলো। আমি বিমূঢ় হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ঈশ্বরের নামে কে এটিকে ছাড়লো?

আমি ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। সেখানে থাকে অফিসাররা। যারা এই জাহাজের নিয়ন্ত্রক, আমাদের জানমালের হেফাজতকারী। আমি ব্রিজের মাঝখানে উঠে এলাম। জাহাজের ডানদিকে কেউ নেই। বামদিকে গেলাম। তিনজন লোককে দেখতে পেলাম, ওরা ক্রু। পড়ে গেলাম। আবার উঠে দাঁড়ালাম। তারা বাইরে তাকিয়ে আছে। আমি চিৎকার করলাম। তারা আমার দিকে ফিরলো। তারা আমার দিকে তাকালো, এরপর পরস্পর নিজেদের দিকে তাকালো। কি যেন বললো। তারা আমার দিকে ছুটে এলো। আমি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলাম। ধড়ে প্রাণ এলো যেন। আমি বললাম, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনাদের খুঁজে পেয়েছি। এর কী হচ্ছে। আমার খুব ভয় করছে। জাহাজের তলায় পানি। আমার বাবা-মা-ভাইয়ের জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পানির জন্য আমাদের কেবিনের দিকে যেতে পারিনি। এটা কি কোনো স্বাভাবিক ঘটনা? আপনারা কি মনে করেন....."

একজন আমার কথা শেষ না হতেই আমার গলায় একটি লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দিলো এবং চীনা ভাষায় চিৎকার করে কি যেন বললো। দেখলাম একটি কমলা রঙের বাঁশি লাইফ জ্যাকেটের সাথে ঝুলে আছে। তারা তেজের সাথে আমাকে ধরলো। তারা আমাকে ধরে তাদের বাহুর ওপর তুললেও আমি কিছু মনে করলাম না। আমি ভাবলাম ওরা আমাকে সাহায্য করছে। আমি তাদের ওপর পুরো বিশ্বাস রেখেছিলাম যে যখন তারা আমাকে শূন্যে তুললো আমি তাদের ওপর কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। যখন তারা আমাকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তখনই কেবল তাদের ওপর সন্দেহের অবকাশ পেলাম।

৩৯

কাপড়ের গাট্টির মতো পড়লাম চল্লিশ ফুট নিচে আধা গোটানো তারপুলিনের ওপর। একটা জীবন তরীকে ঢেকে রেখেছিলো এই তারপুলিন। অলৌকিক ব্যাপার হলো আমি কোন আঘাত পাইনি। তবে লাইফ জ্যাকেটটা হারালাম। শুধু তার বাঁশিটা আমার হাতে ধরা ছিলো বলে হাতেই রয়ে গেছে। জীবন তরীটিকে এর ডেভিট থেকে খুলিয়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার দোল খাচ্ছিলো এটি। ডেভিটের সাথে ঝোলানো দড়িতে বাঁধা ছিলো বলে পানির প্রায় বিশ ফুট ওপরে ছিলো এটি। আমি উপরে তাকালাম। লোকজনের দু'জন নিচে আমার দিকে তাকিয়ে জীবনতরীটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে বন্যের মতো চিৎকার করে কি যেন বললো। আমি বুঝতে পারছিলাম না ওরা আমাকে কি করতে বলছিলো। আমি ভাবছিলাম আমার পরপরই ওরা হয়তো এখানে লাফিয়ে পড়বে। তা না করে তারা তাদের মাথা ঘোরালো, ভয়ার্ত চোখে তাকালো এবং এই প্রাণীটিকে রেসের ঘোড়ার মতো লাফিয়ে পড়তে দেখা গেলো। এটা ছিলো একটি মর্দ গ্রান্ড জেব্রা। জেব্রাটা তারপুলিনের বাইরে পড়লো। ভীষণ শব্দ করে এটি শেষ বেঞ্চটাতে আছড়ে পড়লো। বেঞ্চটা ভেঙে গেলো এবং নৌকাটা কাঁপতে লাগলো। প্রাণীটি আর্তস্বরে ডাকতে শুরু করলো। তখনো আমি জানতাম না এটি একটি জেব্রা। লাফানোর ভঙ্গিতে মনে হয়েছিলো ঘোড়া বা গাধা হবে। কিন্তু এটি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে বুঝলাম এটি একটি জেব্রা। কাউয়া-হা-হা, কাউয়া-হা-হা, কাউয়া-হা-হা করে এটি চিচ্চিয়েই যাচ্ছিলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকা জেব্রাটির হলুদ দাঁত আর গোলাপী মাড়ি দেখা যাচ্ছিলো। জীবন তরীটি ফুঁসে ওঠা পানিতে আছড়ে পড়লো।

৪০

রিচার্ড পার্কার আমাকে ধরতে পানিতে লাফিয়ে পড়লো না। আমি বৈঠাটা নাগালে নিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করলাম। এটি ধরে আমি বয়াটার দিকে এগিয়ে গেলাম। বয়ার সাথে বাঁধা দড়িটা খুলে গিয়েছিলো। এভাবে পানিতে থাকাটা খুব বিপজ্জনক। কালো এবং ঠাণ্ডা পানি ভীষণভাবে ফুঁসে ফুঁসে উঠছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি কোনো কূপের তলায় পড়ে গেছি। আমার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। বয়াটা না থাকলে আমি মনে হয় এক মিনিটও টিকে থাকতে পারতাম না।

পনেরো ফুট দূরে পানিতে এক ফালি ত্রিভুজের মতো বস্তু দেখতে পেলাম। এটি ছিলো একটি হাঙরের পাখনা। আমার মেরুদণ্ডে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো। আমি প্রাণপনে সাঁতরাতে লাগলাম জীবনতরীর দিকে। নৌকার যে প্রান্তে আমি পৌঁছলাম সেটা তখনও তারপুলিনে মোড়ানো ছিলো। বয়ার সাথে পা জড়িয়ে আমি তারপুলিন ধরে ফেললাম। রিচার্ড পার্কারকে দেখতে পেলাম না। সে তারপুলিন বা বেঞ্চের ওপর ছিলো না। সে ছিলো নৌকার খোলে। আমি নিজেকে আরও একটু তুললাম। দেখলাম নৌকার অন্যদিকে জেব্রার মারমুখী মাথা। আবার পানিতে পড়ে গেলাম। আরেকটি হাঙরের পাখনা আমার সামনে চকচক করে উঠলো।

উজ্জ্বল কমলা রঙের তারপুলিন নাইলনের শক্ত দড়ি দিয়ে লেসের মতো নৌকার হুকের সাথে আটকানো ছিলো। আমি নৌকার সামনের দিকে পানির ভেতর তখনও পা চালাচ্ছিলাম। তারপুলিন পাছা নৌকা পর্যন্ত বাঁধা ছিলো না। সামনের কিছুটা অংশ জুড়ে অর্ধেক গোটানো তারপুলিনকে অনেকটা বোঁচা নাকের মতো লাগছিলো। তারপুলিনের যে দড়িটা পাছা-নৌকার

সাথে বাঁধা ছিলো তা ছিলো অনেক ঢিলা। আমি এই ঢিলা দড়িতে বৈঠা আটকে নিলাম। নৌকার সামনের অংশ এবার ঢেউয়ের ওপর উঠে গেলো, যেন পেছন থেকে লাঠি দিয়ে কেউ ধাক্কা দিয়েছে। বৈঠায় পা গোঁচিয়ে ধরে আমি মাথা জাগালাম। বৈঠার হাতল দিয়ে তারপুলিনকে ধাক্কাতে থাকলাম। কিন্তু তারপুলিন, বৈঠা এবং দড়ি আমার হাতে ধরা ছিলো। আমি পানি থেকে দুই-তিন ফুট উঁচুতে শূন্যে ঝুলতে থাকলাম। বড়ো বড়ো ঢেউ আমার ওপর আছড়ে পড়তে লাগলো।

উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগরে এখন আমি একা এবং এতিম। একটি বৈঠার ওপর ঝুলে আছি। আমার সামনে ভয়ঙ্কর বাঘ, নিচে বিপজ্জনক হাঙর এবং এক ভয়াল ঝড় আমার ওপর ঘুঁসে ফুঁসে আঘাত করছে। কার্যকারণের আলোয় যদি সিদ্ধান্ত টানতে হয় তবে কি আমার জীবনের কোন আশা থাকে? কিন্তু এ সময়ে আমি এসব ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম নিরাপত্তার কথা। এখনও দিনের আলো ফুটেনি। বৈঠা ধরে ঝুলে আছি—কেন তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।

একটু পরে আমি বয়াটাকে ভালোমতো কাজে লাগাতে পারলাম। আমি এটাকে পানি থেকে তুলে এর গর্ত ভেতরে দিয়ে বৈঠাটা ঢুকিয়ে দিলাম। এরপর আমি এর ভেতর শরীর গলিয়ে বুকের সাথে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলাম। এখন শুধু আমার পাটা দিয়ে তারপুলিন, দড়ি এবং বৈঠার ফাঁস ধরে রাখলেই চলবে। এখন যদি রিচার্ড পার্কার মুখ বাড়ায় তবে হয়তো আমাকে বৈঠা থেকে পড়ে যেতে হবে। কিন্তু একই সময়ে বাঘটার প্রশান্ত মহাসাগরকে ভয় ছিলো।

৪১

এখনও বেঁচে আছি। জীবনতরীটি ডোবেনি। রিচার্ড পার্কার দৃষ্টির আড়ালে থেকেও হাঙরগুলো শিকার ধরার জন্য ঘুরে বেড়ালো কিন্তু আমাকে ধরতে পারলো না। ঢেউগুলো আমাকে আঘাত করলো, কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে গেলো না।

আমি জাহাজটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম। চারদিক তাকিয়ে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের খুঁজলাম, আর কোনো জীবনতরী দেখা যায় কিনা দেখলাম—কিন্তু আশা জাগানিয়া কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমার হতাশ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলো শুধু বৃষ্টি, বিশাল বিশাল ঢেউ আর কালো সমুদ্র।

অন্ধকার কেটে গেলো। বৃষ্টি থেমে গেলো।

যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায় আর টেকা যাচ্ছিলো না। আমার খুব শীত করছিলো। ফুলে থাকতে থাকতে নৌকার সাথে ঘষায় আমার গলা ছিলে গিয়েছিলো। বয়ার সাথে চেপে থাকায় থাকতে আমার পিঠ ব্যথা করছিলো। যদি আর একটু উঁচুতে উঠতে পারতাম! কিন্তু আমার চারপাশে আর কোন জীবনতরীর সন্ধান পেলাম না।

গলুইতে পা রেখে বৈঠা ধরে আস্তে আস্তে সাবধানে এগুতে থাকলাম। আমার ধারণা ছিলো রিচার্ড পার্কার এখনও জীবনতরীর খোলে আমার দিকে পিছন ফিরে জেব্রাটার দিকে মুখ করে আছে, যেটিকে এতোক্ষণ নিশ্চয়ই এটি মেরে ফেলেছে। দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, বলতে গেলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সবদিকেই বাঘটি আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তারপর এটি যেহেতু আমাকে

দেখতে পাচ্ছে না, ভিজা থাকার কারণে আমার ঘ্রাণ পাচ্ছে না এবং সাবধান থাকার কারণে যেহেতু আমার কোন শব্দ পাচ্ছে না—সেহেতু হয়তো বিপদ নাও ঘটতে পারে। টের পেলে নিশ্চয়ই এতোক্ষণ সে আমাকে মেরে ফেলতো। টের পেলেও পায়ের তলায় তারপুলিন থাকায় সে কি লাফিয়ে এসে আমাকে ধরতে পারবে। এক ঝলক আলো দেখতে পেলাম যেনো।

ভয় এবং কার্যকারণের দ্বন্দ্ব চলতে থাকলো। ভয় বললো, হ্যাঁ, সে তোমাকে খাবে। কারণ ৪৫০ পাউন্ড ওজনের সে এক হিংস্র মাংসাশী প্রাণী। তার প্রতিটি নখ চাকুর মতো ধারালো। কার্যকারণ বললো, না, সে তোমাকে খেতে পারবে না। তারপুলিন হচ্ছে পিচ্ছিল, শক্ত ক্যানভাস—জাপানী কাগজের দেয়াল নয়। অনেক ওপর থেকে আমি এটির ওপর পড়েছিলাম। রিচার্ড পার্কার নিশ্চয়ই এই শক্ত আচ্ছাদনে থাবা বিস্তার করতে পারবে না! আর যেহেতু এটি আমাকে দেখতে পায়নি তাই এর থাবা বিস্তারের কোন কারণও নেই।

আমি নিঃশব্দে বৈঠার ওপর হেলান দিয়ে সাবধানে আমার পা জীবনতরীর কিনারাকাঠে রাখলাম। আমার চোখ তারপুলিনের ওপর থাকলো স্থির, সতর্ক। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেশ ক'বার মূর্ছা গেলাম। আমি যতোই নিশ্চল থাকতে চাই ততোই আমার পা দুটি কাঁপতে থাকে। এক সময় আমার হাতও কাঁপতে লাগলো। খুব কষ্টে নিজেকে ধরে রাখলাম। শরীরের বেশিরভাগ অংশ নৌকায় টেনে তোলার পর খুব সাবধানে মাথা তুললাম। তারপুলিনের দিকে উঁকি দিলাম। হা ঈশ্বর! জেব্রাটা এখনও বেঁচে আছে! নৌকার যেখানে এটি পড়েছিলো সেখানেই এটি নিশ্চল পড়ে আছে। এর পেট এখনও ওঠা-নামা করছে আর ভয়ার্ত চোখে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। এর ঘাড় এবং মাথা ভাঙা বেঞ্চের ওপর নুয়ে আছে। এর পেছনের পা ভেঙে গেছে। পায়ের হাড় ভেঙে মাংসা ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে আর রক্ত ঝরছে। শুধু এর সামনের পা দুটি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। থেকে থেকে জেব্রাটি মাথা নাড়ছে, তার স্বরে ডাকছে আর নাক দিয়ে ঘোঁস ঘোঁস আওয়াজ করছে। এসব জখমি যন্ত্রণা বাদ দিলে সে ভালোই আছে।

এটা এক চমৎকার জীব। সাদা-কালো ডোরাগুলো একে জীবজগতের অন্যতম সুন্দর প্রাণীতে পরিণত করেছে। আর আমি কিনা তখন বোকার মতো ভেবেছিলাম এটি আমাকে আঘাত করতে আসছে! রিচার্ড পার্কার একে মারেনি। স্বাভাবিক সময়ে হলে অবশ্যই করতো। ভয়ে-দুশ্চিন্তায় রিচার্ড পার্কার অক্রমণের উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে হয়তো বা।

তার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানা গেলো একটু পরেই। একটি মাথা উদয় হলো তারপুলিনের দঙ্গল থেকে। আমার রক্ত জমে গেলো যেনো। এটি আমার দিকে সরাসরি কিন্তু ভয়ে ভয়ে তাকালো। এরপর মাথা লুকালো। আবার মাথা তুললো, আবার লুকালো। আরে এ যে গায়ে বুটিদার এক হায়েনা! আমাদের চিড়িয়াখানায় যে ছ'টি হায়েনা ছিলো এটি তাদেরই একজন। এর যাওয়ার কথা ছিলো মিনেসোটায়। এটা একটা মর্দা হায়েনা। আমি এর ডান কান দেখে চিনলাম—এটি খুব খারাপভাবে ছড়ে গিয়েছিলো। জঙ্গলে এটি খুব হিংস্র প্রাণী। এখন আমি বুঝতে পারলাম রিচার্ড পার্কার কেনো জেব্রাটিকে মারেনি। সে জীবনতরীতেই নেই! এমন ছোট্ট জায়গায় বাঘ এবং হায়েনা একসাথে থাকতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই তারপুলিন থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে মরেছে!

এবার হায়েনাটা কী করে এখানে এলো মেলাতে থাকলাম। এটি সাঁতার জানে না—তাই সাঁতরে এসে এটির নৌকায় ওঠার সম্ভাবনার কথা বাতিল করে দিলাম। আমার ধারণা আগে থেকেই এটি নৌকায় চড়ে তারপুলিনের ভেতরে লুকিয়ে ছিলো। ওরা হয়তো ভেবেছে লুকিয়ে

থাকা হায়েনাকে দেখে আমি পালিয়েছি এবং এই জীবনতরীর এখন ওরাই মালিক। জেব্রাটা লাফিয়ে পড়ার আগে জাহাজের লোক দুটো তাহলে এই হায়েনাকেই দেখছিলো!

এতোটুকু নৌকায় এক হায়েনার সাথে থাকা আমার জন্য কোনো ভালো খবর হতে পারে না। কিন্তু একসময় তাই হয়েছিলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে ভয়ে গুটিসুটি ছিলাম। একসময় ভাবলাম—বোধ! এর চেয়ে নৌকার পাশে দড়িতে ঝুলে ছিলাম তাই ভালো ছিলো।

আমি তাকালাম। সমুদ্র এবং আকাশ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। চারদিকে শুধু পানি পানি আর পানি। কিন্তু কোথাও বাবা-মা-রবির টিকিটিরও সন্ধান নেই। অনেক খুঁজেও আর কোনো জীবনতরী দেখতে পেলাম না।

আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। ঝড়ের গতি কমে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগলো। উঁচু উঁচু ঢেউ অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকলো। আকাশে সাদা মেঘ। এক শান্ত প্রশান্ত মহাসাগরে এক সুন্দর দিনের সূচনা হলো। আমার জামা এর মধ্যেই শুকাতে শুরু করেছিলো। জাহাজটির মতোই রাতটি দ্রুত অদৃশ্য হলো।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবনার কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। আমি হা এই দুর্বিপাক থেকে বেঁচে ওঠার জন্য আনন্দিত ছিলাম অথবা স্বজন হারানো বেদনায় মনে ভেতর গুমরে মরছিলাম। ভাবনার কোন থেই পাচ্ছিলাম না। আমার মুখ হা হয়ে গেলো আর দু'হাতে চেপে ধরলাম মাথা।

৪২

বর্ণালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সে এলো। কলার দ্বীপে ভাসতে ভাসতে মা মেরির মতো সে এলো। তার পিছন দিয়ে সূর্য উঠছিলো আর তার লোমগুলো থেকে আলোর বর্ণা বয়ে যাচ্ছিলো।

আনন্দে আমি চিৎকার করে উঠলাম, "হে দয়াময়ী মহান মাতা, পণ্ডিচেরির দেবী মহামায়া তোমরা কি দেখতে পারছো কি ঘটছে? তুমি এখনও বেঁচে আছো? তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে! আবার দুঃখও লাগছে, আনন্দ লাগছে কারণ তুমি আমার সাথে আছো, আর দুঃখ লাগছে কারণ এ একসাথে থাকা বোধ হয় বেশি স্থায়ী হবে না। সমুদ্র সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে? নেই। সমুদ্র সম্বন্ধে আমার কি কোনো ধারণা আছে? না নেই। তাহলে? চালকবিহীন এ বাস তো হারিয়েই যাবে। আমরা একসাথে বসতে পারি। তুমি হয়তো জানালার ধারে বসবে। কিন্তু বাইরে তাকিয়ে তোমাকে দেখতে হবে এক করুণ দৃশ্য। ওহ্! অনেক দুঃখের গাঁথা বললাম। আসল কথা হচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ব্যস।"

এটা সেই বর্নিওর ওরাং-ওটাং। আমরা এটিকে 'ওরেঞ্জ জুস' বলে ডাকতাম। কারণ সব সময় এটির মুখ থেকে লালা ঝরতো। ম্যানিলাতে জাহাজে যে কলা তোলা হয়েছিলো, নাইলনের দড়ির জালে ভরা সেই কলার দ্বীপে ভাসতে ভাসতে সে এলো। তার চারপাশে কিলবিল করছিলো সেই কালো মাকড়শাগুলো। যখন সে এই কলার দ্বীপ থেকে নৌকায় লাফিয়ে উঠলো, কলাগুলো পানিতে এক চুবানি খেয়েই গড়াতে শুরু করলো। কলাগুলো নৌকার কাছাকাছি হলো

এক সময়ে। কারো মাকড়শার অবস্থা ছিলো শোচনীয়। কলার দ্বীপটা গড়াচ্ছিলো আর ওরা পানিতে চুবানি খাচ্ছিলো। আমি কলার বোঝার নাইলনের দড়িটা ধরতে পেরে যেন আকাশের চাঁদ ছুঁয়ে ফেললাম। কিন্তু আমার সেই হাসি স্থায়ী হলো না। যেই আমি নাইলনের দড়িটা ধরে জোরে টান দিলাম, অমনি এটার বাঁধন খুলে গেলো। সাথে সাথে কলাগুলো বেরিয়ে গেলো। আমার হাতে উঠে এলো শুধু নাইলনের জাল। কলাগুলো চারদিক ভাসতে ভাসতে ডুবে যেতে লাগলো। চোখের সামনে এই সর্বনাশ দেখে আমার চেয়ে বেশি হতাশ হলো ওরা-ওটাংটা। সে তারপুলিনের ভিতর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। আমি এ সময় হায়েনার ডাক শুনতে পেলাম।

৪৩

আমি জাহাজের শেষ চিহ্ন হিসাবে দেখলাম এক দঙ্গল তেলের বুদ্বুদ।

আমি নিশ্চিত ছিলাম আমি একা নই। নিশ্চয়ই জাহাজটা ডুবে যাবার আগে বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে। হয়তো এই মুহূর্তে টোকিওতে, পানামা সিটিতে, হনলুলুতে, এমনকি উইনিপেগে লালবাতি জ্বলে উঠেছে, সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠেছে, উদ্বিগ্ন মুখগুলো বলে উঠছে, "হা ঈশ্বর! সিমিটসুম ডুবে গেলো!" আর তাদের হাতগুলো দ্রুত সচল হচ্ছে টেলিফোনের ওপর। এরপর আরও লালবাতি জ্বলে উঠছে, আরও সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠছে। পাইলটরা ছুটে যাচ্ছে তাদের বিমানের দিকে, তাড়াহুড়ার কারণে হয়তো তারা তাদের জুতার ফিতাও বাঁধার সময় পাচ্ছে না। উদ্ধার জাহাজের অফিসাররা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত হুইল ঘোরাচ্ছে। এমনকি সাবমেরিনও হয়তো পাঠানো হয়েছে এই উদ্ধার অভিযানে। খুব শিগ্‌গিরই আমরা উদ্ধার পেতে যাচ্ছি। ঐ বুঝি দিগন্তে একটি জাহাজ দেখা যায়! কেউ হয়তো বন্দুক তাক করে হায়েনাটাকে মেরে ফেলবে এবং জেব্রাটাকে শুশ্রূষা করার জন্য নিয়ে যাবে। হয়তো 'ওরেঞ্জ জুসও' বেঁচে যাবে। আমি উদ্ধারকারী জাহাজে উঠে যাবো এবং আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে স্বাগত জানাবে। তাঁদের হয়তো অন্য কোনো জীবনতরী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখন শুধু আমাকে আর কয়েকঘণ্টা টিকে থাকতে হবে—যতক্ষণ না উদ্ধারকারী জাহাজ আসছে।

আমি দাঁড় টানার উঁচু জায়গা থেকে নেমে গেলাম নাইলনের জালটা আনতে। আমি এটিকে পেঁচিয়ে তারপুলিনের মাঝামাঝি ছুড়ে দিলাম। যদিও ছোট তবু হয়তো এটা প্রতিরোধকের কাজ করতে পারবে। 'ওরেঞ্জ জুস'কে সত্যি সত্যি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। আমার মনে হলো কলার শোকেই হয়তো সে মারা যাবে। শুধু হায়েনাটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। আমি এর 'কুঁই কুঁই' শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম যে আহত জেব্রা এবং ওরাং-ওটাং আছে বলে আমার দিকে মনোযোগ নাও দিতে পারে হায়েনাটা।

আমি দিগন্তরেখায় একটি চোখ রাখছিলাম, অন্য চোখ রাখছিলাম জীবনতরীর অন্য প্রান্তে। জন্তুদের তেমন কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। শুধু থেকে থেকে তারপুলিনে নখের আঁচড়ের ঘস-ঘস আওয়াজ হচ্ছিলো।

বেলা আর একটু গড়াতেই হায়েনাটাকে আবার দেখা গেলো। এর মধ্যে তার গলার স্বর 'কুঁই কুঁই' থেকে 'ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌'-এ উন্নীত হয়েছে। এক লাফে এটি জেব্রাকে পেরিয়ে সামনে গলুইয়ের কাছে গেলো, যেখানে নৌকার দু'দিকের বেঞ্চ দিয়ে মিশে একটি কোণের সৃষ্টি

করেছে। জন্তুটি ভয়ে ভয়ে নৌকার বাইরে উঁকি দিলো। খোলা সমুদ্র, অথৈ পাথার দেখে ভয় এটি সাথে সাথে মাথা নিচু করলো এবং এক লাফে জেব্রাটিকে পেরিয়ে এসে নৌকার কোলে আশ্রয় নিলো। দশ সেকেন্ড পরেই এটি আবার আমার থেকে পনেরো ফুট দূরে আবির্ভূত হলো। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। জেব্রাটি মাথাটি আরও পিছনে সরিয়ে ভয়ে ডেকে উঠলো।

আমার আশা ছিলো হায়েনাটা তারপুলিনের নিচেই থাকবে। এটি খুব আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। আবার এক লাফে এটি জেব্রাটিকে ডিঙিয়ে গলুইয়ের কাছে গেলো। কয়েক সেকেন্ড সেখানেই সে চারদিক এক পাক ঘুরলো। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না এটি। অগত্যা আবার এটি জেব্রাকে ডিঙিয়ে সামনের দিককার বেঞ্চের কাছে এলো। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এটি কী করতে চাচ্ছে! উত্তরটা দ্রুতই পেয়ে গেলাম। এটি মাথা নিচের দিকে রেখে জেব্রাটার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো। একবার সামনের বেঞ্চে যায়, একবার পাশের বেঞ্চের দিকে যায়, নখ দিয়ে বেঞ্চে আঁচড় কাটে। আবার জেব্রাটাকে ডিঙিয়ে সামনে আসে। অস্থিরভাবে হায়েনাটা এমন করতে লাগলো আর বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগলো। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেলো।

যখন কোন জন্তু কিছু করতে যায় তার আগে অনেকক্ষণ এটি এমন করে থাকে। আমাকে ভয়ের অতল জলে ফেলে এটি এমন করতেই থাকলো। প্রথম প্রথম জেব্রার মাথার ওপর দিয়ে লাফানোর সময় জেব্রাটি ভয়ে আর্তচিৎকার করছিলো। এখন এটির গলা থেমে গেছে। হায়েনাটি তাহলে আমাকেই লক্ষ্যবস্তু করেছে!

আমি কোনো পশুর প্রতি বিরাগভাজন নই। কিন্তু এটা নির্জলা সত্য যে হায়েনা কোনো সুদৃশ্য প্রাণী নয়। এটি এক কল্পনাতীত কুৎসিত প্রাণী। এটির মোটা গর্দান আর উঁচু কাঁধ জিরাফের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর অমসৃণ কর্কশ চামড়া একে এক বিশ্রী প্রাণীতে পরিণত করেছে। এর গায়ের বুটিগুলো কিছুতেই চিতার মতো দৃষ্টিনন্দন নয়।

কিন্তু আমি বাবার কথা ভুলে যাইনি। এরা কাপুরুষ মরা-পচা জীবজন্তুখোর প্রাণী নয়। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে* যদি এ রকম দেখিয়ে থাকে তা হলে তার কারণ হচ্ছে তারা হয়তো দিনের বেলা ঐ চিত্র ধারণ করেছে। হায়েনাদের দিন শুরু হয় চাঁদ ওঠার পর। তখন এরা হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর শিকারি। এরা দল বেঁধে আক্রমণ করে। তারা জেব্রা, নু (গরুর মতো দেখতে হরিণ), মহিষের পিছু ধায়। এবং শুধু বাচ্চা আর বুড়োদেরই নয় জোয়ানদেরও এটি আক্রমণ করে। তবে বাচ্চাদের প্রতি এদের নজর বেশি। সদ্যপ্রসূত নু-এর শাবক হচ্ছে এর সবচেয়ে প্রিয় খাবার। এরা এমনকি সিংহ শাবক এবং গন্ডারের বাচ্চাও খায়। শিকার ধরে এর হাড়-মাংস সাবাড় করে ঘাসে যে রক্ত লেগে থাকে তাও খায়। 'এরা কি না খায়?'—এই হচ্ছে এদের সম্বন্ধে ধারণা।

পানিয়ের ক্ষেত্রে এরা পানি থেকে শুরু করে নিজের পেশাব পর্যন্ত খায়। এমনকি গরমের দিনে মাটিতে পেশাব করে কাদা বানিয়ে সেখানে কাদাস্নানও করে। হায়েনাটা গলুইয়ের কাছে থামলো। এটি আরও জোরে গলা দিয়ে 'ঘর্‌র্ ঘর্‌র্' শব্দ করতে লাগলো। আমি বৈঠার পিছনে নিজেকে আড়াল করলাম। জন্তুটি গলা খাকারি দিলো এবং বমি করলো। ঠিক জেব্রার পিছনে পড়লো বমির দঙ্গল। এটি যা খেয়েছিলো সবই উগরে দিলো। এটি এখানে দাঁড়িয়ে করুণভাবে চারদিক দেখতে লাগলো। দিনের বাকি সময় এটি আর এর এলাকার বাইরে এলো না। মাঝে মাঝে জেব্রাটি চেঁচিয়ে উঠলেও বাকি সবাই চুপ-চাপই থাকলো।

৪৪

সূর্য মাথার ওপর উঠে আস্তে আস্তে পশ্চিমে হেলে পড়তে লাগলো। আমি সারাটি দিন গলুইতে বৈঠা নিয়ে বসে থাকলাম। শুধু নৌকার ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেটুকু দরকার ততোটুকুই বৈঠা নাড়াচ্ছিলাম। আমার সমস্ত মনোযোগ দিগন্তের দিকে—ঐ বুঝি কালো বস্তু দেখা যায়! ঐ বুঝি ওরা আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। এ এক শ্বাসরুদ্ধকর অসহ্য প্রতীক্ষা। প্রথম প্রথম একটা শব্দ পেতাম। না—হায়েনা, জেব্রা বা ওরাং-ওটাংয়ের নয়। এ ছিলো মাছির ভন ভন শব্দ। এরা সারাদিন বন বন করে উড়ে ভন ভন করতো। নৌকায় কিভাবে এলো ধারণা করতে গিয়ে আমার মনে হলো হয় এরা আগে থেকেই নৌকায় ছিলো, নতুবা জেব্রা, ওরাং-ওটাং বা হায়েনার সাথে এসেছে। হায়েনার সাথে আসার সম্ভাবনাই বেশি। সারাদিন এরা ভন ভন করতো। হায়েনাকে দেখেছি মাঝে মাঝে ধরে খেতে। দু'দিন পরে এদের আর পাত্তা নেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমার উদ্বেগ বাড়তে থাকলো। দিনের শেষে কি কি ঘটতে পারে ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। রাতেরবেলা কোনো জাহাজ গেলেও হয়তো আমি দেখতে পাবো না। হায়েনাটা রাতে হয়তো আবার অস্থির হয়ে উঠবে। বলা যায় না ওরাং-ওটাংটাও খেপে যেতে পারে।

আঁধার ঘনিয়ে এলো। চাঁদের কোন চিহ্ন ছিলো না। তারাগুলো মেঘে ঢাকা। চোখের সামনে নেমে এলো কালো অন্ধকার পর্দা। সমুদ্র, জীবনতরী এমনকি আমার নিজের শরীরও আমি এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। বাতাস নেই বললেই চলে। স্থির নিশ্চল সমুদ্র। তাই কোন শব্দও ছিলো না—যথাযর্থই অরব অন্ধকার। এক গাঢ় কালোর ওপর ভাসছি। দিগন্ত যেদিকে আছে বলে মনে হলো সেদিকে স্থির তাকিয়ে থাকলাম। অন্যদিকে আমার কান সজাগ থাকলো প্রাণীদের প্রতি।

রাতে কখনও কখনও হায়েনার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম, জেব্রার ডাক আর ঘষটানির আওয়াজ পেলাম। গুঁতাগুঁতির শব্দও পেলাম। আমি ভয়ে কাঁপছিলাম এবং এখানে লুকানোর কিছু নেই প্যান্টে পেশাবও করে দিয়েছিলাম। আমি নৌকার পাটাতনে এমন কোনো কম্পন অনুভব করলাম না যা থেকে ধারণা করতে পারি কোনো জন্তু সরানড়া করছে। নচ্ছার হায়েনাটা দূরেই আছে। অন্ধকার থেকে শুধু নাক ডাকার ঘরঘর শব্দ কানে আসছে। নৌকার তলা থেকেও কিছু কিছু শব্দ পাচ্ছিলাম। হাঙরগুলো মনে হয় এখনও পিছু ছাড়েনি। আমার জীবনযুদ্ধের ক্ষেত্র এখন নৌকার তলার পানি পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

পাথরের মতো ভারি ভারি মিনিট পার হতে লাগলো। আর প্রচণ্ড উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় এভাবেই রাতটা পার হলো।

৪৫

আমার শীত করছিলো। চারদিকের পরিস্থিতি ছিলো খুবই হতাশাজনক। কিন্তু এ নিয়ে আমি আর এখন কোন দুশ্চিন্তা করছিলাম না। দিন হতে শুরু করলো। খুব দ্রুত চারদিক দিনের আলো ফুটতে শুরু করলো। ব্যাপারটা ঘটলো অনেকটা ঘড়ির মিনিটের কাঁটার মতো। চারদিকের সবকিছু বদলে যেতে দেখলাম। কিন্তু কিভাবে বদলালো টের পেলাম না। আকাশের

একটি কোনার রঙ বদলে গেলো। আকাশে আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। শান্ত সমুদ্র আমার চারপাশে এক বিশাল বই খুলে মেলে ধরলো। এখনও চারপাশের রাতের মতোই ছিলো। হঠাৎ দিন হলো।

সূর্যটাকে এখন মনে হচ্ছে একটা কমলার ভেতর কেউ ইলেক্ট্রিক বাল্ব ঢুকিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে। দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো হলুদ রোদ। সারা শরীর শীতে কাঁপছে—আমার চাই রোদ, উত্তাপ। আমার ওপর রোদের আলো এসে পড়তেই আমার ভেতর জেগে উঠলো আশা—বেঁচে আছি! এক ভয়ঙ্কর রাত পেরিয়ে তা হলে বেঁচে আছি!" রোদে যেমন শরীর উত্তপ্ত হচ্ছিলো—মনও তেমনি আশায় উদ্দীপ্ত হচ্ছিলো। এখন চারদিকের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি দিগন্তের চারদিক চোখ দিয়ে চোষে বেড়াচ্ছিলাম। ঐ বুঝি কোন জাহাজ! কল্পনা করলাম রবি আমাকে কিভাবে খোঁচাবে, "এটা কি, এ্যা! এতো বড়ো একটা জীবনতরী পেলি আর তুই কিনা তাকে সব জন্তু-জানোয়ার ভরতে শুরু করলি? তুই কি নিজেকে নুহ নবীর মতো মনে করিস?" বাবার মুখে হয়তো দেখবো কয়েকদিন শেভ না করা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মা প্রথমে আকাশের দিকে তাকাবেন, তারপর দু'বাহু বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নেবেন। উদ্ধারকারী জাহাজকে ঘিরে আমার কতো সুখ কল্পনা যে মনের ভেতর নতাতে থাকলো তার ইয়ত্তা নেই। ওদিক সকালের দিগন্তরেখা যেমন খানিকটা দেখায় তেমনি সুখের আবেশে আমার ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসির বাঁকা রেখা।

এতোক্ষণ যেন এক ঘোরের মধ্যে.কাটলো। ঘোর কাটতেই আমার সমস্ত মনোযোগ ছুটে ফিরে এলো নৌকার ভেতর। হায়েনাটা জেব্রাকে আক্রমণ করেছিলো। হায়েনাটির মুখ রক্তে লাল। এটি তখনও এক টুকরো চামড়া চিবাচ্ছিলো। দ্রুত আমার চোখ গেলো জেব্রার আহত পায়ের দিকে। এই আহত পাটাকেই আক্রমণ করেছিলো হায়েনাটি। আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

জেব্রাটির আহত পাটি নেই। হায়েনাটি এটি কামড়ে কেটে নিয়ে নৌকার সামনের গলুইয়ের কাছে নিয়ে এটি চিবিয়ে খাচ্ছিলো। ঠিব জেব্রাটির পিছনে বসে জেব্রাটির পা চিবাচ্ছিলো। জেব্রার পায়ের ঐ জায়গায় এখন শুধু চামড়া ঝুলছে আর তা থেকে টপ টপ করে পড়ছে তাজা রক্ত। আমার ভেতর ভয় এবং ক্রোধ একইসাথে জেগে উঠলো। আমি এটিকে মেরে ফেলার ফন্দি করতে লাগলাম। কিন্তু আমার এ চিন্তা স্থায়ী হলো না। সত্যি কথা বলতে কি জেব্রার জন্যে অতোটা দরদ আর আমার ভেতর এখন কাজ করছিলো না। যেখানে আপনার নিজের জীবনই বিপন্ন, সেখানে অন্যের জন্য আপনার দরদ ম্লান হতে বাধ্য। যদিও জেব্রাটি খুব কষ্ট পাচ্ছিলো—কিন্তু আমার করারও তো কিছু ছিলো না। তবু জেব্রাটির এ পরিণতি আমাকে কষ্ট দিতে থাকলো। কিন্তু এর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলাম।

এখনও 'অরেঞ্জ জুসে'র কোন দেখা নেই। আমি আবার দিগন্তে চোখ রাখলাম।

দুপুরে একটু বাতাস উঠলো। আমাদের জীবনতরীটির যা ধারণক্ষমতা তার তুলনায় এটি অনেক কম ওজন বহন করছে। ফলে এটি খুব হাল্কাভাবে ভেসে আছে। আমাদের থেকে পানির দূরত্ব বেশ খানিকটা। ফলে বাতাস অনেকটা পালের মতো এটিকে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচাচ্ছিলো। প্রথমে ছোট ছোট ঢেউ এটির তলায় খলবলিয়ে আঘাত করতে লাগলো। কিন্তু বড়ো ঢেউ শুরু হতেই এটি সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে দুলতে থাকলো। নৌকার এই দুলুনি আর ঝাঁকুনিতে আমার বমি বমি লাগছিলো।

হয়তো নড়াচড়া করলে কিছুটা ভালো লাগবে। আমি পানিতে বৈঠা ফেলে আর একটু এগিয়ে বসলাম। আমি ঢেউয়ের মুখোমুখি বসলাম। পুরো নৌকাটা থাকলো আমার বাঁয়ে। আমি হায়েনাটার কাছাকাছিই ছিলাম কিন্তু এটির ভিতর কোন প্রতিক্রিয়া ছিলো না।

গভীর শ্বাস নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করছি ঠিক তখনই অরেঞ্জ জুসকে দেখে আমার বমি ভাব দূর হয়ে গেলো। ভেবেছিলাম এটি তারপুলিনে আশ্রয় নিয়ে হায়েনাটির কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু না। এটি হায়েনার কাছাকাছি পাশের বেঞ্চে বসে আছে আমার উল্টোদিকে, আধ-গোটানো তারপুলিনের আড়ালে। সে এক-দেড় ইঞ্চির মতো মাথা জাগালে আমি তাকে দেখতে পেলাম।

আমার খুব কৌতূহল হলো। নৌকার দুলুনির কারণে আমি হাঁটু মুড়ে বসলাম। হায়েনাটি আমাকে দেখলো, কিন্তু নড়লো না। অরেঞ্জ জুসকে দেখা গেলো। আগের চেয়ে আমার অনেকটা ভালো লাগছিলো। আমি এর অবস্থা দেখে হেসে উঠলাম। এর ভাব-ভঙ্গি বলে দিচ্ছে—এটিকে সমুদ্র পীড়ায় পেয়েছে। আমি আমার আগের জায়গায় ফিরে গেলাম। ওরাং-ওটাং মানুষের জাত ভাই হওয়ায় এটির অসুস্থতাকে আমি মানবিক দৃষ্টিতেই দেখলাম।

আমি আবার দিগন্তে তাকালাম। মনে আমার আকাশচুম্বী আশা। 'অরেঞ্জ জুসে'র শোচনীয় অসুস্থতার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমার নজর কাড়লো। তা হচ্ছে এটি এখনও অক্ষত। এবং সে হায়েনার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। মনে হচ্ছে এটি এখন আর হায়েনাকে ভয় পাচ্ছে না। জীবন বৈচিত্র্যের অনেক দিক নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার মনে হলো—গণ্ডার আর ছাগল একসাথে থাকতে পারলে হায়েনা আর ওরাং-ওটাংয়ের একসাথে থাকায় বাধা কোথায়?

সেদিন দুপুরের কোন এক সময় আমি তার প্রথম চিহ্ন দেখলাম। পরবর্তীকালে সে ছিলো আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু। নৌকার গায়ে দুম দুম শব্দ এবং আঁচড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ঝুঁকে এক থাবায় এটিকে ধরে ফেললাম। এটি ছিলো এক বড়ো সামুদ্রিক কচ্ছপ। বাজপাখির মতো ঠোঁট, পাখনাগুলো অলসভাবে নড়ছে, মাথাটা ঘন সবুজ, বেশ বড়ো দু'টি নাকের ছিদ্র, খোলসটা হলুদ-বাদামী, প্রায় তিন ফুট লম্বা, এতে ছোপ ছোপ শ্যাওলা।

আমি এটিকে ছেড়ে দিলাম। বললাম, "যাও একটি জাহাজকে গিয়ে খবর দাও যে আমরা এখানে। এটি ডুব দিলো এবং অদৃশ্য হলো।

৪৬

দিগন্তের যেখানে জাহাজ দেখবো বলে তাকিয়ে আছি সেখানে জমলো মেঘ। এটা নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত যে অমুক বা তমুক রাতটি আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ রাত ছিলো। এটা বেছে বের করতে হলো আমাকে বেছে নিতে হবে একই রকম বিপজ্জনক অনেক রাত। এখনও সমুদ্রের সেই দ্বিতীয় রাতটির ভোগান্তির স্মৃতিতে আমি শিউরে উঠি।

আমার চারপাশে হাঙরের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। সূর্য দিনের ওপর রাতের পর্দা নামাতে শুরু করলো। পড়ন্ত বিকেলের কমলা-লাল রোদ সমুদ্রের নীল ক্যানভাসে কত ছবিই না আঁকছে। সমুদ্রের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী হাঙর আমাদের চারপাশে—স্বভাবতই সতর্ক হতে

হলো। সবচেয়ে বড়ো হাড়টি এলো একটু পরেই। দূর থেকে পানির বেশ কয়েক ইঞ্চি উপরে এটির পাখনা দেখতে পেলাম। এটির রকম-সকম সুবিধের মনে হলো না। মনে হলো এটা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। আমাদের দিকে ছুটে আসতে আসতে নৌকার কাছাকাছি এসে এটি ডুব দিলো। খানিক পর ভেসে উঠে আবার চলে গেলো যেদিক থেকে এসেছিলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হাঙরের দিকে এতো মনোযোগী ছিলাম যে 'অরেঞ্জ জুস' কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। হঠাৎ ওর দিকে চোখ গেলো।

সে তারপুলিনের শব্দ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মন খারাপ লাগতে লাগলো। সে আমাদের চিড়িয়াখানায় দুটি বাচ্চার জন্য দিয়েছিলো। তার পাঁচ ও আট বছরের বাচ্চা আমাদের চিড়িয়াখানার গর্ব ছিলো। বানর জাতীয় প্রাণীরা সবসময় যা করতে থাকে। কিন্তু অরেঞ্জ জুসের বর্তমান আচরণে তার ছিটেফোঁটাও ছিলো না। গত ছয়ি ঘণ্টা সে আমাকে দেখছে। হাঙরের আনাগোনা ওরও হয়তো নজরে পড়েছে। কিছু একটা বোঝাতে চাইলো—বুঝলাম না। আমি যেন ওদের মতোই নির্বোধ পশু হয়ে গেছি। সবকিছু হারিয়ে আমার অভিব্যক্তি এখন একেবারেই ভাবলেশহীন।

আরেকটি শব্দে নজর ফিরিয়ে দেখলাম হায়েনাটা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। সারাদিন এটি জায়গা থেকে নড়েনি। এটি এর সামনের পা জেব্রার দিকে বাড়ালো এবং জেব্রার চামড়ায় দাঁত বসিয়ে টানতে লাগলো। জেব্রার পেটের কাছ থেকে উঠে এলো এক টুকরো চামড়া। সাথে সাথে নদীর মতো রক্ত বইতে শুরু করলো। আর্তচিৎকারে ডেকে, দাঁত খিঁচে এটি নিজেকে রক্ষা করতে চাইলো। এটি এর সামনের পা দিয়ে ধাক্কিয়ে মাথাটা পিছে টেনে এনে হায়েনাটাকে কামড়াতে গেলো। কিন্তু হায়েনা ছিলো নাগালের বাইরে। জেব্রার এ দাঁত খিচুনিতে হায়েনাটা তেমন ভয় পেলো বলে মনে হলো না। জেব্রার এক পাশে এ আবার দাঁত চালালো। এতেও সে সন্তুষ্ট হলো না। এটি তখন জেব্রার রোমান্থন থলিতে চড়ে বসলো এবং কামড়িয়ে জেব্রার অন্ত্র বের করে আনলো। এটার খাবার ধরনে কোন শৃঙ্খলা ছিলো না। এই এক জায়গায় এক কামড় দেয় আবার অন্য জায়গায় মুখ লাগায়। কলজের অর্ধেকটা খেয়ে এটি জেব্রার সাদা বেলুনের মতো পাকস্থলীতে মুখ লাগালো। কিন্তু সুবিধা করতে পারলো না। জেব্রার রোমান্থন থলি এ পেটের চেয়ে উঁচু আর রক্তে জায়গাটা হয়ে উঠেছিলো পিচ্ছিল। ফলে এটি এর শিকারের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এর মাথা এবং কাঁধ পড়লো জেব্রার অন্ত্রের ওপর। এটি উঠে এসে আরাম সুবিধামতো অবস্থান নিয়ে খেতে বসলো। ভিতর থেকে এটি জীবন্ত জেব্রাকে খেতে শুরু করলো।

জেব্রাটি তখনও সাহসের সাথে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলো। এর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো।

'ওরেঞ্জ জুস' ব্যাপারটাকে নিরুদ্বেগভাবে মেনে নিতে পারলো না। সে তার বেঞ্চে উঠে দাঁড়ালো। তুলনামূলকভাবে ছোট তার পা এবং শরীর দেখতে অনেকটা ফ্রিজের মতো। কিন্তু সে যখন তার লম্বা বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করে তখন ভয়ঙ্কর দেখায়। দুই হাত প্রসারিত করে সে গর্জন করে উঠলো।

সচরাচর জিরাফের মতো নীরব থাকলেও তার এখনকার গর্জন ছিলো ভয়ানক। হায়েনাটা আমার মতোই চমকে উঠলো। এটি দু'পা পিছু হটলো। কিন্তু বেশি সময়ের জন্য নয়। ওরেঞ্জ জুসের এ গর্জনে হায়েনার ঘাড়ের লোম এবং লেজ খাড়া হয়ে উঠলো। এটি মৃতপ্রায় জেব্রাটার

দিকে একটু সরে গেলো। রক্তমাখা মুখে এটিও গর্জে উঠলো ভয়ঙ্করভাবে। দুটি জন্তুর দূরত্ব মাত্র তিন ফুট। দাঁত খিচে দু'জন দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তারা দু'জনেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গর্জন করে উঠলো। কেঁপে উঠলো প্রশান্ত মহাসাগর।

কিছুক্ষণ আগেও যেখানে ছিলো শুধু বাতাসের শো শো শব্দ সেখানে এখন প্রকৃতির করুণ সুর যেন বেজে উঠলো। বন্দুক, কামান, বোমা, ট্যাঙ্ক নিয়ে যুদ্ধের মতো, দ্রুম দ্রুম বোমার শব্দের মতো ওদের এ গর্জনও প্রশান্তের বুকে কাঁপন ধরালো। হায়েনাটা এর সর্বোচ্চ নাদে গর্জে উঠলো আমি কখনও এতো জোরে হায়েনার ডাক শুনিনি। তুলনায় ওরাং-ওটাংয়ের ঘসঘসে গলার গর্জন একটি নিচু গ্রামের। এ দু'জনের গর্জনের মাঝে আবার মৃত্যুপথযাত্রী জেব্রার চিৎকারও শোনা যাচ্ছিলো। এদের গর্জনে আমার কানে তালা লাগার অবস্থা হলো।

ভয়ে আমি ভীষণভাবে কাঁপছিলাম। এ কাঁপুনিকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আমি ধরেই নিলাম হায়েনাটা 'অরেঞ্জ জুস'কে খেতে যাচ্ছে।

কল্পনাও করিনি পরিস্থিতি এতোটা খারাপ হবে। হলো তাই। জেব্রাটি এর কিছু রক্ত নৌকার বাইরে উগরে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে রক্তের গন্ধে চারদিক থেকে ধেয়ে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর। তার রক্তের উৎসের সন্ধান করতে লাগলো। নৌকার তলায় তাদের লেজ আর পাখনার ঘষাঘষির শব্দ পাচ্ছিলাম। ক্রমাগত তারা নৌকার তলায় আঘাত করতে লাগলো। আমি নৌকাডুবির ভয় করছিলাম না, ভয় করছিলাম যেভাবে হাঙরেরা চড়াও হচ্ছে তাতে এরা ধাতু নির্মিত এ নৌকাও ভেঙেচুরে আমাদের ডুবিয়ে মারবে।

প্রতিটি গর্জনের সাথেই পশু দু'টি লাফিয়ে উঠছে আর ভয়ঙ্করভাবে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মুখের লড়াই অচিরেই শরীরের লড়াইয়ে রূপ নেবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। লড়াই শুরু না হতেই থেমে গেলো। ওরেঞ্জ জুস অভিমানের সুরে গর্জন করতে করতে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুরে দাঁড়ালো এবং সরে এলো আর হায়েনাটা অর্ধভুক্ত জেব্রার পিছনে আশ্রয় নিলো। অনেকক্ষণ শুঁতোশুতি করেও রক্তের সন্ধান না পেয়ে এক সময় হাঙরেরাও বিদায় হলো। অবশেষে নেমে এলো নীরবতা।

বাতাসে তীব্র বদগন্ধ, কাদামাখা পশু বিষ্ঠার গন্ধ ভেসে এলো। সর্বত্র রক্ত, লাল লাল ছোপ ছোপ রক্ত। একটি মাছি ভনভনিয়ে উড়ে এলো, যা আমার কাছে এক উন্মত্ত বিপদের সতর্ক ঘণ্টার মতো। কোনো জাহাজ তো নয়ই, অন্য কিছুই দিগন্তে সেদিন দেখা যায়নি এবং এখন দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। সূর্য যখন দিগন্তরেখা থেকে হারিয়ে গেলো—তখন শুধু দিনটিই নয়, জেব্রাটিও মারা গেলো, যে ছিলো আমার পরিবারের এক হতভাগ্য সদস্য। এই দ্বিতীয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে ব্যথা আর শোকবার্তা নিয়ে আমাদের জীবনতরীতে প্রবেশ করলো অবিশ্বাস। আপনি যখন আপনার ভাইকে হারান, তখন এমন একজনকে হারান পরিণত বয়সে যার সাথে আপনি অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারতেন, যে আপনাকে একজন ভাবি, ভাতিজা, ভাতিজি উপহার দিতো; আপনি যখন বাবাকে হারান তখন এমন একজনেক হারান যাঁর তত্ত্বাবধান এবং সাহায্য আপনার পাথেয় এবং যিনি আপনাকে বৃক্ষের মতো ছায়াতলে আশ্রয় দিতেন; আপনি যখন আপনার মাকে হারান, এটাকে মনে হবে মাথার ওপর থেকে সূর্যটা হারিয়ে যাওয়ার মতো। ভাই গেছে, বাবা গেছেন, মা গেছেন, জেব্রাটাও....ওহ্! দুঃখিত, আমি আর বলতে পারছি না।

আমি তারপুলিনের ওপর শুয়ে পড়লাম এবং সারাটা রাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম। হায়েনাটা রাতের বেশিরভাগ কাটালো মাংস খেতে খেতে।

৪৭

এদিনের সকাল হলো মেঘলা আকাশ নিয়ে। বাতাস ছিলো ভেজা, ধূসর মেঘের কম্বলে আকাশ ছিলো ছাওয়া। সমুদ্রের কোন পরিবর্তন ছিলো না। আগের মতোই আমাদের জীবনতরী স্বাভাবিক ছন্দে দুলছিলো।

জেব্রাটা তখনও বেঁচে ছিলো! আমি কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। শরীরে দুই ফুট গভীর গর্ত, নিভে আশা আগ্নেয়গিরির মতো লাল ক্ষত, অর্ধেক অর্ধেক খাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—তারপরও এর হৃৎপিণ্ডটা এখনও দুর্বলভাবে ওঠা-নামা করছে। পেছনের পাটা একটু একটু নড়ছে আর চোখ পিটপিট করছে। ভয় আর বিস্ময় আমার চোখকে কপালে তুলে দিলো।

হায়েনাটা ছিলো উত্তেজিত। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটা রাতে জেগে থেকে দিনে ঘুমাচ্ছে না। রাতভর খেয়েছে—পেটটা তাই ফুলা। অরেঞ্জ জুসের ভাবসাবও ছিলো ভয়ঙ্কর। সে বুক চাপড়াচ্ছিলো আর দাঁত বের করে ভয় দেখাচ্ছিলো।

আমি আমার জায়গাতেই ছিলাম। নৌকার সামনের গলুইয়ের কাছে গুটিশুটি মেরে। আমি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ছিলাম ভীষণ দুর্বল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে বৈঠায় হেলান দিতে গেলেই হয়তো পড়ে যাবো।

দুপুর নাগাদ জেব্রাটা মারা গেলো। সংঘর্ষ শুরু হলো বিকেলে। হায়েনাটা রাগে ফুঁসছিলো। অরেঞ্জ জুস হাত দিয়ে বুক চাপড়াচ্ছিলো আর পুরু ঠোঁট ভেংচে আওয়াজ করছিলো। হঠাৎ তাদের উত্তেজনা চরমে উঠলো। হায়েনাটা অর্ধভুক্ত জেব্রার ওপর দিয়ে লাফিয়ে এসে তেড়ে গেলো অরেঞ্জ জুসের দিকে।

আমি নিশ্চিত অচিরেই আমি হায়েনার ভোগে পরিণত হতে যাচ্ছি। এটা আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাকে ধরার আগে এটি অরেঞ্জ জুসকে ঘায়েল করবে। অরেঞ্জ জুস সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

অরেঞ্জ জুস হায়েনার মাথায় আঘাত করলো। এটা ছিলো খুবই জোরালো আঘাত। আমার হৃদয়ে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা আর ভয় একই সাথে কাজ করতে লাগলো। আমি কি আগে উল্লেখ করেছি অরেঞ্জ জুস ছিলো পোষা প্রাণী এবং তার ইন্দোনেশিয়ান মালিক নির্দয়ভাবে বাড়তি ঝামেলা মনে করে তাকে ত্যাগ করেছিলো? তার কাহিনী ঠিকমতো পোষ না মানা অন্য প্রাণীদের মতোই। অনেকটা সেই কুকুরটির মতোই এর গল্পটি—যে কুকুর ছানাটিকে খুব ছোটবেলায় কেনা হয়েছিলো। এটি যখন বড়ো হলো তখন এর আচরণ কখনও কখনও বন্য হয়ে উঠতো। একবার তার মনিবগিন্নী তার শোবার জায়গার গ্রাউন্ড শীটটি ধুনে নিতেই কুকুরটি দাঁত খিঁচে তেড়ে এলো। আরেকদিন মনিবের শিশু সন্তান তার হাত থেকে দুষ্টুমি করে যেই খাবারটি কেড়ে নিলো অমনি ওটা দাঁত খিঁচে কামড়াতে এলো। শেষে মালিক একদিন এটিকে জীপের পিছনে বসিয়ে জঙ্গলে নিয়ে এলো। জঙ্গলের এক জায়গায় সবাই নামলো—কুকুরটিও। কুকুরটি চারদিক দেখছিলো। হঠাৎ দেখলো ঝটপট সবাই জীপে উঠে পড়লো আর জীপটা দ্রুত চলতে শুরু করলো। কুকুরটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। এই অচেনা জায়গায় সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। অবশেষে অনাহারে আর অন্য কুকুরদের আক্রমণে সে ঐ জঙ্গলেই মারা গেলো।

অরেঞ্জ জুসের গল্প অনেকটা এমনই। শুধু তাকে জঙ্গলে না ফেলে আমাদের চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেয়া হয়েছিলো। সে তার সারাজীবন আমাদের চিড়িয়াখানায় ভদ্র জীবনযাপন করেছে—কখনও কাউকে আক্রমণ করেনি। আমার মনে আছে আমি যখন ছোট ছিলাম, এটি তখন এর অল্প বয়েসী লম্বা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো। আমার চুলে বিলি কাটতো। সে যখন বড়ো হলো দূর থেকে তাকে আমি লক্ষ্য করতাম। আমি তাকে এমনভাবে চিনতাম যে তার প্রতিটি আচরণ ছিলো আমার নখদর্পণে। তার হিংস্রতার দৌড়ও আমার জানা ছিলো। কিন্তু এখন সে যেভাবে হায়েনাটাকে আঘাত করলো তা ছিলো আমার ধারণা তো বটেই কল্পনারও বাইরে।

সে হায়েনার মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত করলো যে হায়েনার মাথা জোরে ঠুকে গেলো বেঞ্চের সাথে। হায়েনাটি এমনভাবে চিৎকার করে বেঞ্চে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, সামনের পা দু'টি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে আমার মনে হলো হয় বেঞ্চটি অথবা হায়েনার মাথা অবশ্যই ভেঙেছে। কিন্তু সাথে সাথেই হায়েনাটি উঠে দাঁড়ালো। এর প্রতিটি লোম সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠলো। কিন্তু এটিকে মনে হলো আক্রমণের সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এটি রণে ভঙ্গ দিলো। আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম। অরেঞ্জ জুসের শক্ত প্রতিরোধ আমার হৃদয়ে প্রশান্ত ধারা বইয়ে দিলো।

কিন্তু এটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

একটি পরিণত মাদী ওরাং-ওটাং একটা পরিণত বুটিদার পুরুষ হায়েনাকে হারাতে পারে না। পুরুষ ওরাং-ওটাং হলেও একটি কথা ছিলো। অথবা অন্তরে যে পাল্লায় আমি এটিকে মাপি তেমনটি বাস্তব হলেও কথা ছিলো। এর ওজন মাত্র ১১০ পাউন্ড। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ওরাং-ওটাংয়ের ওজনের অর্ধেক। তার ওপর এটা এক ফল খাওয়া প্রাণী, মাংসাশী নয়। এটা কি করে জানবে, কি করে আক্রমণ করতে হবে, কোথায় কামড়ে ধরতে হবে? হায়েনা শুধু এর লম্বা চোয়ালের জোরেই তো এই বন মানুষটিকে ঘায়েল করে ফেলবে।

হায়েনাটা ফিরে এলো। এটি এক লাফে বেঞ্চে উঠে অরেঞ্জ জুসের কবজি কামড়ে ধরলো যাতে এটি আর থাবা দিতে না পারে। অরেঞ্জ জুস তার অন্য হাত দিয়ে হায়েনার মাথায় আঘাত করলো। কিন্তু এ আঘাত হায়েনাকে কাবু করতে পারলো না। অরেঞ্জ জুস কামড়াতে গেলো, ক্ষিপ্রতার সাথে সরে গেলো হায়েনাটা। হায়! অরেঞ্জ জুসের দুর্বল প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো। হায়েনাটি তার কজি ছেড়ে এবার গলায় কামড়ে ধরলো।

ভয়ে আর আতঙ্কে আমি লক্ষ্য করলাম অরেঞ্জ জুস অকার্যকরভাবে আঘাত করে যাচ্ছে, হায়েনার দাঁত আরও চেপে বসছে অরেঞ্জ জুসের গলায়—অরেঞ্জ জুস হায়েনার চুল টেনে ধরেছে। তার চোখে আমি মানুষের মতো কান্না দেখলাম। সে তারপুলিনে উঠতে গেলো। কিন্তু হায়েনাটা তাকে ভীষণভাবে চেপে ধরলো। সে বেঞ্চ থেকে নৌকার খোলে পড়ে গেলো, হায়েনা এখনও তাকে কামড়ে ধরে আছে। আমি ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেলাম কিন্তু আর কিছু দেখতে পেলাম না।

এরপর আমার পালা। ব্যাপারটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার। অনেক কষ্টে আমি উঠে দাঁড়ালাম। অশ্রু আমার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিলো। আমি আমার পরিবারের জন্য এখন আর কাঁদছি না। ও ধরনের কোনো অনুভূতি আমার ভেতর কাজ করছে না। আমি কাঁদছিলাম কারণ আমি চরমভাবে ক্লান্ত এবং এখন বিশ্রামের সময়।

আমি তারপুলিনের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। যদিও নৌকার পিছনে এটি শক্ত করে বাঁধা
ছিলো, কিন্তু মাঝ নৌকা পর্যন্ত এটি বিছানো ছিলো। আমাকে জাল এবং আধগোটানো
তারপুলিনের ওপর দিয়ে যেতে হবে। নৌকাটি দুলছিলো। তাই হিসেব করে পা ফেলতে হবে।
মাঝখানের বেঞ্চে পা রাখতেই মনে হলো শক্ত মাটিতে পা পড়লো। আরেক পা টেনে এনে এই
প্রথম আমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালাম।-আমার শরীর ছিলো ভীষণ ক্লান্ত, কিন্তু জীবনের চরম মুহূর্তে
এসে এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলে না। আমার এই মুহূর্তের একমাত্র অস্ত্র আমার দু'টি
হাত। আমার হাত দু'টি বুক বরাবর তুললাম। হায়েনাটি আমার দিকে তাকালো। ওর মুখ ছিলো
লাল। ওর পাশেই পড়ে আছে অরেঞ্জ জুস। ছোট্ট পা দু'টি ভাঁজ করা। গলা থেকে তার মাথা
ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। তার পাশেই মৃত জেব্রাটি পড়ে আছে। হায়েনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব
মুহূর্তে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আমি নিচে তাকালাম।

আমার দু'পায়ের মাঝে, বেঞ্চের নিচে রিচার্ড পার্কারের মাথাটি দেখতে পেলাম। এটি
ছিলো প্রকাণ্ড। আমার বিস্ময়ের আকাশে এটি ছিলো জ্বলজ্বলে বৃহস্পতি গ্রহ। তার থাবা যেন
এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার মতোই সর্বজ্ঞ।

আমি আবার নৌকার সামনে আমার অবস্থানে ফিরে গেলাম এবং বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে
গেলাম।

রাতটা কাটলো ঘোরের ভেতর। যতোক্ষণ জেগে থাকলাম সমস্ত চেতনা জুড়ে থাকলো
বাঘ, যখন ঘুমিয়ে গেলাম ঘুম ভাঙলো বাঘের স্বপ্নে।

৪৮

রিচার্ড পার্কার নামকরণটি হয়েছিলো এক কেরানীর ভুলে। বাংলাদেশের খুলনা জেলার
সুন্দরবন লাগোয়া গ্রামগুলোতে একবার এক চিতাবাঘ খুব অত্যাচার শুরু করলো। ক'দিন
আগেই এ বাঘটি একটি মেয়েকে নিয়ে গেছে। পরে শুধু তার মেহেদী রাঙানো ছোট্ট একটি হাত
আর কয়েকটা প্লাস্টিকের বালা পাওয়া গেল। গত দু'মাসে এটি বাঘটির ৭ম শিকার। দিনে
দিনে বাঘটির সাহস বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েটির আগে ভর দিন-দুপুরে মাঠে কাজ করার সময়
একটি লোককে বাঘে নিয়ে গিয়েছিলো। বাঘটি লোকটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো জঙ্গলে,
সেখানে বাঘটি তার শরীরে বেশ খানিকটা মাথা এবং কান খেয়ে ফেলে। লোকটির আধখাওয়া
লাশ পাওয়া গিয়েছিলো একটি গাছের ডালে। গ্রামবাসীরা লাশটি না নামিয়ে সারারাত পাহারা
দিয়েছিলো লুকিয়ে থেকে—তাদের আশা ছিলো লাশের বাকিটা খেতে বাঘটি নিশ্চয়ই আবার
আসবে। কিন্তু চিতাটি আর আসেনি। বন বিভাগ শেষে এক পেশাদার শিকারিকে ভাড়া করলো
বাঘটি মারার জন্য। নদীর ধারে একটি গাছের সাথে বেঁধে রাখা হলো এক ছাগল। ছাগলটার
কাছেই এক উঁচু গাছে মাচা বেঁধে তাতে অপেক্ষা করতে লাগলো শিকারি। সে এভাবে বেশ
কয়েক রাত অপেক্ষা করলো। তার ধারণা ছিলো এটি একটি বুড়ো চিতা, যার দাঁত দুর্বল হয়ে
গেছে এবং দৌড়ে অন্য শিকার ধরতে না পেরে মানুষখেকো হয়েছে। কিন্তু অবশেষে ছাগলটির
কাছে যে বাঘটি এলো সেটি নরম চকচকে মনোরম চামড়ার বাঘ। এটি ছিলো এক মাদী বাঘ,

সাথে বাচ্চা। ছাগলটি ভয়ে ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো। প্রায় তিন মাসের মতো বয়সের বাচ্চা
বাঘটি ছাগলটির দিকে মন না দিয়ে নদীর কিনারে গেলো পানি খেতে। এটির বোধহয় খুব
পিপাসা লেগেছিলো। বাচ্চাটির পিছু পিছু বাঘটিও পানি খেতে নামলো। ক্ষুধার চাইতে পিপাসার
তাগিদ নিশ্চয়ই বেশি। পানি খাওয়ার পর বাঘটি ছাগলটির দিকে মনোযোগ দিলো। শিকারির
দু'টি রাইফেল ছিলো। একটি থেকে ছোঁড়া যেতো আসল বুলেট অন্যটি দিয়ে ছোঁড়া যেতো
অজ্ঞান করার তীরশলাকা। শিকারি বুঝতে পারলো এটি মানুষখেকো নয়। তবু এটি লোকালয়ের
এতো কাছাকাছি চলে এসেছে যে বিপদ ঘটাতে পারে। সে তাই অজ্ঞান-শলাকার রাইফেলটি
তুলে নিলো। বাঘটি তীরের আঘাতে পাগলের মতো দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো। শিকারি তার
ওয়াকিটকিতে সহকারীদের নির্দেশ দিলো বাঘটিকে অনুসরণ করতে। তারা নদী থেকে দুইশ'
গজ দূরে গিয়ে বাঘটিকে পেলো। বাঘটি তখনও অজ্ঞান হয়নি। তার পিছনের পা ছিলো অবশ
আর সামনের পা টলছিলো। লোকগুলো যখন বাঘটিকে ধরতে গেলো তখন এটি পালাতে চেষ্টা
করেছিলো। না পেরে বাঘটি সামনের পা দিয়ে থাবা মারার ভঙ্গিতে লোকগুলোকে ভয় দেখাতে
লাগলো। এতে সে আরও তাড়াতাড়ি পড়ে গেলো এবং অজ্ঞান হলো। আর এভাবেই পন্ডিচেরি
চিড়িয়াখানা পেয়ে গেলো নতুন দু'টি বাঘ। বাচ্চাটিকে পাওয়া গিয়েছিলো পাশের ঝোপে—ভয়ে
কাঁপছিলো। শিকারির নাম ছিলো রিচার্ড পার্কার। সে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলো। বাচ্চাটি
কীভাবে পানি খেতে নেমেছিলো তা শিকারির মাথায় ছিলো। সে বাচ্চাটিকে আদর করে পানি
খাওয়ালো। কিন্তু হাওড়া রেলস্টেশনের কেরানী করে বসলো এক মস্ত ভুল। বাচ্চা বাঘটির সমস্ত
কাগজপত্রে সে এটির নাম উল্লেখ করলো রিচার্ড পার্কার নামে। ব্যাপারটা বাবা খুব মজা পেয়ে
চিবিয়ে চিবিয়ে হেসেছিলেন এবং এটির নাম রিচার্ড পার্কারই বহাল রেখেছিলেন।

আমি জানি না ঐ মানুষখেকো চিতাটিকে আর পাওয়া গিয়েছিলো কিনা।

৪৯

সকালে আমি আর নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। নিশ্চল পড়েছিলাম তারপুলিনের ওপর।
এমনকি চিন্তায়ও জট লেগে যাচ্ছিলো। তাই সোজাপথে ভাবতে থাকলাম। অবশেষে মরুভূমিতে
উট-টানা ক্যারাভানের মতো ধীরে কিছু ভাবতে সমর্থ হলাম।

দিনটি ছিলো আগের দিনের মতোই। গরম, মেঘলা, সেগুলো অনেক নিচে নেমে এসেছে
আর হাল্কা বাতাস বইছে।

এই প্রথম আমি খাবার কথা ভাবলাম। গত তিনদিনে কিছুই খাইনি, এমনকি পানিও না।
ঘুমাতেও পারিনি একমিনিটের জন্যও। শরীর মন দুর্বল করার জন্য এগুলো যথেষ্ট নয় কি?
দুর্বলতার কারণ খুঁজে পেতেই আমার ভেতর একটু শক্তি ফিরে এলো।

রিচার্ড পার্কার এখনও নৌকায় আছে, এমনকি ঠিক আমার বেঞ্চের তলায়! এ এক
অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এও কি সম্ভব? আসলেই কি আমি এক জলজ্যান্ত বাঘের সাথে এতো
কাছাকাছি বাস করছি। যা যা ঘটেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে আসলেই ঘটনা
এমনই ঘটেছে। মাত্র ছাব্বিশ ফুট লম্বা এই জীবনতরীতে ৪৫০ পাউন্ডের এক রয়েল বেঙ্গল

টাইগারের উপস্থিতি আড়াই দিনেও কেন টের পেলাম না তা এক কঠিন প্রশ্ন। লুকিয়ে থাকার এ কৃতিত্বকে তুলনা করলে সম্ভবত এটি নৌবিজ্ঞানের ইতিহাসে সেরা ঘটনার মর্যাদাই পেয়ে যাবে। তার নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত মাপলে এটি এই নৌকার এক-তৃতীয়াংশ। তারপরও এটি এভাবে কি করে লুকিয়ে থাকতে পারলো তা এক চরম বিস্ময়ের ব্যাপার।

নিশ্চয়ই ভাবছেন ঐ পরিস্থিতিতে আমি নিশ্চয়ই সকল আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আসলেই তাই। এবং আমার সেই চরম বিপদের সময়ই আমি হঠাৎ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম আর এরে একটু স্বস্তিও ফিরে এলো। খেলাধুলার ক্ষেত্রে যা প্রায়ই দেখা যায়। টেনিসে তো প্রায়ই দেখা যায় যে চ্যাম্পিয়নকে হারানোর ঘোষণা দিয়ে চ্যালেঞ্জার খুব দাপটের সাথে খেলা শুরু করে। কিন্তু অচিরেই সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন চ্যাম্পিয়ন তার ওপর চড়াও হয় এবং জিতে থাকে। চ্যালেঞ্জারের তো হারাবার কিছু নেই! সে তখন দপ করে জ্বলে ওঠে। আবার সে তখন উন্মাদের মতো প্রতাপে খেলতে থাকে এবং জিতে নেয় খেলার শেষ পয়েন্টটি। আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি ছিলো তেমনি। হয়তো তার চাইতেও বেশি। একটি হায়েনার সাথে লড়াই তাও আবার হয় সম্ভব—কিন্তু এ যে রয়েলবেঙ্গল টাইগার। অগত্যা সমস্ত মানসিক বল জড়ো করে আমাকে প্রতিরোধে নামতেই হলো।

আমার বিশ্বাস এক ফোঁটা পানির জন্য বুকফাটা পিপাসাই সেদিন সকালে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। ঐ মুহূর্তে আমি পিপাসায় এমনই কাতর ছিলাম যে এক ফোঁটা পানি ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা আমার মাথায় ছিলো না। যিশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় শেষপর্যন্ত শ্বাসকষ্টেই মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে তিনি কেবল পানি চাইছিলেন। ঈশ্বর যদি পিপাসায় এমন কাতর হন তাহলে ভাবুন একজন মানুষের অবস্থা কী হতে পারে! পানির পিপাসা আমাকে পাগল করে তুললো। একটি বাঘের ভয় এই তীব্র পিপাসার কাছে তুচ্ছ।

আমি বাঘের ভয় দূরে ঠেলে খাবার পানি খুঁজতে লাগলাম। আমার বুদ্ধিও এ সময় খুব গেলো হঠাৎ। একটি আধুনিক জীবনতরী—নিশ্চয় তার ভেতর খাদ্য এবং পানীয় রক্ষিত আছে। আমাকে এটি খুঁজে বের করতেই হবে।

তার অর্থ আমাকে নড়াচড়া করতেই হবে।

আমি নৌকার মাঝখানে খুঁজলাম। তারপুলিনের কিনারে খুঁজলাম। আমাকে খুব কষ্ট হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে হচ্ছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি আগ্নেয়গিরি বেয়ে উঠছি এবং উপরে পড়া কমলা রঙের লাভা দেখে দেখে আমাকে এগুতে হচ্ছে। আমি টান টান হয়ে শুয়ে মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগলাম। রিচার্ড পার্কারকে দেখলাম না, যদিও হায়েনাটাকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিলো। খেয়ে ফেলা জেব্রাটার উচ্ছিষ্টের পাশে বসে এটি আমাকে দেখছিলো।

আমি আর এটিকে ভয় পাচ্ছিলাম না। মাত্র দশ ফুট দূরে হলেও এটা আমার মনে ভয় ধরাতে পারলো না। রিচার্ড পার্কারের উপস্থিতিই সম্ভবত আমাকে এতোটা সাহসী করে তুলেছিলো। যেখানে একটা আস্ত বাঘ রয়েছে সেখানে একটি কুকুর জাতীয় প্রাণীকে ভয় করার কোন মানে হয় না। বিড়বিড় করে বললাম, "কুৎসিত, বেহায়া বেল্লিক!" এটাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে ফেলে দিতে পারছিলাম না শুধু হাতে লাঠি ছিলো না আর শরীরে সেই শক্তি ছিলো না বলে—এটাকে ফেলে দেয়ার সাহস ঠিকই ছিলো।

হায়েনাটি কি আমার ভেতর প্রভূত আঁচ করতে পারলো? এটা কি মনে মনে বললো, "শোন প্রাণী আমাকে পাহারা দিচ্ছে—আমার নড়াচড়া না করাই ভালো?" যাই হোক এটা আর নড়লো না। সত্যি বলতে কি এটা যেভাবে মুখ লুকালো তাতে মনে হলো এটি ভয় পেয়েছে।

রিচার্ড পার্কারও পশুদের এই শ্রেষ্ঠদের প্রতি অনুন্নতদের আনুগত্যের দর্শন মানে বলে মনে হলো। রিচার্ড পার্কার যেমন আমাকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানতো, হায়েনাটাও রিচার্ড পার্কারকে তার নিজের চেয়ে সেরা জানতো। আর তাই বোধহয় জেব্রাটার পিছনে এটি অবস্থান নিয়েছিলো আর এটিকে প্রাণে মারতে এতো সময় নিয়েছিলো। একটা বাঘের সামনে থেকে তার গ্রাস খাচ্ছে—এমন এক দ্বিধাও তার ভেতর বোধহয় কাজ করছিলো। একটা বাঘের উপস্থিতি আমাকে হয়তো হায়েনার হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকবে। আর আমার অবস্থান ছিলো কড়াই এবং উনুনের মাঝে।

কিন্তু রিচার্ড পার্কারের মধ্যে বড়ো পশুসুলভ কোন আচরণই ছিলো না। রিচার্ড পার্কারের এই আড়াই-তিন দিন লুকিয়ে থাকার রহস্য আজ অজানা। দু'টি কারণ থাকতে পারে—খুব ঘুম ঘুম ভাব আর দুর্বলতা। বাবা রোজই অনেক পশুকে ঘুমের ওষুধ দিতেন। জাহাজডুবির কয়েক ঘণ্টা আগে বাবা হয়তো এটিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন। অথবা বিস্ফোরণের শব্দ, প্রচণ্ড শব্দ, সাগরে পড়ে যাওয়া, জীবনতরীতে ওঠার জন্য মরণপণ সাঁতার তার ঘুম ঘুম ভাবে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং তারপরে এটি হয়তো সমুদ্রপীড়ায় ভুগেছে। মোটামুটি বাঘটির নির্মোহ থাকার পেছনে এ কারণগুলোই আমি খুঁজে পেলাম।

যাই হোক এসব আর ভাবতে ভালো লাগছে না। আমার চাই পানি।

আমি জীবনতরীর মজুদ খুঁজতে লাগলাম।

৫০

জীবনতরীটি ঠিক সাড়ে তিন ফুট গভীর, আট ফুট প্রস্থ এবং ছাব্বিশ ফুট লম্বা। নৌকাটিরই একটি বেঞ্চে এসব তথ্য লেখা ছিলো। সেখানে আরও লেখা ছিলো, এ নৌকার সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা বত্রিশজন। দেখে এতো দুঃখের ভেতরও খুশি লাগছিলো। বত্রিশজনের জায়গায় আমরা মাত্র তিনজন। আর তাতেই কিনা গাদাগাদি অবস্থা! নৌকাটির গঠন সুসামঞ্জস্য। নৌকার পেছনে জুড়ে দেয়া আছে হাল। নৌকার তলার চেয়ে গভীরে যায়নি এ হালটি। নৌকার সামনের গঠন পিছনের মতোই। এ্যালুমিনিয়ামের এই নৌকায় লাগানো হয়েছে সাদা রং।

বাইরে থেকে নৌকাটিকে যতো বড়ো দেখায়, ভেতরে সে তুলনায় জায়গা অনেক কম। দেড়ফুট চওড়া বেঞ্চ নৌকার আগামাথা ঘিরে বিস্তৃত। বেঞ্চের ঠিক নিচ দিয়ে নৌকাটিকে ঘিরে রয়েছে বায়ুথলে। নৌকা ডুবে গেলে এ বায়ুথলে নৌকাকে ভাসিয়ে রাখে। এর ফলে নৌকার ভেতরদিকে লম্বায় কমে দাঁড়িয়েছে বিশ ফুট আর চওড়ায় পাঁচ ফুট। তাহলে রিচার্ড পার্কারের রাজ্যসীমা এখন একশ' (৫×২০) বর্গ ফুট। এর মধ্যে আবার তিনটি আড়াআড়ি বেঞ্চ আছে, যার একটি আবার জেব্রাটি জাহাজ থেকে পড়ার সময় ভেঙ্গে ফেলেছে। এ বেঞ্চগুলো আবার চওড়ায় ২ ফুট। নৌকার তলা থেকে এ বেঞ্চগুলো দু'ফুট উঁচুতে। এ বেঞ্চেরই তলায় শুয়ে আছে রিচার্ড পার্কার। তারপুলিনের তলায় আরও বারো ইঞ্চি জায়গা অবশ্য সে পাচ্ছে।

নৌকার ভেতরের প্রায় সবই উজ্জ্বল কমলা রঙের। তারপুলিন, বৈঠা, লাইফ জ্যাকেট, বয়া সবকিছু এমনকি বাঁশিটিও কমলা রঙের। নৌকার বাইরে কালো রঙে রোমান হরফে লেখা

'সিমিটসুম' এ পানামা। তারপুলিনের কুণ্ডলী মাঝখানের বেঞ্চ পর্যন্ত খোলা। সমস্ত তারপুলিনের তলায় অবস্থিত আড়াআড়ি প্রথম বেঞ্চটা এখন রিচার্ড পার্কারের দখলে, মাঝেরটা ঠিক তারপুলিনের প্রান্তে, খোলা জায়গায় আর ভাঙা তৃতীয় বেঞ্চে এখন মরা ছেত্রা।

দাঁড় টানার গর্ত ছয়টি। ইংরেজি 'U' অক্ষরের মতো এগুলো নৌকার মাথা কাটের সমান্তরাল। ছয়টি বৈঠার মধ্যে এখন আছে পাঁচটি। একটি আমি রিচার্ড পার্কারকে ঠেলে সরাতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তিনটি বৈঠা একদিকের বেঞ্চে রাখা। বিপরীত দিকের বেঞ্চে একটি। আর একটি দিয়ে আমি নৌকার সামনে নিজেকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। নৌকাটির গড়ন খুব মজবুত এবং ভারি।

নৌকার এই খুঁটিনাটি আমি জীবন বাঁচানোর তাগিদেই জেনেছিলাম। তাও একবারে না। নানা প্রয়োজনে যখন যেটির প্রয়োজন হয়েছে, তখনই সেটি নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছে আর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রয়োজনই তো মানুষের আবিষ্কারের বড়ো প্রেরণা।

৫১

রসদ খুঁজতে গিয়ে এই প্রথম আমি নৌকাটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। পিছনৌকার উপরিভাগ এবং পাশবেঞ্চের দু'ধার ধরে তাকালাম। একদম সমান। বায়ুথলে বরফের তাকালাম। না! এমন কোন বাড়তি অংশ আমার নজরে পড়লো না যেখানে ওগুলো লুকিয়ে রাখা যায়। কোনো বাক্সেশা, লকার বা এ ধরনের কোন প্রকোষ্ঠের সন্ধান পেলাম না।

জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং স্থপতিদের সম্বন্ধে আমার ধারণা কি তাহলে ভুল প্রমাণিত হবে? এতোক্ষণ ধরে রাখা আশাটা মিইয়ে যেতে থাকলো। তার ওপর পিপাসা তো ছিলোই।

রসদ যদি নৌকার সামনের অংশে থাকে, তারপুলিনের নিচে? আমি ঘুরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকলাম। আমার অবস্থা এখন অনেকটা শুকিয়ে যাওয়া গিরগিটির মতো। তারপুলিনের কুণ্ডলীটা একটু ধাক্কা দিয়ে দেখলাম। এটা শক্ত করে বাঁধা। ইস, এটাকে যদি খুলতে পারতাম তবে হয়তো পেয়ে যেতাম সেই মহার্ঘ গুপ্তধন! কিন্তু এটা খোলা এবং রিচার্ড পার্কারের ওয়াপা দেয়া একই কথা।

উপায় নেই। পিপাসায় আমার অবস্থা এমন যে এখন আমি যে কোনো কাজ করতে পারি। বৈঠাটা আগে তারপুলিনের ফাঁস থেকে খুলে নিলাম। আমি বয়াটার গোল ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাথা গলিয়ে এটিকে কোমরের কাছে এনে আটকে রাখলাম। বৈঠাটা নৌকার সামনে আড়াআড়ি রাখলাম। আমি নৌকার মাথাকাঠ বরাবর ঝুঁকে। নৌকার যে হুকগুলোর সাথে তারপুলিন বাঁধা সেখানে বুড়ো আঙুলে চাপ দিয়ে দিয়ে এগুলাম। প্রথম হুক পর্যন্ত যেতে খুব কষ্ট হলো। এরপর যেন একটু দ্রুতই এগুতে পারলাম। আমার কনুইয়ের তলায় তারপুলিন ফুলে থাকতে লাগলো। আমি এর ওপর সটান শুয়ে পড়লাম। তৃষ্ণায় প্রাণটা বুঝি বেরিয়েই যাবে।

একটু থুলনাম তারপুলিনের কুণ্ডলী। আর সাথে সাথে যেন খুলে যেতে থাকলো আলীবাবার গুপ্তগুহার দরোজা। নৌকার সামনের অংশও পিছনৌকার মতোই—একটা প্রান্তবেঞ্চ যুক্ত আছে এতে। এরই ওপর হীরকের মতো চকচক করছে তালা দেয়ার দু'টি আংটা। আংটা দু'টি একটা ঢাকনার সাথে লাগানো। আমার হৃদয়ে ছলাৎ করে নেচে উঠলো আশা। তারপুলিনটা আর একটু সরালাম। নিচে উঁকি দিলাম। ঢাকনাটার প্রান্তগুলো গোলাকার হলেও এটি ত্রিভুজাকৃতির। পরটা মোটামুটি তিন ফুট চওড়া, গভীরতায় দুই ফুট। হঠাৎ কমলা রঙের একটা কিছু দেখে চমকে উঠলাম। এক ঝটকায় মাথাটা পিছনে সরিয়ে নিলাম। কমলা রঙের কোন নড়াচড়া নেই। আবার তাকালাম। আরে ধ্যেৎ! বাঘ কোথায়? এতো একটা লাইফ জ্যাকেট। রিচার্ড পার্কারের ওয়াপা ঠিক পিছনেই থরে থরে সাজানো বেশ কয়েকটা লাইফ জ্যাকেট।

আমার সারা শরীর ভয়ে কেঁপে উঠলো। লাইফ জ্যাকেটগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাঘটির শরীরের কিছু অংশ। আমি এর পাছা এবং পিঠের এক অংশ দেখতে পেলাম। হালুদের ওপর কালো ডোরা কাটা, কলজেতে ভয় ধরানো সুন্দর। পিছনৌকার দিকে মুখ করে সটান শুয়ে আছে এটি। নিশ্বাসে বুক ওঠা-নামা ছাড়া এখনও রিচার্ড পার্কারের কোনো নড়াচড়া নেই। হায় ঈশ্বর! বাঘটা এতো কাছে? ঠিক আমার দু'ফুট নিচে এখন এর অবস্থান। ভাগিস ওর শরীরে এখনও আমার শুঁতো লাগেনি! আমাদের শুধু একটি পাতলা তারপুলিনের আড়াল। আমি স্থির নিশ্চল পড়ে রইলাম।

কিন্তু পানি আমার চাই-ই। আমি আংটা ধরে আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুললাম। আরে! এ যে একটা লকার! ঢাকনাটা খুলে ধরলাম। এটি এমনভাবে ঝুলে থাকলো যাতে রিচার্ড পার্কার এবং আমার মাঝে একটু হলেও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলো। আমি আর একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। নৌকার চারদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। একটা হাতরও আমার নজরে পড়লো না।

দু'পায়ের মাঝ দিয়ে নিচে তাকালাম। ওহ! আনন্দে আমার অজ্ঞান হবার যোগাড়! কতোকিছু যে লকারে ঠাসা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে আমি পানি খুঁজতে শুরু করলাম। এটি বোতল, টিনের ক্যান কিংবা কার্টনেও থাকতে পারে। আরে, ঐ তো লেখা—'পানীয় জল'। ৫০০ লিটারের অনেক ক্যান। অনেক বলছি এ কারণে যে, এক নজর দেখে গোনা সম্ভব নয়।

কাঁপা কাঁপা হাতে দ্রুত তুলে নিলাম একটা। একটু ঝাঁকি দিয়ে নাড়িয়ে দেখলাম। 'গ্লাব-গ্লাব-গ্লাব'—পানির শব্দ! এ শব্দে আমার পিপাসা যেনো আরও চাগিয়ে উঠলো।

কিন্তু ক্যানটা খুলি কিভাবে?

ক্যান যখন আছে তখন নিশ্চয়ই এটা খোলার যন্ত্রও থাকবে। খুঁজতে থাকলাম। পেলাম না। আমার আর তর সইছিলো না। শেষে একটু পিছিয়ে এসে নৌকার মাথাকাঠের হুকের সাহায্যে চেষ্টা করলাম। প্রথম চেষ্টায় পারলাম না। আবার চেষ্টা। আবার ব্যর্থ। আবার চেষ্টা—এভাবে একসময় খুলে গেলো ক্যান।

পানি! আমার সমস্ত চেতনা যেনো নেচে উঠলো। এ যে আমার তরল জীবন! নিমিষে ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম ক্যানের সবটুকু। আহ্! আরেকটি ক্যান তুলে নিলাম। এটিও শেষ করলাম একইভাবে। আরেকটি খুললাম। এভাবে চারটি। অর্থাৎ দু'লিটার। অনেকে হয়তো বলবেন দীর্ঘ অনাহারের পর আমার এতো পানি খাওয়া উচিত হয়নি। বোকা! ঐ মুহূর্তে কী যে শক্তি পেয়েছিলাম এভাবে পানি খেয়ে। আমার মুখে, চোখের পাতায় চিবুকে পানির ছোঁয়া মানে ইচ্ছিলো শুকিয়ে যাওয়া ফুলের পাপড়ির ওপর পানির ছোঁয়া লাগলো। আমার হৃৎপিণ্ডে যেনো আনন্দের ঢোল বেজে উঠলো। পেশীতে যেনো শক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম। মস্তিষ্কের জট খুলে যেতে থাকলো।

এবার আমি খাবারের খোঁজ করতে লাগলাম। আমি যে কার্টনগুলো পেলাম সেগুলো 'সেভেন ওসেনস স্টান্ডার্ড ইমারজেন্সি রেশন'—নরওয়ের মার্গেনের। রুপালি প্লাস্টিক ক্যানের

ওপর বারোটি ভাষায় লেখা। একটি ক্যানের ইংরেজি লেখা পড়ে ফেললাম—আঠারোটি বিস্কুট আছে এতে, যা ময়দা, পশুচর্বি এবং গ্লুকোজ দিয়ে তৈরি। সাবধান করে আরও লেখা আছে চব্বিশ ঘণ্টায় ছয়টি বিস্কুটের বেশি খাওয়া যাবে না।

বিস্কুটের প্যাকেটের ওপর লেখা, 'খোলার জন্য এখানে ছিড়ুন।' একটি তীরচিহ্ন দিয়ে জায়গাটা নির্দেশ করা। মোমের প্রলেপ দেয়া কাগজে মোড়ানো নয়টি বার। একটা খুললাম। একটার ভেতর দু'টি বিস্কুট। একটি তুলে কামড় দিলাম। ওম্! এমনিতেই নরওয়ের বিস্কুট নাম করা, আর এগুলো বানানোও হয়েছে বিশেষ যত্নে তার ওপর এতো দীর্ঘ সময়ের ক্ষুধার্ত আমি। এগুলো এতো সুস্বাদু ছিলো! খুব মিষ্টিও না, খুব নোনতাও নয়—এক অদ্ভুত স্বাদ। এগুলো খাবার পর আমার উদোর হয়তো একটি কথাই বলছিলো—'হেল্লেলুযাহ্!'

কয়েক মিনিটেই পুরো প্যাকেট শেষ! আরেকটা প্যাকেট খুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এর ভেতরই আমার পেট ভরে গিয়েছিলো। তাই আর না খাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

এবার লকারের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। এটি বাইরে থেকে যেমন দেখায় ভেতরে তার চেয়ে বড়ো। আমি লকারে পা রেখে আস্তে করে তাতে বসে পড়লাম। 'সেভেন ওসেন' কোম্পানির কার্টনগুলো গুনতে থাকলাম। আমি এক প্যাকেট খেয়েছি—আরও ৩১ প্যাকেট আছে। লেখা তথ্য অনুযায়ী এ বিস্কুট ৫০০ গ্রাম পরিমাণ খেলে একজন লোক তিনদিন চলতে পারবে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমার ৩×৩১=৯৩ দিনের রেশন আছে! আরও লেখা আছে—চব্বিশ ঘণ্টায় একজনের জন্য পানির বরাদ্দ আধা লিটার। আমি পানির ক্যানগুলো গুনতে থাকলাম। ১২৪টি ক্যান আছে। তার মানে ১২৪ দিনের পানি আছে। এমন খুশি হলাম—জীবনে কোনো অঙ্ক বোধহয় আমাকে এতো আনন্দ দেয়নি।

আমার আর কি কি আছে? আমি দ্রুত তল্লাশি চালালাম লকারে এবং একটার পর একটা চমৎকার জিনিস বের করতে লাগলাম। প্রতিটি জিনিসই আমাকে এতো খুশি করেছিলো! আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি কথাই শুধু উচ্চারণ করতে পারছিলাম, "তোমাকে ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!"

৫২

তল্লাশি শেষে আমি পুরো রসদ সামগ্রীর একটি পূর্ণ তালিকা তৈরি করলাম। সেটি দাঁড়ালো এরকম—

- ১৯২টি সমুদ্রপীড়া প্রতিরোধক ট্যাবলেট।
- ১২৪ ক্যান খাবার পানি, প্রতি ক্যানে ৫০০ মি. লি. হিসেবে ৬২ লিটার।
- বমি করার ৩২টি প্লাস্টিক ব্যাগ।
- ৩১ কার্টন জরুরি রসদ, প্রতি কার্টনে ৫০০ গ্রাম হিসেবে ১৫.৫ কিলোগ্রাম।
- ১৬টি উলের কম্বল।
- ১২টি সোলার স্টিল, লবণ পানিকে খাবার পানি বানাবার জন্য।
- ১০টি কমলা রঙের লাইফ জ্যাকেট, প্রতিটির সাথে একটি করে কমলা রঙের বাঁশি।
- ৬টি মরফিন এ্যাম্পুল সিরিঞ্জ।

- ৬টি হাতে ছোঁড়ার উজ্জ্বল আলোক সঙ্কেত।
- ৫টি ভাসমান বৈঠা।
- ৪টি রকেট প্যারাস্যুট ফ্লায়ার।
- ৩টি শক্ত, স্বচ্ছ প্লাস্টিক ব্যাগ, যার প্রতিটিতে ৫০ লিটার বহন করা যায়।
- ৩টি ক্যান্ খোলার চাবি।
- ৩টি দাগকাটা পানপাত্র।
- পানি প্রতিরোধী বাক্সে ২ বাক্সো ম্যাচ।
- ২টি ভাসমান কমলা রঙের ধোঁয়া-সঙ্কেতক।
- ২টি মাঝারি আকারের কমলা রঙের বালতি।
- ২টি প্লাস্টিকের জলসেচনি।
- ২টি প্লাস্টিকের খালি পাত্র, বায়ুরোধক ঢাকনিসহ।
- ২টি হলুদ আয়তকার স্পঞ্জ।
- ২টি কৃত্রিম তন্তুর ভাসমান দড়ি, প্রতিটি ৫০ মিটার লম্বা।
- ২টি অভাসমান কৃত্রিম তন্তুর দড়ি, আনুমানিক প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের বেশি।
- ২টি ফাৎনাসহ মাছ ধরার ছিপ।
- ২টি কোঁচ, এবং অনেকগুলো নানা আকারের তীক্ষ্ণ বড়শি।
- ২টি নোঙর।
- ২টি ছোট কুড়াল।
- ২টি বৃষ্টির পানি ধরার পাত্র।
- ২টি কালো বলপেন।
- ১টি মালপত্র বহনের জাল।
- ১টি পুরু লাইফবয়, যার ভেতর দিকের ব্যাস ৪০ সেন্টিমিটার আর বাইরের দিকের ব্যাস ৮০ সেন্টিমিটার, সংযুক্ত দড়িসহ।
- ১টি শক্ত হাতলের শিকার করার ছোরা, যার একদিকে ধারালো অন্যদিকে করাতের মতো দাঁত।
- ১ সেট সেলাই করার সরঞ্জাম।
- একটি পানিরোধক বাক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম।
- ১টি সঙ্কেত দেয়ার আয়না।
- ১ প্যাকেট চাইনিজ ফিল্টার সিগারেট।
- ১টি বড়ো বার চকোলেট।
- ১টি বেঁচে থাকার তথ্যপঞ্জি।
- ১টি কম্পাস।
- ১টি ৯৮ পাতার রুল করা নোটবই।
- একজন হাল্কা পোশাকের বালক যে তার একটি জুতা হারিয়েছে।
- একটি বুটিদার হায়েনা।
- একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
- একটি জীবনতরী।

- একটি মহাসাগর।
- একজন ঈশ্বর।

আমি চকোলেট বারের এক-চতুর্থাংশ খেয়ে ফেললাম। বৃষ্টির পানি ধরার আয়োজনের একটি আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। এটি অনেকটা ছাতার মতো, যার সাথে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের রবারের নল সংযুক্ত। আমি বয়ায় দু'হাত ভাঁজ করে মাথা গুঁজলাম এবং তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

৫৩

সারা সকাল আমি ঘুমালাম। ঘুম ভাঙলো উদ্বিগ্নতায়। খাদ্য, পানি এবং বিশ্রাম আমার ক্লান্ত, দুর্বল শরীরে শক্তি সঞ্চার করলো। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু ও শক্তি ফিরে পেলো। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে নিজের বর্তমান অবস্থা আমার মোটেও সুবিধার মনে হলো না। রিচার্ড পার্কার এক জলজ্যান্ত বাস্তবতা। ভাবা যায় একটি বাঘের সাথে একই নৌকায় বাস করছি?

বাঘের ভয়ে একবার মনে হলো দেই ঝাঁপ সমুদ্রে। কিন্তু হাঙরগুলো কি আমাকে ছেড়ে কথা বলবে? তীর কতো দূরে, কতো শত মাইল? এতোদূর সাঁতরাতে পারবো? কি খাব? কি পান করবো? কোনদিকে সাঁতরালে কূলের দেখা পাবো তাও তো জানি না। অগত্যা ও চিন্তা বাদ দিলাম। কিন্তু নৌকাতেই বা টিকবো কী করে? সে শিকারি বিড়ালের মতো চুপি চুপি এসে আমার পিছন থেকে যদি ঘাড় মটকে দেয়? অথবা থাবায় ক্ষত-বিক্ষত করে?

কাঁপা গলায় ফ্যাস ফ্যাস করে বললাম, "আমি মরে যাচ্ছি।" এক বীভৎস করুণ মুহূর্ত ছবি ভাসতে থাকলো আমার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এমন অবস্থায় মা, বাবা, রবি, আরু, উইনিপেগের চিন্তা আমাকে আরও বিধ্বস্ত করলো।

আমি হয়তো দুশ্চিন্তাতেই মরে যেতাম। কিন্তু আমার ভেতর জেগে উঠলো এক অন্য সত্তা। সে দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করলো, "আমি মরবো না। এ পরিস্থিতিকে যে করেই হোক নিজের অনুকূলে আমাকে আনতেই হবে। ঐন্দ্রজালিকভাবে একবার যখন বেঁচে উঠেছি—তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। আমি মরবো না। আমিন।"

এমন সময় গর্জন করে উঠলো রিচার্ড পার্কার। আমার বুকে চেপে বসলো ভয়।

"জলদি করো", নিজেই যেনো নিজেকে নির্দেশ দিলাম। বেঁচে থাকার পথ আমাকে বের করতেই হবে। এখনই আমাকে নিরাপদে আশ্রয় নিতে হবে। আগের মতো নৌকার সামনে গলুই আর তারপুলিনে বৈঠা ঠেকিয়ে আশ্চর্য সেই আশ্রয়ের কথা ভাবলাম। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়—নৌকার সামনে থেকে তারপুলিন তো আমি গুটিয়ে এনেছি। আর একটি বৈঠায় কূল থাকলেই যে রিচার্ড পার্কারের হাত থেকে বাঁচা যাবে তাও মনে হলো না। সুতরাং আমাকে অন্য কোনো উপায় বের করতেই হবে।

ভাসমান বৈঠা আর লাইফ জ্যাকেটগুলো দিয়ে ভেলা বানালে কেমন হয়? খুব সাবধানে লকার বন্ধ করলাম এবং তারপুলিনের তলা দিয়ে পাশের বেঞ্চে রাখা বৈঠাগুলো আনতে গেলাম। রিচার্ড পার্কার দেখলো। লাইফ জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ভাবতেও পারবেন না কতো সাবধানে আমি বৈঠাগুলো টেনে নিয়েছিলাম। বাঘটা চোখ ছোট করে তাকালো, কিন্তু নড়াচড়া করলো না। আমি তিনটি বৈঠা টেনে নিলাম। আরেকটা তো তারপুলিনের ওপর আড়াআড়ি রাখা আছেই। আমি লকারের ঢাকনি টেনে রিচার্ড পার্কারের গুহাটাকে আড়াল করলাম।

আমি এখন চারটি ভাসমান বৈঠাকে তারপুলিনের ওপর দিয়ে বয়ার চারপাশে এমনভাবে গাঁথছিলাম যে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি হলো। বয়াটা 'O' অক্ষরের মতো থাকলো মাঝখানে।

এবার মারাত্মক কাজটায় হাত দিলাম। লাইফ জ্যাকেটগুলো আনতে হবে। রিচার্ড পার্কারের গর্জনের তেজ এখন বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছিলো। হায়েনাটা 'কিউ কিউ' করে কেঁদে উঠলো। ও ভয়ে কাঁপছিলো।

আমার কোন গত্যন্তর ছিলো না। আমাকে আমার পরিকল্পনা মতো কাজ করতেই হবে। লকারের ঢাকনাটা আবার নিচু করলাম। লাইফ জ্যাকেটগুলো এবার হাতের নাগালের মধ্যেই। কয়েকটা আবার রিচার্ড পার্কারের উল্টোদিকে। হায়েনাটা কেঁপে কেঁপে গর্জন করছিলো।

সবচেয়ে কাছের লাইফ জ্যাকেটটায় হাত দিলাম। আমার হাত রীতিমতো কাঁপছিলো। আমি জ্যাকেটটা টেনে নিয়ে এলাম। রিচার্ড পার্কার কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। তারপর আরেকটা আনলাম। তারপর আর একটা। ভয়ে উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। মোট চারটি লাইফ জ্যাকেট অত্যন্ত সন্তর্পণে নিয়ে এলাম।

এবার বৈঠাগুলোর সাথে লাইফ জ্যাকেটগুলো জুড়ে দিলাম। ভেলার চারপাশে চারটা লাইফ জ্যাকেট জুড়ে বেঁধে দিলাম।

লকার থেকে ভাসমান দড়ি নিয়ে ছুরি দিয়ে ছোট চারটি টুকরা কাটলাম। এবার বৈঠাগুলো যেখানে যেখানে মিলেছে সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। এতে লাইফ জ্যাকেটগুলো চারকোণায় ভালোমতো আটকে গেলো। আমি চারখণ্ড দড়ি কাটলাম। এগুলো দিয়ে বয়াটাকে চারটি বৈঠার সাথে ভালোমতো বাঁধলাম। এবার বয়ার দড়ি দিয়ে লাইফ জ্যাকেটগুলোকে আরেকপ্রস্থ বেঁধে নিলাম। এতে ভেলাটা আরও মজবুত হলো।

হায়েনাটা আরও জোরে জোরে ডাকতে শুরু করলো।

আরেকটা কাজ করতে হবে। "হে ঈশ্বর আমাকে আর একটু সময় দিন।" আমি ভাসমান দড়ির বাকি অংশটুকু নিলাম। নৌকার সামনের গলুইয়ের একেবারে মাথায় একটা বড়ো ছিদ্র আছে। এটায় দড়ি লাগিয়ে সাধারণত ঘাটে নৌকা বাঁধা হয়। এই গর্তে আমি ভাসমান দড়ির একমাথা বেঁধে দিলাম।

হায়েনাটা চুপ করে ছিলো। আমার হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়ে আবার যেনো তিনগুণ দ্রুতলয়ে টিপ টিপ করতে লাগলো। আমি ঘুরলাম।

"যিশু, মা মেরি, মোহাম্মদ (সাঃ) এবং বিষ্ণু!"

আমাকে তখন এমন এক দৃশ্য দেখতে হলো যা জীবনে কোনোদিনই ভুলবো না। রিচার্ড পার্কার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে আমার চেয়ে পনেরো ফুট দূরে নয়। ওহ্ কী তার আকার আর আকৃতি! হায়েনা এবং আমার দিন বুঝি শেষ। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম, অনড়, অবশ। এ ক'দিনের নৌকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দুটি পশুর লড়াই যখন রক্তারক্তিতে গড়ায় তখন কী তর্জন-গর্জন হয়। এক্ষেত্রে তার কিছুই ঘটলো না। হায়েনাটা গর্জন তো দূরের কথা টুঁ শব্দটি করলো না। রিচার্ড পার্কার নিঃশব্দে এটিকে মেরে ফেললো। আতঙ্কগ্রস্ত মাংসাশীটা তারপুলিনের নিচ থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং হায়েনার দিকে এগিয়ে গেলো। যুদ্ধ তো

দূরের কথা হায়েনাটা বরং মেঝেতে শুয়ে পড়লো, শুধু সামনের পা দু'টি প্রতিরক্ষার চেয়ে বেশী
তুললো। এক ভয়ঙ্কর শার্দূলের আগুনের গোলার মতো চোখের দৃষ্টিতে হায়েনাটা ছানাবড়া হয়ে
গেলো। এক প্রচণ্ড থাবা নেমে এলো এর কাঁধ বরাবর। রিচার্ড পার্কারের চোয়ালের দাঁত বসে
গেলো হায়েনার গলায়। ওর চোখ দু'টি ঠিকরে বেরিয়ে এলো যেনো। এক জান্তব শব্দে হায়েনার
মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। শুধু কেঁপে উঠলো একবার হায়েনাটা। ব্যস, এখানের ইহলীলা
সাঙ্গ হলো এর।

রিচার্ড পার্কার আবার গর্জন করে উঠলো। তবে আগের মতো জোরে নয়। সে তার বড়ো
জিভ দিয়ে রক্ত চাটলো। মাথা নাড়লো। অবজ্ঞায় মুখ তুললো মৃত হায়েনাটা থেকে। বাতাসে
ঘ্রাণ নিলো। সামনের পা তুলে পিছনৌকার বেঞ্চে উঠে পড়লো। খোলা সমুদ্রের দিকে
তাকালো। নিচু গলায় খানিক গর্জন করলো। আবার বাতাস শুকলো। আস্তে আস্তে সে তার
মাথা ঘোরালো এবং আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো।

ভয়ে আমার শরীরে সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গেলো।

ঠিক তক্ষুণি কোথেকে উদয় হলো এক ইঁদুর। বাদামী রঙের ইঁদুরটা সম্ভবত ভীষণ ভয়
পেয়ে থাকবে। পাশ বেঞ্চে এটি মরার মতো পড়ে রইলো। রিচার্ড পার্কারও আমার মতো বিস্ময়ে
দেখলো। ইঁদুরটি তারপুলিনে পড়ে গেলো এবং আমার দিকে ছুটে এলো। এটাকে এভাবে
আসতে দেখে ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমার হাঁটু কেঁপে উঠলো এবং আমি পড়ে গেলাম। এটি
আমার তৈরি করা ভেলার ওপর দিয়ে এসে একেবারে আমার মাথায় চড়ে বসলো।

রিচার্ড পার্কারের চোখও ইঁদুরটাকে অনুসরণ করছিলো। ওর চোখদুটি এখন আমার মাথার
ওপর স্থির হলো।

বাঘটি এক চক্কর মাথাটি ঘোরালো। পাশের বেঞ্চে সামনের পা তুলে উঠতে গিয়ে সে পড়ে
গেলো নৌকার খোলে। আমি তার প্রকাণ্ড মাথার পেছন দিকটা দেখলাম, খাড়া কান দুটো
দেখলাম এবং ইয়া বড়ো লেজটা দেখলাম।

সে এখন আমার কাছ থেকে দশ ফুটেরও কম দূরে। ওহ্ কী ভয়ঙ্কর দর্শন প্রাণী! সে
তারপুলিন থেকে লাফ দেয়ার চেষ্টা করলো। আমি তখন মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

কিন্তু তারপুলিনের অদ্ভুত নমনীয়তা তাকে বিব্রত করলো। সে তারপুলিনে চাপ দিলো। সে
বিরক্ত হয়ে তাকালো। মনে এতো আলো আর উজ্জ্বলতা তার পছন্দ হচ্ছে না। এবং নৌকার
দুলুনি তাকে মোটেও স্থির থাকতে দিচ্ছিলো না। তাকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো।

আমি ইঁদুরটাকে ধরে তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। এখনও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই
কিভাবে ইঁদুরটা শূন্যে উড়ে গিয়েছিলো আর বাঘটা বিরাট হা করে এটাকে গিলে নিয়েছিলো।
যেন ক্যাচার তার গ্লোভসে বেস বল ধরলো। ইঁদুরের লম্বা লেজ স্পাগেটির নুডুলসের মতো হয়ে
করে বাঘের মুখে অদৃশ্য হলো।

মনে হলো আমার এ উপহার তাকে সন্তুষ্ট করলো। সে পিছিয়ে আবার তারপুলিনের তলায়
আশ্রয় নিলো। আমার পা আবার সচল হলো। আমি এক ধাপ এগিয়ে লকারে ঢাকনা তুলে
তারপুলিন এবং সামনের বেঞ্চটার আড়াল তৈরি করলাম।

আমি একটা শরীর টেনে আনার শব্দ শুনতে পেলাম। নৌকাটা দুলে উঠলো। বাঘ
হায়েনাটাকে চিবিয়ে খেতে শুরু করলো—আমি চিবানোর শব্দ পেলাম। তারপুলিনের নিচে উঁকি
দিলাম। নৌকার মাঝামাঝি সে হায়েনাটাকে খাচ্ছে। এ সুযোগ আর নাও আসতে পারে। দ্রুত

দ্রুত বাকি ছয়টা লাইফ জ্যাকেট নিয়ে এলাম। বাকি বৈঠাটাও আনলাম। এগুলো দিয়ে আমার
ভেলাটাকে আরও নিরাপদ করা যাবে। একটা গন্ধ নাকে এলো। এটা বিড়ালের পেশাবের গন্ধ নয়।
বমির গন্ধ। নৌকার খোলে বমি দেখতেও পেলাম। রিচার্ড পার্কার তাহলে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত!

আমি লম্বা দড়িটা ভেলার সাথে বেঁধে দিলাম। ভেলার প্রত্যেক কোণায় আরও একটা করে
লাইফ জ্যাকেট বাঁধলাম। আরেকটা লাইফ জ্যাকেট বয়ার মাঝখানে বেঁধে আমার আসন
বানালাম। বাকি বৈঠাটা আমি পাদানি হিসেবে জুড়ে দিলাম। বাকি লাইফ জ্যাকেটটা এটার
সাথে বেঁধে নিলাম। আমার আঙুল কাঁপছিলো। আমি সব বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলাম।

সমুদ্রের দিকে তাকালাম। বিশাল, নিপাট নীল। ঢেউয়ের চিহ্নও নেই। হাল্কা বাতাস
বইছিলো। নিচে তাকালাম। নানা রকম মাছ এবং দেখলাম এর মধ্যে হাঙরও আছে।

আমি ভেলাটাকে পানিতে ভাসালাম। কি কারণে জানি না, এটি ভাসলো না। শোকে যেন
পাথর হলাম। আসলে লাইফ জ্যাকেট শুধু বয়া এবং বৈঠাগুলোকে ডুবুডুবু করে ভাসিয়ে
রাখলো। আমার মন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। এটি পানিতে নামাতেই মাছগুলো পালালো—
শুধু হাঙরগুলো নড়লো না। তিন-চারটা হাঙর ছিলো। একটাতো নৌকার তলায় আশ্রয় নিলো!
রিচার্ড পার্কার গর্জন করে উঠলো।

জলদস্যুরা যেমন তক্তা দিয়ে গুঁতো দিয়ে বন্দীদের সমুদ্রে ফেলে দেয় আমার সেই বন্দীর
দশা যেন!

আমি ভেলাটাকে নৌকার কাছে টেনে নিয়ে এলাম। হতাশ, বিমূঢ় আমি গভীর কালচে নীর
জলে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম। আবার গর্জে উঠলো রিচার্ড পার্কার। ভেলায় উঠে টান টান
শুয়ে পড়লাম। আঙুলও নাড়ালাম না। মনে হচ্ছিলো ভেলাটা যে কোনো সময় তলিয়ে যাবে।
ঐ বুঝি বয়ার ফুটো দিয়ে হাঙর এসে ধরলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। ভেলাটা একটু তলিয়ে
গেলো, দুলতে থাকলো। বৈঠাগুলোও পানিতে তলিয়ে গেলো। কিন্তু ডুবুডুবু হয়ে এটি আমাকে
ভাসিয়ে রাখলো। হাঙরগুলো কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করলো—কিন্তু আমাকে ছুঁলো না।

ভেলাটা ঘুরে ঘুরে দুলতে থাকলো। মাথা তুললাম। ভেলায় বাঁধা দড়িতে এখন জীবনতরী
আমার চেয়ে চল্লিশ ফুট দূরে। দড়িটা দেখা যাচ্ছিলো না। এক বিরাট শূন্যতা আর বিচ্ছিন্নতা
আমাকে গ্রাস করলো। যে জীবন বাঁচাতে নৌকা থেকে পালিয়েছি, সেই জীবন বাঁচাতেই আবার
নৌকায় ফিরে যেতে চাইলাম। ভেলার তুলনায় তখন আমার নৌকাটাকে স্বর্গ মনে হলো।

দড়ি টেনে টেনে নৌকার দিকে এগুতে থাকলাম। যতোই নৌকার কাছাকাছি হচ্ছি ততোই
আমার টানার গতি কমে যাচ্ছে। নৌকার একদম কাছে এসে শুনতে পেলাম রিচার্ড পার্কার
তখনও হায়েনার মাংস খাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ভাবলাম। ভেলাতেই থাকলাম। আসলে কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।
আমার বিকল্প খুবই সীমিত—হয় বাঘ, না হয় হাঙর। রিচার্ড পার্কার কতো ভয়ঙ্কর তা জানা
হয়ে গেছে। কিন্তু হাঙরের এখনও কোন আক্রমণ আমি প্রত্যক্ষ করিনি। হাতের দড়ি ঢিলে
হলো। নৌকা থেকে মোটামুটি ত্রিশ ফুট এসে ভেলা থামালাম। ভাবলাম নৌকা থেকে খুব দূরেও
যাওয়া যাবে না, আবার নৌকার একদম কাছে রিচার্ড পার্কারের নাগালের মধ্যেও যাওয়া যাবে
না। বাকি দশ ফুট দড়ি আমি পায়ের কাছের বৈঠায় গুটিয়ে রাখলাম।

দিনটা শেষ হয়ে আসছিলো। বৃষ্টি শুরু হলো। সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিলো এবং
ভ্যাপসা গরম ছিলো। এখন আবার তাপমাত্রা নেমে গেলো। চারদিকে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা

পড়ছে। আমি আবার দড়ি টেনে নৌকার কাছে গেলাম। নৌকার সামনে গিয়ে হাত দিয়ে নৌকার গলুই ধরে রাখলাম। সাবধানে নৌকায় উঠে উঁকি দিলাম। তাকে দেখা গেলো না।

আমি দ্রুত লকারের কাছে গেলাম। একটি বৃষ্টি ধরার আধার ৫০ লিটার ধারণক্ষমতার প্লাস্টিকের একটি ব্যাগ এবং টিকে থাকার তথ্যপঞ্জিটা নিলাম। আমি লকারটা বন্ধ করতে গিয়ে তাড়াহুড়ায় ঘটালাম এক বিপত্তি। আমার ভিজা হাত থেকে পিছলে গেলো লকারের ঢাকনা। তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে আমি ভীষণভাবে গর্জন করে রিচার্ড পার্কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে হায়েনার মাংস চিবাচ্ছিলো। সাথে সাথে তার মাথা ঘোরালো সে। অনেক প্রাণীই খাবার সময় বিরক্ত করা পছন্দ করে না। রিচার্ড পার্কার গর্জে উঠলো। তার থাবা আবার তৎপর হলো। লেজ নাড়তে লাগলো। আমি ভেলায় ফিরে গেলাম। বাতাস এবং স্রোত ভেলাটাকে দ্রুত দূরে সরিয়ে আনলো। আমি পুরো দড়ি ছেড়ে দিলাম। ভয় আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছিলো—ঐ বুঝি রিচার্ড পার্কার এলো।

কিন্তু তাকে দেখা গেলো না।

বৃষ্টি-আধারটাকে মাথার ওপর মেলে ধরলাম। প্লাস্টিক ব্যাগটা পায়ের কাছে রাখলাম। ভয়ে আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপছিলো। ভেলায় নামার সময় সঙ্গে আনা কম্বলটাও ভিজে গিয়েছিলো। এটি গায়ে জড়িয়ে আমার কোনো লাভ হলো না।

রাত নামলো। আমার চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু দড়িটাই নৌকার সাথে আমাকে যুক্ত করে রেখেছিলো। আমার তলায় সমুদ্র। তার পানিতে ভিজে আছে আমার পশ্চাৎদেশ।

৫৪

সারারাত বৃষ্টি হলো। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। ঘুমের তো প্রশ্নই ওঠে না—স্নায়ুতে টান টান উত্তেজনা। বৃষ্টি আর বাতাসের জোরালো শব্দ। বৃষ্টির পানি ধরার পাত্রে মনে হচ্ছে বৃষ্টির পানি ড্রাম পিটাচ্ছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে মনে হচ্ছে হাজার হাজার ক্রুদ্ধ সাপ তাদের গর্তে হিস হিস করছে। বাতাসের গতির পরিবর্তন হলো। বৃষ্টির ধারাও বাতাসের সাথে গতি বদলালো। এতে একটা সুবিধা হলো—আমি আমার শরীরের একটা অংশ শুকিয়ে নেয়ার সুযোগ পেলাম। আমি আমার বুকের কাছে বেঁচে থাকার তথ্যপঞ্জিটা চেপে ধরে রাখলাম। পুরোটা রাত আমাকে শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে হলো। ভেলা ভেসে যাবে না তো? অন্ধদের ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়ার মতো দ্রুত হাতে ভেলার বাঁধনগুলো হাতিয়ে হাতিয়ে পরীক্ষা করলাম।

বৃষ্টির গতি আরও বেড়ে গেলো। সমুদ্র হলো আরও উত্তাল। ভেলাটা বলা চলে বাতাসের ঝাঁকি খাচ্ছিলো। তবু এটা ভেসে থাকলো। পানি খেলাম। খেতে বাধ্য হলাম। বৃষ্টি ধরার পাত্র ভরে গিয়েছিলো। ফেলে না দিয়ে যতদূর সম্ভব খেয়ে নিলাম। প্রথম প্রথম পানিটা রবারের গন্ধযুক্ত লাগছিলো। পরে গা-সওয়া হয়ে গেলো।

এই দীর্ঘ, ঠাণ্ডা, অন্ধকার সময়ে আমি যতোটা না ভাবছিলাম উত্তাল সমুদ্র আর প্রবল বর্ষণের কথা তার চেয়ে বেশি ভাবছিলাম রিচার্ড পার্কারের কথা। একের পর এক ফন্দি আঁটতে লাগলাম কী করে বাঘটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং পুরো নৌকার দখল নেয়া যায়।

ফন্দি নম্বর এক ঃ ধাক্কিয়ে তাকে ফেলে দেয়া। কিন্তু এতে কী এমন ভালো ফল পাওয়া যাবে? না হয় ধরেই নিলাম ৪৫০ পাউন্ড ওজনের বাঘটাকে ধাক্কিয়ে ফেলা গেলো, তারপর? বাঘেরা খুব ভালো সাঁতারু। সুন্দরবনের প্রবল স্রোতের মধ্যে এদের নাকি কখনও কখনও পাঁচ কিলোমিটারও সাঁতরাতে দেখা যায়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—ধাক্কিয়ে ফেলে দিলেও সাঁতরে আবার নৌকায় উঠে প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর।

ফন্দি নম্বর দুই ঃ ৬টি মরফিন সিরিঞ্জ দিয়ে তাকে হত্যা করা। কিন্তু এগুলো একটি বাঘের শরীরে কী প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিলো না। তাকে মেরে ফেলার জন্য কি এ পরিমাণ মরফিন যথেষ্ট? তাছাড়া রিচার্ড পার্কারের শরীরে এগুলো কীভাবে পুশ করতে হবে তাও আমার জানা ছিলো না। তার মাকে অজ্ঞান করে ধরার ঘটনা আমাকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করলো। কিন্তু তার মাকে তো অজ্ঞান করার জন্য একটা তীর ছোঁড়া হয়েছিলো—আর এ যে ৬ সিরিঞ্জ পুশ করার ঝক্কি! অসম্ভব! শরীরে সুঁই ফুটানোর আগেই ওর এক থাবা আমার ইহলীলা সাঙ্গ করতে যথেষ্ট। সুতরাং এ ফন্দিও বাতিল।

ফন্দি নম্বর তিন ঃ যা যা অস্ত্র আছে তা নিয়ে একে আক্রমণ করা। আকাশ কুসুম কল্পনা। কল্পনাকাহিনীতে সম্ভব হলেও বাস্তবে অসম্ভব। তাছাড়া আমি টারজান নই। তার মুখে রকেট ফ্লেয়ার ছুঁড়বো? দুই হাতে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করবো? কিন্তু যদি ফসকে যায়, আর সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে? তাহলে রিচার্ড পার্কার আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ টেনে টেনে ছিঁড়বে। তাহলে এটাও বাদ।

ফন্দি নম্বর চার ঃ ফাঁসি দেয়া। আমার কাছে একটি দড়ি আছে। আমি যদি নৌকার সামনে বসে নৌকার পিছনের অংশে দড়ি বেঁধে রেখে একটি ফাঁস কোনোরকমে ওর গলায় পরিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওর শ্বাস বন্ধ করতে পারতাম! কিন্তু ওর গলায় ফাঁস পরাতে পারলেও বাঘটা তো দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টানে আমাকেই ওর কাছে হাজির করে ঘাড় মটকে দেবে। আত্মঘাতী বুদ্ধি আর কাকে বলে!

ফন্দি নম্বর পাঁচ ঃ বিষ প্রয়োগ, গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করা। কিন্তু কীভাবে? কি দিয়ে?

ফন্দি নম্বর ছয় ঃ শত্রুর শক্তি ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে টিকে থাকা। সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকবো। বেঁচে থাকার উপায়, উপকরণ এবং রসদ নিশ্চয় তার আমার চেয়ে বেশি নেই! আর পানি? কোন প্রাণীই পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না।

ফন্দিটা মনে ধরে গেলো। নিঃসীম অন্ধকারে ফন্দিটা আমার ভেতর মোমের আলো জ্বালো। আমি এর মধ্যেই একটি পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছি। ভেলা বানিয়ে টিকে থেকেছি। আমাকে কেবল টিকে থাকতে হবে। তাহলেই জয় আমার অবশ্যম্ভাবী।

৫৫

ভোরের আলো ফুটতেই টের পেলাম কী ধকল গেছে সারারাত আমার ওপর দিয়ে। পাহাড় সমান ঢেউ আর বৃষ্টির তোড়ে আমার বিধ্বস্ত অবস্থা নিজের চোখে না দেখলেই বোধহয় ভালো ছিলো।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই থেমে গেলো বৃষ্টি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো। সেইসাথে এক জাদুমন্ত্রবলে যেনো উধাও হয়ে গেলো রাক্ষুসী ঢেউগুলোও। এ যেন সাগরের অন্য চেহারা। সমুদ্রের উর্মিমালায় লাখ লাখ আয়নায় আলোর বর্ণালি ছড়িয়ে উদয় হলো সূর্য।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অবসন্ন আমি এখনও বেঁচে আছি—এটাই ছিলো ঐ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা। 'ফন্দি নম্বর ছয়, ফন্দি নম্বর ছয়, ফন্দি নম্বর ছয়'—মনে মনে শুধু এ কথাগুলোই জপে যাচ্ছিলাম। আর আশ্চর্যজনকভাবে এটা আমার ভেতর এক দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দিচ্ছিলো। জপে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু 'ফন্দি নম্বর ছয়' যে কী—ঐ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছিলো না। সারা গায়ে কম্বলটা পেঁচিয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকলাম। একদিকে কাত হয়ে। এমনভাবে শুলাম যাতে পানির ছোঁয়া না লাগে। এরপর ঘুমিয়ে গেলাম। কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। মধ্যসকালে ঘুম ভাঙলো। এখন আবহাওয়া অনেকটা গরম। কম্বলটা প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিলো। কনুইতে ভর করে বসলাম।

আমার চারদিকে অসীম নিপাট সমুদ্র। আকাশে অন্তহীন নীলের কারুকাজ। জীবনহরীর দিকে তাকালাম। এটার অবস্থা এ বিশাল সমুদ্রে আখরোটের অর্ধেক আচা'র চেয়ে মোটেও বেশি কিছু নয়।

আমি আমার ফেলে আসা সঙ্গীকে দেখতে পেলাম। সে নৌকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় হলে কতো কাব্যকথাই না বলা যেতো। এ প্রশান্ত মহাসাগরে কমলা ভেলভেট চামড়ার কোট, কালো ডোরায় যা আরও জীবন্ত আরও আকর্ষণীয়—কী যে এক পুলক জাগানিয়া দৃশ্য! আমার রোমাঞ্চ থেমে গেলো। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে চরম বিপদগ্রস্ত আমরা। আমার আর রিচার্ড পার্কারের মাঝেও যেনো এখন এক প্রশান্ত মহাসাগরের দূরত্ব।

'ফন্দি নম্বর ছয়, ফন্দি নম্বর ছয়' জপতে থাকলাম। কিন্তু সেটা কী? ভাবতে ভাবতে এক সময় বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ে গেলো—শত্রুর শক্তি ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে টিকে থাকা।

ভাবতে ভাবতে একসময় আমার মনে হলো—"কী বুদ্ধু আমি! ফন্দি নম্বর ছয় হচ্ছে সবচেয়ে বাজে। এ মুহূর্তে রিচার্ড পার্কার শুধু সমুদ্রকে ভয় পাচ্ছে বলে। কিন্তু প্রচণ্ড পিপাসা একসময় এটি আমার মতোই সাহসী হয়ে উঠবে। এটি তখন লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে ভেলায় এসে সব খাবার দখল করবে। আর কে না জানে সুন্দরবনের বাঘ নোনাজল খায়? তাই বলছি—ফন্দি নম্বর ছয় তোমার চরম সর্বনাশই ডেকে আনবে। বুঝেছো বুদ্ধু!"

৫৬

এখন ভয় সম্বন্ধে একটি কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে। জীবনের সত্যিকারের প্রতিপক্ষ হচ্ছে ভয়। আমি এখন এটা ভালো করেই জানি যে এটি এক চতুর, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অভিশাপ এর কোনো শোভন দিক নেই, এটি কোনো আইন বা প্রথা মানে না এবং এ কখনও কাউকে ক্ষমা করে না। এটি শুধু আপনার দুর্বলতা খুঁজবে। যদি একবার এটি কোনোমতে আপনার কোনো দুর্বলতার সন্ধান পায় তাহলে আর আপনার কোনো রক্ষা নেই। সন্দেহের ছদ্মবেশে এটি

আপনার ভেতর প্রবেশ করবে। সন্দেহের সাথে যোগ হবে অবিশ্বাস। বাস তারপর আপনাকে কুরে কুরে খাবে ভয়।

আপনার মন থেকে তখন এটি প্রবেশ করবে আপনার শরীরে। আপনার ফুসফুসের বায়ু শক্তি হয়ে উবে যাবে, সাপের শীতল ছোঁয়ায় এ আপনাকে স্থবির করে দেবে। আপনার জিভ অসাড় হয়ে যাবে, সে আর কোনো সত্য উচ্চারণ করতে পারবে না। এক সময় আপনার শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আপনার কথা শুনবে না।

আপনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। এবং আপনার শেষ ভরসা—বিশ্বাস এবং আশাকে আপনি অচিরেই খোয়াবেন। আর এতে নিশ্চিত হবে আপনার পরাজয়।

ভয় আপনার বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেয়। সুতরাং আপনাকে টিকে থাকতে হলে ভয়কে জয় করতেই হবে।

৫৭

অবশেষে রিচার্ড পার্কারই আমার মনে প্রশান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিলো। ভাবা যায়? কী নির্মম পরিহাস—তাই না? যার ভয়ে আমি ভেলা বানিয়ে জলে বাস করছি সে-ই কিনা আমাকে আশার পথ দেখালো!

গভীর মনোযোগ দিয়ে সে আমাকে দেখছিলো। এক সময়ে আমি তার মনের কথা বুঝতে পারলাম। আমরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে যখন এককাপ চা কিংবা কফি পান করে তৃপ্তিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি—ওর তাকানোটা ছিলো অনেকটা তেমনই। একটা হায়েনার মাংসে উদরপূর্তি করে আমেজে ঢেকুর তুলে সে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। সে তার কান নাড়ছিলো। আয়েশে মাথা নাড়াচ্ছিলো। ওর এখনকার সব আচরণ বাঘের নয় বরং বড়ো বেড়ালের। ও যেন এখন এক সুন্দর, বড়ো, ৪৫০ পাউন্ড ওজনের বিড়াল।

ও একটি শব্দ করলো, শব্দটি ও নাক দিয়ে করলো। আমি কান খাড়া করলাম। দ্বিতীয়বারের মতো ও শব্দটি করলো। আমি বিস্মিত হলাম। *প্রাসটেন?*

বাঘেরা অনেক ধরনের শব্দ করে। চিড়িয়াখানার অভিজ্ঞতা আমাকে ওর শব্দের অর্থ করতে সাহায্য করলো। ওরা যখন খুব রেগে যায় তখন এক রকম গর্জন করে, যখন বিরক্ত হয় তখন এক রকম শব্দ করে। মিলন ঋতুতে যৌন মিলনের জন্য সাথীকে ডাকে এক বিশেষ ধরনের গর্জন করে। এমনকি পোষা বেড়ালের মতো ওরা 'মিয়াও' শব্দ করে, যদিও এর শব্দ পোষা বেড়ালের চেয়ে অনেক জোরালো।

জাহাজডুবির পর বাঘের অনেক রকমের গর্জনই শুনেছি। *'প্রাসটেন'* বোধহয় এই প্রথম শুনলাম। আমি এর অর্থ বুঝতাম না, যদি না বাবা আমাকে এগুলো সম্পর্কে বলতেন। বাবা এগুলো প্রাণিবিদ্যার নানা জার্নাল পড়ে পড়ে শিখেছিলেন। তার ওপর চিড়িয়াখানার অভিজ্ঞতা তো ছিলোই। বাবাও এ ডাকটা জীবনে একবারই শুনেছিলেন। মহিশূর চিড়িয়াখানার পশু হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় এক তরুণ পুরুষ বাঘের নিউমোনিয়ার চিকিৎসা চলছিলো। *'প্রাসটেন'* হচ্ছে বাঘেদের সবচেয়ে কোমল ডাক।

রিচার্ড পার্কার আবার 'প্রাসটেন' ডেকে উঠলো। এবার সে ডাক দিলো মাথাটা চক্রাকারে ঘুরিয়ে। তার তাকানোর যা অর্থ করলাম তাতে সে যেন আমাকে কি জিজ্ঞেস করছে।

ভয় এবং বিস্ময়ে আমি তার দিকে তাকালাম। তার ভেতর তাৎক্ষণিক কোন হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। ভয় কেটে গিয়ে আমার ভেতরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজ করতে শুরু করলো।

তাকে পোষ মানাতে হবে। ঐ মুহূর্তে তাকে পোষ মানানোর প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করলাম। এটা তার বা আমার প্রয়োজন নয়। বরং দু'জনের প্রয়োজনেই জরুরি। তাকে পোষ মানাতে পারলে যদি কখনও সেই চরম দুঃখের সময় আসে—তাকে আগে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারবো।

এর পিছনে আরও কারণ আছে। আমি আপনাকে একটি গোপন কথা বলে রাখছি—আমার হৃদয়ে রিচার্ড পার্কারের জন্য একটা নরম জায়গা আছে। আমি কখনও চাইনি রিচার্ড পার্কার মারা যাক। কারণ তাহলে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবো।

দিগন্তের চারদিকে চোখ বুলালাম। আমি নিচে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সমুদ্র কি রিচার্ড পার্কারের আমার কথামতো চলার একটি শর্ত হতে পারে না? গলায় ঝুলানো বাঁশিটির কথা মনে পড়ে গেলো। এটা কি সার্কাসের সেই সিংহের পরিচারকের চাবুকের কাজ করতে পারে না? রিচার্ড পার্কারকে পোষ মানানোর মতো কী নেই এখানে? আমি কি একজন চিড়িয়াখানা পরিচালকের সন্তান নই? তার পুরস্কার কি পাবো না? আমি রিচার্ড পার্কারের দিকে তাকালাম। আমার ভয় কেটে গিয়েছিলো।

বেজে উঠুক বিউগল। বাজুক দামামা। শুরু হোক নতুন যাত্রাপালা—নতুন যুদ্ধ। যে পালা দেখার জন্য সারাজীবন হয়তো প্রতীক্ষা করেছেন—'দি গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' তবে শুরু হোক। ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ, ছোটো বাচ্চারা, এটা আমার জন্য এক অনন্য আনন্দের এবং এই পালা আপনারা দেখছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। শুরু হোক তবে—"দি পাই প্যাটেল, ইন্ডো-কানাডিয়ান, ট্রান্স-প্যাসিফিক, ফ্লোটিং সারকাকাকাকা-সসসসসসসসসস!!! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই!"

আমার বাঁশি বাজানোতে কাজ হলো। প্রথম বাঁশি শুনেই সে নতমস্তকে ডেকে উঠলো। যদি সাহস থাকে তো সে এখন পানিতে ঝাঁপ দিক।

"ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই!"

সে গর্জন করে উঠলো এবং শুনে নখ ঘোরালো। কিন্তু সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো না। যখন সে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর ছিলো তখন হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও ভয় করতো না। কিন্তু এখন সে ভয় করছে। সুতরাং আমি আমার বিশ্বাসে আস্থা রাখতে পারি।

"ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই! ট্রিইইইইই!"

সে পিছু হটে গেলো এবং নৌকার খোলে আশ্রয় নিলো। প্রশিক্ষণের প্রথম ছবক এখানেই শেষ হলো। এ পর্বটা আশা জাগানিয়া সফল। আমি বাঁশি বাজানো বন্ধ করলাম এবং সফলতার উত্তেজনায় বসে পড়লাম ভেলায়। বুক পরিষ্কার করে এক দীর্ঘশ্বাস বেরুলো নাক দিয়ে।

এবং এভাবেই আবিষ্কৃত হলো :

বন্দি নম্বর ছয় ঃ তাকে বাঁচিয়ে রাখা।

৫৮

বেঁচে থাকার তথ্যপঞ্জিটা টেনে বের করলাম। এখনও এর পাতাগুলো ভেজা। যাতে ছিঁড়ে না যায়, খুব সাবধানে এর পাতা ওল্টালাম। তথ্যপঞ্জিটি রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এক কমান্ডারের লেখা। এতে জাহাজডুবির পর সমুদ্রে টিকে থাকার জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন—

- তথ্যপঞ্জিটা সবসময় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
- প্রস্রাব পান করা যাবে না। সমুদ্রের পানি পান করা যাবে না। পাখির রক্তও নয়।
- জেলিফিস খাওয়া যাবে না। যে মাছের আক্রমণ করার সূচালো কাঁটা আছে অথবা টিয়ের মতো ঠোঁট আছে অথবা বেলুনের মতো ফুলো পেট আছে সেসব মাছের তা খাওয়া যাবে না।
- মাছের চোখে জোরে আঙুল চেপে ধরে একে অজ্ঞান করা যায়।
- বেঁচে থাকার এ যুদ্ধে শরীরের ভূমিকা যুদ্ধজয়ী বীরের মতো। আহত হলে সাবধানে থাকতে হবে এবং চিকিৎসা করতে হবে। অজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ ডাক্তার অন্যদিকে বিশ্রাম এবং ঘুম হচ্ছে সেরা সেবিকা।
- প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে পাঁচ মিনিট জুতো-মোজা খুলে পায়ে আলো-হাওয়া লাগাতে হবে।
- অহেতুক নড়াচড়া এড়াতে হবে। কিন্তু তাই বলে মস্তিষ্ককে অলস বসিয়ে রাখা যাবে না, তাহলে পস্তাতে হবে। সবসময় বিক্ষিপ্ত চিন্তায় মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখতে হবে। তাস বা এ ধরনের কোনো খেলায় মেতে থাকতে হবে। আঞ্চলিক গান গেয়ে আনন্দে থাকা যায়। দড়ি দিয়ে গেরো অনুশীলন করতে পারলে খুবই ভালো হয়।
- নীল পানির চেয়ে সবুজ পানির গভীরতা কম।
- দূর আকাশে পর্বতের মতো মেঘ দেখলে সাবধান হতে হবে। সবুজ খুঁজতে হবে। পানির নিচে মাটি খুঁজে পেতে নিজের পা-ই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।
- সাঁতার কাটা যাবে না। এতে অযথা শক্তি ক্ষয় হয়। অন্যদিকে একটি জীবনতরী আপনার চেয়ে দ্রুত যেতে সক্ষম। তাছাড়া সমুদ্রের আরও অনেক বিপদের কথা না-ই বা বললাম। বেশি গরম লাগলে কাপড় ভিজিয়ে নিন।
- পোশাকে পেশাব করা যাবে না। এতে সাময়িক উষ্ণতা পাওয়া গেলেও পরিণামে ক্ষতিই বয়ে আনে।
- আড়ালে থাকা উচিত। খোলা আকাশের নিচে বাস ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার চেয়ে দ্রুত মরণ ডেকে আনতে পারে।
- প্রয়োজনের বেশি পানি খাওয়া যাবে না। বেশি তৃষ্ণা লাগলে জামার বোতাম চুষুন।
- কচ্ছপ খুব সহজে ধরা যায় এবং এটি এক চমৎকার খাবার। কচ্ছপের রক্ত খুব ভালো, উপাদেয়, লবণহীন পানীয় এবং পুষ্টিকর। এর মাংসও খুব স্বাদের। কচ্ছপের চর্বি নানা ধরনের কাজে লাগে। এর ডিম খুঁজে পেলে তো কথাই নেই। এর নখ এবং দাঁত থেকে সাবধান থাকতে হবে।

- নীতিকথা আঁকড়ে থাকা ঠিক হবে না। মনে ভয় থাকা ভালো কিন্তু পরাজয় মনস্কতা খারাপ। মানসিক শক্তি এবং উদ্যোগই বেঁচে থাকার উপায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই বেঁচে থাকা যায়। আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।

তথ্যপঞ্জিতে এছাড়াও নেভিগেশন সম্পর্কে কিছু অতি জরুরি তথ্য লেখা আছে। এ তথ্য থেকে জানতে পারলাম পানি থেকে পাঁচ ফুট উপর থেকে যে দিগন্তরেখা দেখা যায় তা মাত্র আড়াই নটিক্যাল মাইলের দূরত্ব।

প্রস্রাব খাওয়া সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ রয়েছে ওটা না থাকলেও চলতো। ছোটবেলায় 'পিসিং' নামের জন্য যাকে স্কুলে এতো গঞ্জনা সইতে হয়েছে সে আর যাই হোক মরে গেলেও জীবনে কোনোদিন প্রস্রাব খাবে না। একটা জিনিস শুধু উল্লেখ করা হয়নি—একটি জীবনতরীতে 'ক' মানের প্রাণীর সাথে 'ঘ' মানের প্রাণীর সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

রিচার্ড পার্কারকে আরেকটি জিনিসে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তা হচ্ছে আমি হচ্ছি তার চেয়েও শক্তিশালী আর ক্ষমতাশালী বাঘ। তার এলাকা নৌকার খোলেই সীমাবদ্ধ। বড়োজোর পিছ নৌকার ভাঙা বেঞ্চ এবং পাশ বেঞ্চ আর এদিকে নৌকার মাঝের বেঞ্চ পর্যন্ত তার সীমানা। আর মাঝবেঞ্চের এদিকে নৌকার সামনের অংশ, তারপুলিন এগুলো আমার সংরক্ষিত এলাকা।

খুব শিগ্‌গিরই আমাকে মাছ ধরা শুরু করতে হবে। সার্কাসের বাঘ বা সিংহ দিনে দশ পাউন্ড মাংস খায়। কিন্তু রিচার্ড পার্কার তো আর সার্কাসের বাঘ নয়!

আরও অনেককিছু করার আছে আমার। প্রথমেই চাই মাথার ওপর আচ্ছাদন। রিচার্ড পার্কার তারপুলিনের তলায় ছিলো বলে রোদে পুড়তে হয়নি, বৃষ্টিতে ভিজতে হয়নি, উথাল-পাথাল সমুদ্র দেখতে হয়নি। যার জন্য তুলনামূলকভাবে ও অনেক সুস্থ।

ভেলার সাথে আরও একটা বাঁধতে হবে, কোনো কারণে যদি একটি দড়ি ছিঁড়ে যায়, তাহলে অন্য দড়িতে এটি যেন নৌকার সাথে যুক্ত থাকে। এ ধরনের আরও অনেক জরুরি কাজ সারতে হবে দ্রুত।

কোনো জাহাজ এসে আমাকে উদ্ধার করবে—এ ধরনের আশা ত্যাগ করতে হবে। নিজের উদ্ধারের জন্য নিজেকে এখন থেকেই কাজে লাগতে হবে।

দিগন্তে তাকালাম। শুধু পানি আর পানি। আর এখানে আমি একা। একদম একা।

আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। ভাঁজ করা দু'হাতের মাঝে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাস্তবিকই আমার অবস্থা একেবারেই নৈরাশ্যময়।

৫৯

ক্ষুধা লেগেছিলো। পিপাসাও। দড়ি ধরে টানলাম। আবার ছেড়ে দিতেই ভেলাটা নৌকাটা থেকে দূরে যেতে থাকলো। সুতরাং বোঝা গেলো বাতাস এবং ঢেউয়ে নৌকাটা ভেলার চেয়ে দ্রুত চলছিলো। আমার ভাবনার বেশিরভাগ জুড়েই তখনো রিচার্ড পার্কার। ওকে কিভাবে সামলাবো সে চিন্তাই করছিলাম সবসময়।

তাকে খুঁজতেই তারপুলিনের নিচে তাকে দেখলাম।

দড়ি ধরে টানতে থাকলাম যতোক্ষণ না নৌকার সামনের গলুইতে ভেলাটা লাগে। আমি নৌকার মাথাকাঠে পৌছলাম। লকারের দিকে যাবো এমন সময় একটি ব্যাপার আমার নজর কাড়লো—সামনে অনেক ঢেউ। ভেলাটা নৌকার উল্টোদিকে ছিলো আর নৌকাটা দিক পরিবর্তন করলো। ভেলাটা থাকায় নৌকার দুলুনি কমেছিলো অনেকখানি। যা আমার আর রিচার্ড পার্কারের জন্য ছিলো অনেকটা স্বস্তিদায়ক।

ভেলা থেকে লাফিয়ে নৌকায় উঠছি—অমনি আমার সামনে নৌকা থেকে উড়ে এসে সামনের পানিতে পড়লো একটি তেলাপোকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এটিকে ঘপ করে গিলে খেলো একটি মাছ। এরপর আর একটি তেলাপোকা পানিতে পড়লো। এটিকেও খেয়ে ফেললো একটি মাছ। এক মিনিটে প্রায় দশটি তেলাপোকা নৌকায় পড়লো আর এর প্রতিটিকেই খেয়ে নিলো মাছ।

নৌকায় যেনো এগুলো টিকতে পারছিলো না, তাই নৌকা থেকে পালাচ্ছিলো। দাঁড়িয়ে দেখলাম এদের নৌকা ছেড়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মাছের খাদ্যে পরিণত হওয়া।

এখন নৌকায় আমরা দু'জন। মাত্র পাঁচদিনে ওরাং-ওটাং, জেব্রা, হায়েনা, ইঁদুর, মাছি, তেলাপোকা শেষ। আমি আর রিচার্ড পার্কার ছাড়া বোধহয় এখন এ নৌকায় জীবিত বলতে কিছু গণ্ডকৃমি আর ব্যাকটেরিয়াই অবশিষ্ট আছে।

আমার মনে শান্তি ছিলো না। চুপিচুপি উঠে পড়লাম নৌকায় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করে লকারের ঢাকনা খুললাম। রিচার্ড পার্কারকে এড়াতে ইচ্ছে করেই তারপুলিনের দিকে তাকালাম না।

একটি ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগলো। প্রস্রাবের গন্ধ। চিড়িয়াখানায় বিড়াল গোত্রের সব প্রাণীর খাঁচার সামনেই এ গন্ধটি পাওয়া যায়। বাঘেরা খুব এলাকা-সচেতন। আর এরা এদের প্রস্রাব ছিটিয়ে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ করে। আমার জন্য একটা খুশির খবর হচ্ছে বাঘের প্রস্রাবের গন্ধটা আসছে ঠিক তারপুলিনের ওপাশ থেকে। অর্থাৎ তারপুলিনটা বাঘের সীমানায় নয়, আমার সীমানায়। শুধু নৌকার খোলটা বাঘের সীমানা। যাক, তারপুলিনটা পাওয়া গেলে অনেকদিন টেকা যাবে।

নিঃশ্বাস চেপে মাথাটা নিচু করে লকারের কাছে গেলাম। লকারের প্রায় চার ইঞ্চি দূরেই বৃষ্টির পানি। নৌকার খোলের এ বৃষ্টির পানি বাঘটার খুব কাজে লাগছে। যে গরম পড়েছে তাতে এ পানিতে সে গড়াগড়ি খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে পারবে।

আমি আমার কাজে মন দিলাম। জরুরি রসদের একটি কার্টন খুলে ফেললাম এবং একটি প্যাকেটের এক তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেললাম। বৃষ্টির পানির থলিটা গলায় ঝুলানো ছিলো। সেখান থেকে পানি খেতে গিয়েও থামলাম। দাগকাটা পানপাত্রগুলোর কথা মনে পড়লো। বেহিসেবী হলে চলবে না। ইচ্ছেমতো খেলে আমার পানির মজুদ শেষ হতে দেরি লাগবে না। লকার থেকে একটা দাগকাটা পানপাত্র নিলাম। এটি ৫০০ মিলিলিটারের পানপাত্র। এটি একেবারে পরিষ্কার ছিলো না। একটু ময়লাটে এবং ফুটকিমতো দাগ ছিলো এতে। খুব একটা ঘাবড়ালাম না, না হয় আর কিছু ব্যাকটেরিয়া পেটে যাবে।

আমি পানপাত্রের শেষ দাগ পর্যন্ত পানি ভরলাম এবং সাথে সাথে ঢক ঢক করে খেয়ে নিলাম। প্রকৃতি তার ভারসাম্য নিজেই রক্ষা করে। আর তাই আমার পানি খাবার একটু পরেই পেশাব লাগলো। আমি পানপাত্রতেই পেশাব করলাম। কি আশ্চর্য যতোটুকু পানি খেয়েছিলাম ঠিক ততোটুকুই পেশাব করলাম। কাঁচপাত্রে আমার পেশাব এমন চমৎকার লাগছিলো! মনে

হচ্ছিলো অরেঞ্জ জুস। এটা খেয়ে ফেলার ইচ্ছা খুব কষ্টে দমন করলাম। আমি পানপাত্রের পেশাব তারপুলিনের ঠিক ওপাশে এবং লকারটা আমার সীমায় রেখে ছিটিয়ে দিলাম। অর্থাৎ আমিও বাঘের মতো আমার সীমা নির্ধারণ করলাম। লকারের যেদিকটায় পানপাত্র ছিলো তা একেবারে রিচার্ড পার্কারের সীমানা ঘেঁষে। খুব সাবধানে, অনেকটা চুরি করেই আমি আরও দুটি পানপাত্র নিলাম। লকার থেকে আরেকটি দড়ি নিয়ে তা দিয়ে বেঁধে নিলাম ভেলাটি।

সোনার টিনটি নিলাম। এর গায়ে লেখা নির্দেশিকা থেকে জানলাম এটি হচ্ছে সমুদ্রের নোনা পানিকে খাবার পানিতে পরিণত করার যন্ত্র।

এবার ভেলাটার দিকে মন দিলাম। এর সব বাঁধন ভালোভাবে পরীক্ষা করলাম। একটি বৈঠাকে শিকার করার ছুরি দিয়ে ফুটো করে তার ভেতর দড়ি ঢুকিয়ে বেঁধে মাস্তুল বানালাম। বৈঠার চ্যাপ্টা দিক থাকলো উর্ধমুখী। এভাবে কাজে ব্যস্ত থেকে সময়টাকে যতদূর সম্ভব আমার কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। যে বৈঠা দিয়ে মাস্তুল বানালাম তার সাথে যে লাইফ জ্যাকেটটি ছিলো তা দিয়েই মাস্তুলের গোড়ার দিক কষে বাঁধলাম। মাস্তুলের দড়ির সাথে ছিদ্র করে চারদিক বেঁধে একটি কম্বল দিয়ে তৈরি করলাম শামিয়ানা।

এগুলো করতে করতে দিনের অনেকটা সময় পার হয়ে গেলো। অনেকদিকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিলো। ঢেউয়ের দুলুনিতে সুস্থিরভাবে কাজ করা যাচ্ছিলো না। ভেলাটাকে যেভাবে গড়লাম তা স্পেনের গ্যালিয়ন নৌকার মতো না হলেও একেবারে খারাপ হলো না। মাস্তুলটা আমার মাথার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি উঁচু হলো। ভেলার পাটাতন তেমন বড়ো না হলেও আমার পা ভাঁজ করে বসার মতো। আর কিছু না হোক তলার পানি এবার ভিজিয়ে দিতে পারবে না। তার ওপর রিচার্ড পার্কারের হাত থেকে তো বাঁচা যাবে!

কাজ শেষ করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেলো। আমি ভেলায় এক ক্যান পানি, ক্যান খোলার চাবি, চারটি বিস্কুট এবং চারটি কম্বল তুলে লকার বন্ধ করলাম সাবধানে। তারপর ভেলায় উঠে দড়ি ছেড়ে দিলাম। ভেলা ভেসে গিয়ে দড়ি টান টান হলে আমি দ্বিতীয় দড়ির এ মাথা আগেরটার সমান দৈর্ঘ্যে বেঁধে নিলাম। আমার নিচে দুটি কম্বল বিছিয়ে নিলাম। সাবধান থাকলাম যেনো এগুলো পানিতে ভিজে না যায়। বাকি দুটো আমার কাঁধে পেঁচিয়ে নিলাম এবং আমি বসে মাস্তুলে পিঠ ঠেকালাম। পাছার নিচে আরেকটা লাইফ জ্যাকেট রেখে বসার আসনটাকে আরও উঁচু এবং আরামদায়ক করে নিলাম। মেঝেতে কুশনের ওপর বসলে যে অবস্থা হয় পানি থেকে আমার উচ্চতা ছিলো তেমনি। এখনও আশঙ্কা করছিলাম ভিজে না যাই!

মেঘমুক্ত নীল আকাশে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আমি আমার খাবার খেয়ে নিলাম। এটা ছিলো ঐ মুহূর্তে আমার জন্য এক অনন্য অবসর। এক অপরূপ সাজে পৃথিবী সেজেছে আজ। তারাগুলোও এ সুন্দরের দীপাবলীতে অংশ নিলো। আলো একটু মিইয়ে আসতেই নীল আকাশে তারারা দ্যুতি ছড়াতে থাকলো। উষ্ণ বাতাস বইছিলো।

রিচার্ড পার্কার উঠে দাঁড়ালো। আমি তার মাথা এবং কাঁধ দেখতে পেলাম। সে বাইরে তাকালো। আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "হ্যালো! রিচার্ড পার্কার!" ওর উদ্দেশে আমি হাত নাড়ালাম। ও আমার দিকে তাকালো। সে *'প্রাসটান'* ডেকে উঠলো। কী অপূর্ব সুন্দর প্রাণী!

ছলাৎ শব্দে আমি এবার পানির দিকে তাকালাম। একটি বড়ো শ্বাস নিলাম। ভেবেছিলাম আমি একা। শান্ত বাতাস, আকাশে আলোর উদ্ভাস, তুলনামূলক নিরাপদ সময়—এ সবকিছু আমাকে ওরকমই ভাবিয়েছিলো।

নিচে তাকিয়ে সাগরজলে আমি যেনো এক গুপ্ত নগরী আবিষ্কার করলাম। আমার চারপাশ জুড়ে যেন শত শত সড়ক মহাসড়ক—এক আশ্চর্য সাবমেরিন ট্রাফিক। আলোর শরীরে যেসব রাস্তায় বাসের মতো, ট্রাকের মতো, গাড়ির মতো, সাইকেলের মতো ছুটে চলেছে নানা ধরনের মাছ, প্লাঙ্কটন। উজ্জ্বল সবুজ রঙের এ মহানগরীতে দ্রুত ছুটে চলেছে মাছের গাড়ি। কতো রঙের মাছ যে ছুটে চলেছে—সোনালি, নীল, সবুজ, রুপালি, হলুদ, লাল, গোলাপী, নানা রঙের যেনো মেলা বসেছে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে এ রঙিন নগরীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

আমি পাশ ফিরলাম। গত পাঁচদিনে এই প্রথম আমি প্রশান্তির ছোঁয়া পেলাম। মনের কোণে এক যৌক্তিক আশার আভা আমাকে আদরে ঘুম পাড়ালো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৬০

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। কম্বলের শামিয়ানা একটু সরিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। একফালি উজ্জ্বল চাঁদ ঝুলে আছে মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশে। আকাশে আজ এতো তারা আর ওরা এতো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে যে কিছুতেই একে অন্ধকার রাত বলা যাবে না। সমুদ্র শান্ত, নিপাট। আলোর ঝর্ণাধারায় অবগাহন করছে যেনো নীল সমুদ্র। কালো এবং রুপালি ধারা যেনো আমাকে ঘিরে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে মেতেছে। আমার চারপাশে এখন শুধু অসীমের বিস্তার। মাথার ওপর অসীম আকাশ, নিচে অসীম সমুদ্র। ভয় পেলাম কিছুটা। নিজেকে একসময় মহামুনি মার্কণ্ডের মতো মনে হলো। একবার বিষ্ণু যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন তার মুখ হা হয়ে পড়ায় মার্কণ্ড মুনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। বেরিয়েই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিশালতা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে যখন মার্কণ্ডর মর মর অবস্থা, তখন বিষ্ণুর ঘুম ভেঙে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মার্কণ্ডকে আবার মুখে পুরে নিলেন। এঃঃ প্রথমবারের মতো আমার মনে হলো বিধাতা যেনো আমাকে এ ভোগান্তিতে ফেলে আমার অগ্নিপরীক্ষা নিচ্ছেন। আমার এ ভোগান্তির কোন তুলনা আমার জানা ছিলো না। এটা যদি বিধাতার অগ্নিপরীক্ষা হয় তবে তাই হোক। (দিনেরবেলা আমার সত্তা জুড়ে এর প্রতিবাদ ওঠে ঃ "না! না! না! আমার ভোগান্তি কোন ব্যাপারই না। আমি বাঁচতে চাই। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে আমি মিশে থাকতে চাই। জীবন হচ্ছে চোরা ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাকে দেখা। আমি এই চোরা ছিদ্রের সন্ধান পেয়েছি)। আমি মুসলমানদের নামাজের সুরা পড়তে পড়তে আবার ঘুমিয়ে গেলাম।

৬১

পরদিন সকালে আমি মোটামুটি শুকনোই ছিলাম। খুব একটা ভিজিনি রাতে। নিজের ভেতর কিছুটা শক্তি অনুভব করলাম। চিন্তা করে দেখলাম এই ক'দিনে কী অল্প পরিমাণ খাবার আমি খেয়েছি!

এটা ছিলো এক চমৎকার সকাল। জীবনে এই প্রথম মাছ ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনটি বিস্কুট এবং এক ক্যান পানি খেয়ে তথ্যপঞ্জিটা পড়তে লাগলাম। প্রথম যে সমস্যা দেখা দিলো

তা হচ্ছে টোপ। বড়শির টোপ পাবো কোথায়? ভাবতে লাগলাম। নৌকায় মরা পশুর নাড়িভুঁড়ি আছে। কিন্তু ওগুলো তো রিচার্ড পার্কারের দখলে। ও কি বুঝবে মাছ ধরলে ওরই লাভ? অগত্যা সিদ্ধান্ত নিলাম আমার একটি চামড়ার জুতা কেটে কেটে টোপ বানাবো। অন্য জুতাটি জাহাজডুবির সময় হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমি নৌকায় চড়ে লকার খুলে একসেট বড়শি নিলাম, ছুরি নিলাম আর মাছ রাখার জন্য একটি বালতি নিলাম। রিচার্ড পার্কার কাত হয়ে শুয়ে ছিলো। আমার নড়াচড়ায় সে লেজ নাড়লো, কিন্তু মাথা তুললো না। ওগুলো নিয়ে আমি ভেলা ছেড়ে দিলাম।

একটি ছিপ জুড়ে এর সাথে তিনটি ওজন বেঁধে নিলাম। এরপর জুতাটা টুকরো টুকরো করে কাটলাম। কাটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো, কারণ জুতাটা ছিলো খুব শক্ত। অনেক কসরত করে বড়শিতে চামড়া গেঁথে পানিতে ছাড়লাম। রাতে যে হারে মাছ দেখেছি—নিশ্চয়ই কিছুক্ষণেই মাছ ধরে বালতি ভরে ফেলবো।

আমাকে হতাশ হতে হলো। একটা মাছও উঠলো না। একটার পর একটা চামড়ার টুকরো হারাতে লাগলাম—কিন্তু একটা মাছও পেলাম না। জুতার ফিতে তলা সবই হারালাম—মাছ ধরতে পারলাম না। শেষে সুখতলি গেঁথে দিলাম—বড়শিটা এক সময় খুব ভারি লাগলো, টান দিতেই দেখি হাল্কা। তুলে দেখি, বড়শি, ওজন সব গেছে।

এ ক্ষতিতে একেবারে হতাশ হলাম না। আরও এক সেট বড়শি তো আছেই। উপলব্ধি হলো—বোকামির মাসুল দিতেই হয়। এরপর আর বোকামি করা যাবে না।

সেদিন সকালে খানিক পরে দ্বিতীয় কচ্ছপটার দেখা পেলাম। এটি একেবারেই হাতের নাগালে চলে এসেছিলো। ধরতে যেতেই যেই হাতে এর ছোঁয়া লাগলো, কেন জানি না ভয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। এটি সাঁতরে চলে গেলো দূরে।

মাছ ধরতে না পারার চিন্তাটা আবার পেয়ে বসলো। বাঘটার খাবার ফুরিয়ে আসছে। ওর খাবার ব্যবস্থা করতে না পারলে বিপদ।

দিনের বাকি সময় সময় এই নিয়ে আক্ষেপ করে করেই কাটলো। রিচার্ড পার্কার শান্তভাবেই সময় পার করছে। ওর খাবার পানির ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই। নৌকার খোলে এখনো অনেক বৃষ্টির পানি আছে। কিন্তু সে আজ বাঘসুলভ অনেক ধরনের গর্জন করছে। মাছ ধরতে হলে টোপ লাগবে। কীভাবে, কী করে এই টোপ যোগাড় করবো?

পড়ন্ত বিকেলেই এর সমাধান হয়ে গেলো। আমি নৌকায় উঠে পড়লাম। এবং দ্রুত লকার খুলে খুঁজতে লাগলাম এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা যা দিয়ে বড়শির টোপ বানানো যায়। ভেলাটাকে এমনভাবে বাঁধলাম যাতে এর দূরত্ব নৌকা থেকে মোটামুটি ছয় ফুটের মতো হয়। রিচার্ড পার্কার যদি আক্রমণ করেই বসে তাহলে লাফিয়ে ভেলায় নামা যাবে।

হঠাৎ করেই নেমে এলো আঘাত। আমি যখন লকার খুলছিলাম তখন তো সে নৌকার ও মাথাতেই ছিলো, জেব্রার ভাঙা বেঞ্চটার কাছে। উঠে সে আমার দিকে আসতে থাকলো। সহসা আমার মুখে প্রচণ্ড এক আঘাত। নীরবে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এসে সে আমাকে আঘাত করেছে। এখনই বুঝি আমার মুখে নেমে আসবে প্রচণ্ড থাবা। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি গুঙিয়ে গুঙিয়ে বললাম, "আয়, আয়, রিচার্ড পার্কার! আমাকে শেষ করে দে। দোহাই তোর, দেরি করিস না, যা করার তাড়াতাড়ি কর। তোর প্রচণ্ড থাবার বার বার আঘাতের চেয়ে বরং এক আঘাতেই আমাকে মেরে ফেল্।"

কিন্তু সে সময় নিচ্ছিলো। সে আমার পায়ের কাছে শব্দ করছিলো। নিশ্চয়ই সে এরই মধ্যে আমার লকারের সন্ধান পেয়ে গেছে এবং খাবারগুলো সাবাড় করছে। খুব ভয়ে ভয়ে একটি চোখ খুললাম।

আরে, বাঘ কোথায়! এ যে একটি মাছ! এবং আমার লকারে। ডাঙায় তোলা মাছের মতো এটা তরপাচ্ছিলো। এটা প্রায় পনেরো ইঞ্চি লম্বা। এবং এর পাখা আছে। অর্থাৎ উড়াল মাছ। বঙ্গোপসাগরের উড়াল মাছ এতো বড়ো হয় না। হাল্কা গড়নের এ মাছটির রঙ ধূসর-নীল। পাখায় কোনো পালক নেই—চোখ হলদেটে। এ মাছটিই আমার মুখে আঘাত করেছিলো—রিচার্ড পার্কার নয়। সে এখনও আমার চেয়ে পনেরো ফুট দূরে অবাক হয়ে দেখছিলো আমি কী করছি। কিন্তু সে মাছ দেখেছে। তার ভেতর উদগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করলাম।

আমি নিচু হয়ে মাছটা ধরেই তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। তাকে পোষ মানানোর এমন এটিই উপায়। কিন্তু ইঁদুরের মতো এটি রিচার্ড পার্কারের হা করা মুখে গিয়ে পড়লো না। পড়লো ওর হা করা মুখের সামান্য উপর দিয় পানির মধ্যে। রিচার্ড পার্কার দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে মাছটাকে ধরতে গেলো। কিন্তু তার আগেই মাছটি পগার পার! সে আমার দিকে তাকালো। ভাবখানা এমন—"আমার খাবার কই?" আমি সংশয়ের সাথে ঘুরে দাঁড়ালাম ভেলায় লাফিয়ে পড়ার জন্য। বলা তো যায় না বেটার মতিগতি!

ঠিক তখনই বাতাস কাঁপানো শব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি আরে বাপস্! এক ঝাঁক উড়াল মাছ; যেনো ওদের স্কুল ছুটি হয়েছে। পানি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে আমাদের ওপর হামলে পড়ছে। কয়েকটা ভাগ্যক্রমে নৌকা পেরিয়ে পানিতে পড়লো। বেশির ভাগই নৌকার খোলে, তারপুলিনে পড়লো। আমাদের লক্ষ্য করেই যেনো ওদের এ গণউড়াল। দু'হাত সমানে চালিয়েও রক্ষা পাচ্ছিলাম না। আমি কম্বল মুড়ে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। একইসাথে চেষ্টা করছিলাম দু'-একটাকে ধরা যায় কিনা। আমার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হলো।

এগুলোর এরকম উত্তুঙ্গ উড়ালের কারণ বুঝতে পারলাম একটু পরেই। ডোরাডো মাছের ঝাঁক পানি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এদের তাড়া করছে। ডোরাডো মাছ উড়তে না পারলেও এদের গতি উড়াল মাছের চাইতে বেশি। তাছাড়া হাঙরও ছিলো। মাছের এ মাতামাতিতে পানিতে বেশ ওলট-পালট হচ্ছিলো। রিচার্ড পার্কার দেখা গেলো মাছের এ আক্রমণ ঠেকাতে আমার চাইতে বেশি দক্ষ। সে এদের দু'হাতে সরাতে সরাতে যে ক'টা পারলো ধরে খেলো।

এই মাছঝড় থেমে গেলে দেখলাম আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গা ছড়ে গেছে। লকারে দেখলাম ছয়টি উড়াল মাছ আটকা পড়েছে, এছড়া অনেকগুলো পড়েছে নৌকার খোলে। আমি দ্রুত একটি মাছ কম্বলে জড়িয়ে নিলাম আর ছোট একটি কুড়াল নিয়ে ভেলায় নেমে এলাম।

আরও সতর্ক হতে হবে। চারদিক বিবেচনা করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সকালে যে বোকামি করেছি, লক্ষ্য রা়খতে হবে কিছুতেই যেন তেমনটি আর না ঘটে। সাবধানে কম্বল থেকে মাছটি বের করে আনছিলাম। এক হাত দিয়ে এটিকে এমনভাবে চেপে ধরে রেখেছিলাম যাতে এটি আবার উড়াল দিতে না পারে। আমি মাছটিকে এমনভাবে চেপে ধরেছিলাম, যেমনটি চটে পেঁচিয়ে বরফের খণ্ডকে বরফের দোকানিরা গুঁড়া করে।

বার বার কুড়াল উঁচু করেও মাছটাকে কাটতে পারছিলাম না। বাঘকে ইঁদুর ছুঁড়ে দিয়েছিলাম—সেটাই ছিলো আমার জীবনের প্রথম জীব হত্যা। এখনো সেজন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। আর নিজ হাতে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে জীব হত্যা! তাও আবার বইপোকা ধর্মে অনুরক্ত ষোলো বছর বয়সেও এ তরুণ!

আমি কম্বল জড়িয়ে মাছের মাথা চেপে ধরে আবার কুড়াল উঁচু করলাম। তারপর চোখ বুজে দিলাম এক কোপ। রক্ত দেখতে হবে বলে ওদিকে তাকাচ্ছিলাম না। আমি দ্রুত কম্বল পুরো মাছটা পেঁচিয়ে নিয়ে এটির মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙার চেষ্টা করলাম। এ কাজ করতে রীতিমতো আমাকে ঘামতে হলো।

মাছটাকে মেরে ভেতর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছিলো কান্না। মরে যাওয়ার পর এখন মাছটিকে আমার পন্ডিচেরি বাজারে দেখা মাছের মতো লাগছে।

দিনের আলো মরে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামবে এখুনি। আমি আবার মাছ ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথম প্রথম সকালের মতোই আমাকে হতাশ হতে হলো। মাছ টোপ খেয়েই যাচ্ছিলো। আমার ধারণা হলো মাছগুলো বড়শির তুলনায় খুবই ছোট। তাই বড়শি আরও একটু গভীরে নামিয়ে দিলাম। টোপ হিসাবে এবার দিলাম উড়াল মাছের মাথা।

প্রথম মাছটি যখন ধরলাম—কী যে রোমাঞ্চ। এটি ছিলো একটি ডোরাছো মাছ। মাছটি টোপ গিলতেই প্রথমে আমি একটু ঢিলা দিলাম। তারপর দিলাম হ্যাঁচকা টান। ওহ মাছটার গায়ে যেনো ষাঁড়ের শক্তি। সন্দেহ হলো—শেষপর্যন্ত মাছটাকে তুলতে পারবো তো?

শেষমেষ এটাকে ভেলায় তুলতে সক্ষম হলাম। এটি ছিলো তিন ফুট লম্বা। আমি মাছটাকে হাঁটুতে চেপে ধরে বড়শি ছাড়ালাম। মাছটি খুব মাংসল। যেভাবে মাছটি ছটফট করছে তাতে আমার ভেলাটি খুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় কিনা ভাবছিলাম। এমন একটা মাছ ধরতে পেরে নিজেকে হিরো হিরো লাগছিলো। এ যেন আমার এক চরম প্রতিশোধ। জাহাজডুবির জন্য, আমার ভোগান্তির জন্য যে সমুদ্র দায়ী তার ওপর এ আমার ভীষণ প্রতিশোধ। "ভগবান বিষ্ণু তোমাকে ধন্যবাদ। একবার তুমি মাছের রূপে পৃথিবীকে বাঁচিয়েছিলে। এবার তুমি মাছের রূপে এসে আমাকে এ পরিস্থিতিতে উদ্ধার করলে। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভগবান।" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

এটাকে মারা কোন ব্যাপার ছিলো না। আমার মন এতে একটুও খারাপ হলো না। কারণ এ মাছ আমি রিচার্ড পার্কারের জীবন বাঁচাতে মারছি। এখন সমস্যা হচ্ছে বড়শিটা এর পেট থেকে উদ্ধার করতে হবে। দুই হাতে কুড়াল ধরে কুড়ালের ভোঁতা দিক দিয়ে মাছটাকে আঘাত করতে লাগলাম। উড়াল মাছটি মারার সময়ও আমি কুড়ালের উল্টোদিক ব্যবহার করেছিলাম। মাছটা মরে যাবার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। এটি দ্রুত রঙ বদলাতে লাগলো। কখনও নীল, কখনও সবুজ, কখনও লাল, কখনও সোনালি আবার কখনও এটি বেগুনী রং ধারণ করতে লাগলো। আমার মনে হলো আমি এক রঙধনুকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারছি। অবশেষে আমি বড়শিটা এর পেট থেকে বের করতে পারলাম। শুধু তাই নয়, বড়শিতে যে টোপ দিয়েছিলাম তাও কিছুটা উদ্ধার করতে পারলাম।

শিকারির গর্ব নিয়ে আমি নৌকার পাশে ভেলা ভেড়ালাম। নৌকার পাশ দিয়ে নিতে নিতে এক ঝটকায় এটিকে নৌকার খোলে ফেললাম। এটি যে শব্দ করে খোলে পড়লো তাতে রিচার্ড পার্কার চমকে উঠলো। দু'বার গর্জন শোনার পর আমি বাঘের চিবানোর শব্দ পেলাম। অর্থাৎ রিচার্ড পার্কার এটিকে খাচ্ছে। আমি বার বার বাঁশি বাজিয়ে রিচার্ড পার্কারকে জানান দিচ্ছিলাম যে আমিই তার খাদ্যের সরবরাহকারী।

মাছের রক্ত সারা গায়ে লেগে ছিলো। ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। আকাশের চাঁদ আর তারা মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে হাল্কা মেঘ। আমি ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। তবু নিজের ভোগান্তি নিয়ে একটুও

ভাবছিলাম না। মাছ ধরতে পারার গর্বে এক অন্যরকম ভালো লাগা আমার চেতনা কাজ করছিলো। ভাল খেলা বা দড়ির পেঁরো অনুশীলনের চেয়ে মাছ শিকারে নেতে থাকা অনেক বড় কি? ঠিক করলাম কাল সকালের আলো ফুটতেই আবার মাছ ধরবো।

ডোরাছো ধরার তৃপ্তি নিয়ে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

৬২

সারারাত বেঘোরে ঘুমালাম। সূর্য ওঠার একটু আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। আবার ঘুমাতে হচ্ছ করছিলো। জোর করেই ঘুম তাড়ালাম। কনুইতে ভর দিয়ে নৌকার দিকে তাকাতেই বাঘটাকে দেখতে পেলাম। সে গোত্তাচ্ছিলো এবং ঘরঘর শব্দ করছিলো আর নৌকায় পায়চারি করছিলো। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। এটা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত নয়। তবে ও এমন করছে কেনো? তবে কি ও তৃষ্ণার্ত? নৌকায় ওর খাবার পানি কি ফুরিয়ে গেছে? রিচার্ড পার্কার যখন পায়চারি করছিলো ওর লম্বা জিভ বেরিয়েছিলো।

আকাশের দিকে তাকালাম। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। বোঝা যাচ্ছে আজকের দিনটিও বৃষ্টিহীন এবং গরম থাকবে।

মাস্তুলে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। বিস্কুট এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম থাকায় শুধু খাবারের ব্যাপারে কোনো চিন্তা ছিলো না। খাবার পানির কথাই আমাকে বেশি বেশি ভাবতে হচ্ছে। যে ক'টা পানির ক্যান আছে তাতে আমারই ভবিষ্যত অনিশ্চিত। এখান থেকে বাঘকে ভাগ দেয়া যাবে না। তবে কি নৌকার তলায় একটু সমুদ্রের পানি ঢেলে দেবো। হঠাৎ আমার সোলার স্টিলের কথা মনে পড়ে গেলো। দড়ি দিয়ে বেঁধে এগুলোকে পানিতে পেতে রেখেছিলাম।

তেমন একটা আশা ছিলো না। তবু পানির নিচে একটা স্টিলের থলেতে হাত দিলাম। এ থলেতে বিশুদ্ধ পানি জমা হবার কথা। আরে! থলের পেট মোটা মোটা লাগছে! আমি দ্রুত এটি তুলে আনলাম। সত্যিই পুরো থলে ভরা পানি। এ যে অবিশ্বাস্য। জিভে চেয়ে দেখলাম—একটুও নোনতা লাগলো না। ঢক ঢক করে খেয়েই ফেললাম। সব স্টিলের পানির থলেই পূর্ণ ছিলো। সব মিলিয়ে আট লিটার পানি বালতিতে ঢেলে থলেগুলো আবার জায়গামতো লাগিয়ে দিলাম। স্টিলগুলো এখন আমার দুধেল গাভী যেনো!

বালতিতে সামান্য সমুদ্রের পানি মিশিয়ে নৌকার পাশ বেঞ্চের ওপর, ঠিক তারপুলিনের পাশেই এটিকে বেঁধে রাখলাম। উঁকি দিলাম। রিচার্ড পার্কার একদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে। ইস, কি যে অবস্থা নৌকার। মরা পশুর হাড়-গোড়, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়িতে রিচার্ড পার্কারের থাকার জায়গাটা বিশ্রীভাবে নোংরা। উড়াল মাছের পাখনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আমি একটি উড়াল মাছ কেটে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে বালতির কাছে রাখলাম। আবেক টুকরা একটু দূরে বেঞ্চের ওপর রাখলাম। আমি ভেলা ছেড়ে দিলাম। একটু দূরে যেতেই দেখি ও উঠে দাঁড়ালো। প্রথমে উড়াল মাছ চিবালো। তারপর বালতির কাছে গেলো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম ও বালতির পানি ফেলে দেয় কিনা কিংবা বালতিতে ওর মাথা আটকে যায় কিনা। কিছু না, এর কিছুই ঘটলো না। বাঘটা পুরো পানিটুকু খেয়ে ফেললো।

পানি খাওয়া হলে রিচার্ড পার্কার মুখ তুলে এদিকে তাকালো। আমি ওর দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাঁশি বাজালাম বেশ ক'বার। সাথে সাথে ও মাথা নিচু করে নৌকার খোলে অদৃশ্য হলো।

দিনে দিনে নৌকাটা যেন চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচা হয়ে উঠছিলো।

সূর্য যতোই মাথার ওপর উঠছিলো ততোই গরম বাড়ছিলো। আমি শামিয়ানার নিচে আশ্রয় নিলাম। সারাদিনেও আরা কোনো মাছ পেলাম না। পড়ন্ত বিকেলে আর একটি কচ্ছপ এলো। এটি অন্যরকম। সবুজ, মনে হচ্ছে খোলটা ওগুলোর চেয়ে নরম। কি করবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

সারাদিনে ফ্লিলে বিশুদ্ধ পানি আহরণ ছাড়া আর কোন ভালো কিছু ঘটলো না।

অনেকটা ব্যর্থভাবেই দিনটা পার করলাম। হিসাব করে দেখলাম কাল সকালে 'সিমিটু' জাহাজটি ডোবার এক সপ্তাহ পুরো হবে।

৬৩

রবার্টসন পরিবার আটত্রিশ দিন সমুদ্রে টিকে ছিলো। বিখ্যাত সেই নৌ-বিদ্রোহের 'শিকার' ক্যাপটেন ব্লিগ এবং তাঁর সঙ্গীরা সমুদ্রে সাতচল্লিশ দিন টিকেছিলেন। স্টিভেন কালহান টিকেছিল ছিয়াত্তর দিন। তিমি শিকারের জাহাজ এসেক্সকে ডুবিয়ে দিয়েছিলো এক তিমি। এর নাবিক হারমেন মেলভিল দু'জন সঙ্গীসহ তিরাশি দিন সমুদ্রে ভেসেছিলেন। মাঝে অবশ্য তাঁরা এক প্রতিকূল পরিবেশের দ্বীপে এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বেইলি পরিবার টিকেছিলো ১১৮ দিন। আমি এক কোরিয়ান নাবিক, পুনের কথা শুনেছি যিনি ১৯৫০ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে ১৭৩ দিন ছিলেন।

আমি টিকে থেকেছিলাম ২২৭ দিন। সাত মাসের ওপর আমাকে সমুদ্রের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছিলো।

নানা কাজে আমি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম। আর এটাই ছিলো আমার এতোদিন সমুদ্রে টিকে থাকার চাবিকাঠি। একটি জীবনতরী এবং একটি ভেলা রক্ষণাবেক্ষণে সবসময়ই কিছু না কিছু করতে হতো। গড়পড়তা আমার দৈনন্দিন কাজের রুটিন ছিলো অনেকটা এরকম ঃ

সূর্যোদয় থেকে মধ্যসকাল :

- ঘুম থেকে জেগে ওঠা।
- নামাজ।
- রিচার্ড পার্কারকে নাস্তা দেয়া।
- নৌকা এবং ভেলার সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা।
- বিশেষভাবে ভেলার গেরো এবং দড়ি ঠিক আছে কিনা দেখা।
- সোলার স্টিলের পরিচর্যা করা। থলে ভরে গেলে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা, থলে পুর্নসংযোগ ইত্যাদি।

- মাছ ধরা এবং কোন মাছ পাওয়া গেলে তার ব্যবস্থা করা। যেমন মাছের নাড়িভুঁড়ি বের করা, একে ছুরি দিয়ে কেটে দড়িতে ঝুলিয়ে রোদে শুকোতে দেয়া ইত্যাদি।

মধ্যসকাল থেকে বিকেল :

- নামাজ।
- হাল্কা লাঞ্চ।
- বিশ্রাম এবং বিশ্রামমূলক কাজ (ডায়েরি লেখা, খোঁশ-পাচড়া ও মায়ের যত্ন নেয়া, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উন্নতির জন্য কিছু না কিছু করা। লকারের জিনিসপত্র যথাযথ সংরক্ষণ, রিচার্ড পার্কারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, কচ্ছপের খোলস থেকে খুঁটে খুঁটে মাংস বের করা ইত্যাদি।)

বিকেল থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত :

- নামাজ।
- মাছ ধরা এবং সংরক্ষণ করা।
- যত্নের সাথে মাছ কেটে ফালি বানানো (নরম অংশ, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি আলাদা করা।)
- খাবার তৈরি করা।
- নিজের এবং রিচার্ড পার্কারের খাওয়া।

সূর্যাস্ত :

- ভেলা এবং নৌকার সবকিছু পরীক্ষা করে দেখা।
- পোলার স্টিল থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা।
- খাদ্য এবং রসদ সংরক্ষণ করা।
- রাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ (বিছানা করা, ভেলায় সুবিধামতো জায়গায় ফ্লেয়ার তথা আলোকসংকেত সংরক্ষণ করা—জাহাজ দেখা গেলে যাতে সংকেত দেয়া যায়, বৃষ্টির পানি ধরার পাত্রটা জায়গামতো রাখা)।
- নামাজ।

রাত :

- ঘুমানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা।
- নামাজ।

সাধারণত পড়ন্ত বিকেলের চেয়ে সকালের সময়টা ভালো কাটতো।

অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটলে এ রুটিন আর ঠিক রাখা যেতো না। তখন জরুরিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতো। দিনে বা রাতে বৃষ্টি হলে আর সব কাজ ফেলে এর পিছনে মনোযোগ দিতে হতো। অন্যদিকে রিচার্ড পার্কার প্রায়ই আমার দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটাতো। ওর দেখাশোনার ব্যাপারটা ছিলো আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তার খাওয়া, পান করা এবং ঘুমানোর কোনো রুটিন ছিলো না। কখনও কখনও সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তো এবং নিজের এলাকার সীমানা লঙ্ঘন করতে চাইতো। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে রোদ এবং আদিগন্ত সমুদ্র তাকে তাকে আবার তার সীমানায় ফিরে যেতে বাধ্য করতো।

তবুও এটা একটা বাঘ। কখন কি করে বসে তার কিছু ঠিক নেই। তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হতো।

প্রথম প্রথম দিগন্তে চোখ রেখে জাহাজ খুঁজতাম। কিন্তু পাঁচ/ছয় সপ্তাহ পর থেকে এ কাজে আর সময় নষ্ট করতাম না।

আর আমি টিকে থাকতে পেরেছিলাম কারণ আমি সবকিছু ভুলে যেতে পেরেছিলাম। কেলেন্ডার অনুযায়ী আমার কাহিনী শুরু হয়েছিলো ২ জুলাই, ১৯৭৭ সালে। আর শেষ হয়েছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ সালে। কিন্তু এ সময়ের মাঝে আমি আর কোন দিন-তারিখের খবর রাখিনি।

আমার যা মনে আছে তা হচ্ছে তখনকার ঘটনা, রুটিন, ভেসে যেতে যেতে সমুদ্রে ভাসমান বয়ার চিহ্ন। আর মনে আছে হ্যান্ড ফ্লেয়ার, কচ্ছপ শিকার, শৈবালের কথা। আরও কতো কিছু মনে পড়ছে, ওই ভাবতে আমার মাথায় চক্কর দিচ্ছে।

৬৪

রোদ এবং লবণের কারণে খুব দ্রুতই আমার পোশাক জীর্ণ-মলিন হয়ে উঠলো। প্রথমে এগুলো পাতলা হতে থাকলো, তারপর ছিঁড়ে যেতে লাগলো, শুধু সেলাইয়ের জায়গা বাদে। শেষপর্যন্ত সেলাইও ছিঁড়ে যেতে লাগলো। মাসের পর মাস আমি একেবারে উদোম শরীরে কাটিয়েছিলাম—শুধু বাঁশিটা গলায় ঝুলানো ছিলো।

লোনা পানির কারণে ফোঁড়া হতো, এগুলো লাল হতো। গভীর সমুদ্রে কুষ্ঠ রোগের মতো আমাকে ভুগিয়েছে এগুলো। এক জায়গায় ঘষতে ঘষতে এমন ঘা হলো যার যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে কাঁদতাম। আমার শরীরের যে অংশ প্রায়ই ভিজা থাকতো এবং ভেলার সাথে সন্নিবিষ্ট থাকতো, অর্থাৎ পাছা—সেখানেই ফোঁড়াগুলো বেশি হতো। অনেকদিন এমন-হয়েছে, আমি শরীরের যে অংশে ভর দিয়ে বিশ্রাম নেবো তা প্রায় খুঁজেই পেতাম না। সময় এবং রোদ এগুলোকে সারিয়ে তুলতো, তবে খুব ধীরে। আর শরীর শুকনো রাখতে না পারলে আবার নতুন নতুন ঘা হতো।

৬৫

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেভিগেশন তথ্যপঞ্জির পাঠোদ্ধারের জন্য ব্যয় করেছি। সমুদ্রে বেঁচে থাকার উপায় সহজ-সরলভাবেই এতে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তা সবার জন্য নয়। সমুদ্র সম্বন্ধে যার কোন ধারণাই নেই তার জন্য এ তথ্যপঞ্জি নয়। এ তথ্যপঞ্জির যিনি লেখক তিনি ধরেই নিয়েছেন এ বই যে পড়বে সে অবশ্যই কোন নাবিক যার হাতে ঐ মুহূর্তে ধরা আছে কম্পাস, সমুদ্রের মানচিত্র এবং সেক্সটান্ট; সে জানে কিভাবে সে বিপদে পড়েছে এবং কীভাবে তাকে উদ্ধার পেতে হবে। এখানে কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে যেমন, "মনে রাখবেন, সময় হচ্ছে দূরত্ব। আপনার ঘড়িতে দম দিতে ভুলবেন না" অথবা "আঙুল দিয়ে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়—

যদি প্রয়োজন পড়ে।" আমার একটি ঘড়ি ছিলো, কিন্তু এটা এখন প্রশান্ত মহাসাগরের তলায়। জাহাজডুবির সময় আমি এটি হারিয়েছি। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ তো দূরের কথা আমার সমুদ্রজ্ঞান সমুদ্রে কি কি বাস করে আর সমুদ্রে কি কি চলে এর মধ্যেই সীমিত। বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রস্রোত আমার কাছে এক বিস্ময়। তারা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। এমনকি আমি কোন নক্ষত্রপুঞ্জেরও নাম জানি না। একটা তারা নিয়েই আমার পরিবার বেঁচে ছিলো, সেটি হলো সূর্য। আমাদের পরিবার হচ্ছে 'সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়া, সকাল সকাল ওঠা' পরিবার। আমি আমার জীবনে অনেকবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছি—নক্ষত্ররাজি দেখেছি। তাদের রং, রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাদের বিশালতা আমাকে ঈশ্বরের কথা ভাবিয়েছে। এর আগে তারা দেখেছি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তারারা কেন জ্বলজ্বল করে বা মিটমিট করে এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিলো না।

অগত্যা নেভিগেশন তথ্যপঞ্জির পাঠোদ্ধারে সময় নষ্ট করা বাদ দিলাম। আর এ থেকে কোনো ফায়দাও ছিলো না। কারণ এ জ্ঞান আমি কিভাবে কাজে লাগাবো তা আমার জানা ছিলো না। আমার কোন পাল নেই, মটর নেই, রাডার নেই। তাছাড়া ওগুলো থাকলেই বা কি? কোনদিকে এগুলে কোথায় যাওয়া যাবে সে জ্ঞান আমার ছিলো না। পশ্চিমে গেলে কি যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে যাওয়া যাবে? পূর্বে কি আমেরিকা? উত্তরে এশিয়া? দক্ষিণে—যেদিকে জাহাজ এগুচ্ছিলো?

সুতরাং আমি স্রোত এবং হাওয়ার ওপর ভেলা আর জীবনতরীকে চালিয়ে নেবার ভার সঁপে দিলাম। সময় আমার কাছে দূরত্ব ঠিকই তবে তা অন্যসব মরণশীলের মতোই। আমি আমার জীবন যাপনে কতো কাজেই না আঙুলকে ব্যবহার করেছি কিন্তু কোনোদিন এ দিয়ে অক্ষাংশ নির্ণয়ের প্রয়োজন পড়েনি। পরে জেনেছিলাম আমি প্রশান্ত-নিরক্ষীয় উল্টো স্রোত ধরে অপ্রশস্ত পথে চলেছিলাম।

৬৬

পানির বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরতে আমি বিভিন্ন রকমের বড়শি ব্যবহার করতাম। পরিশ্রমের তুলনায় মাছ পেতাম খুবই কম। ওদিকে রিচার্ড পার্কারের ক্ষুধা লেগেই থাকতো।

শেষপর্যন্ত কোঁচই আমার সবচেয়ে ভালো মাছ ধরার উপকরণে পরিণত হলো। এটা স্ক্রু দিয়ে তিনভাগে ভাগ করা। প্রথম দু'অংশ জোড়া দিলে হলো কোঁচের লম্বা হাতল। এর এক অংশে হাতল লাগানো এবং এর সাথে আবার দড়ি বাঁধার জন্য একটা আংটা লাগানো। শেষ অংশে চোখা মাথায় ২ ইঞ্চির বড়শি যার সামনের অংশ খুব তীক্ষ্ণ। তিন অংশ জোড়া লাগালে এর দৈর্ঘ্য হয় পাঁচ ফুট। এটা হাল্কা এবং তরবারির মতো মজবুত।

প্রথম প্রথম এটা দিয়ে শুধু পানিতে ভেসে ওঠা মাছ মারতাম। পরে বড়শির ফাৎনা নড়ে উঠতেই কোঁচ ছুঁড়ে মারতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছের নেশায় কিভাবে পার হয়ে যেতো বুঝতে পারতাম না। এরপর যখন একটার পর একটা মাছ পেতে থাকতাম আমার দু'হাত হাঁটু দিয়ে ছড়িয়েও কূল পেতাম না। তখন মনে হতো—ইসক, মা দুর্গার মতো যদি আমার দশটি হাত থাকতো। এক সময় সেই কলার বোঝার জালটাও ব্যবহার করতে শুরু করলাম।

কচ্ছপ ধরা ছিলো তুলনামূলক অনেক সহজ। এরা দ্রুত সাঁতরাতেও পারতো না আবার তেমন শক্তিশালীও ছিলো না। জায়গার অভাবে শেষমেশ এদের পায়ে দড়ি বেঁধে নৌকার সাথে ঝুলিয়ে রাখতাম। একবার তো একটি সবুজ কচ্ছপ এভাবে দু'দিন ঝুলে ছিলো।

বাজপাখি চঞ্চু কচ্ছপের চেয়ে সবুজ কচ্ছপের মাংস অনেক বেশি হতো। কিন্তু এরা এতো বড়ো হতো যে এগুলোকে তুলতে আমার খুব কষ্ট হতো।

হা ঈশ্বর যে আমি ছিলাম একজন নিরামিষভোজী সে কিনা এখন নিয়মিত কচ্ছপের মাংস খাচ্ছি! আমি এমন আদিম বর্বর হয়ে গিয়েছিলাম যা কখনও কল্পনাও করিনি।

৬৭

ভেলার তলাটা একসময় যেনো সামুদ্রিক প্রাণীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হলো। ক্রমশ আমার ভেলায় সবুজ শ্যাওলা জমতে লাগলো। লাইফ জ্যাকেটগুলোতে শ্যাওলা জমে জমে ঝুলে থাকতে লাগলো। এর সাথে শক্ত কালো শ্যাওলাও জমতে শুরু করলো। এই শ্যাওলার লোভে নানা ধরনের প্রাণী ভিড় জমাতে থাকলো। প্রথম আমার চোখে ধরা পড়লো কুঁচো চিংড়ি। এরপর আসতে থাকলো খুব ছোটো ছোটো মাছ। এগুলো এতো স্বচ্ছ যে ভেতরের হাড়-গোড় পর্যন্ত দেখা যেতো। এরপর একদিন আমার নজরে এলো এক ধরনের কালো পোকা, যার গায়ে আবার সাদা সাদা কাঁটা। আরও এলো এক ইঞ্চি লম্বা পেটমোটা এক ধরনের মাছ। তারপরেই এলো ছোট ছোট কাঁকড়া। আধা ইঞ্চি থেকে পৌনে এক ইঞ্চি লম্বা-বাদামী রঙের। আমি ঐ কালো পোকা আর শৈবাল ছাড়া সবই খেতাম। কাঁকড়া ছাড়া আর সবই নোনতা এবং কিছুটা বিস্বাদ লাগতো। এগুলোকে দেখামাত্র ধরে গপ করে মুখে পুরতাম। এগুলো দেখলে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারতাম না।

নৌকার চারপাশেও নানা ধরনের প্রাণী জমা হতে শুরু করলো। নৌকার তলায় জমা হতে লাগলো নানা আকারের শামুক। আমি এগুলোর তরল অংশ চুষে খেতাম আর গুগলি দিয়ে বড়শির টোপ বানাতাম।

আমি এগুলো নিয়ে মেতে থাকতাম, যদিও এগুলোর ভারে ভেলা কিছুটা হলেও দেবে গিয়েছিলো। এক সময় রিচার্ড পার্কারের মতো এগুলোও আমার চিন্তার কারণ হয়েছিলো। আমি প্রায়ই কনুইতে ভর দিয়ে নিচে তাকিয়ে থাকতাম। নিচে যেনো এক সুন্দর ছোট্ট শহরকে উল্টে রাখা হয়েছে, শান্ত, নিরুপদ্রব। পরীর মতো সুন্দর সুন্দর প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অনন্য সুন্দর দৃশ্যাবলি আমার বিধ্বস্ত স্নায়ুতে ভালো লাগার কোমল পরশ বুলিয়ে দিতো।

৬৮

আমার ঘুমের ধরন পাল্টে গেলো। যদিও আমি সারাক্ষণই বিশ্রামে থাকতাম তবুও নাগাড়ে এক-দুই ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারতাম না। এমনকি রাত্রেও না। এটা এজন্য নয় যে সমুদ্রের দোলায় নিরন্তর দুলতে হতো, বাতাসের কারণেও নয়। এ হচ্ছে আমার ভেতর সবসময় খোঁচাতে থাকা উদ্বেগ আর আশঙ্কা। এতো কম ঘুমানো আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রিচার্ড পার্কার কিন্তু এর সম্পূর্ণ উল্টোটা। ও যেন দিনে দিনে ঘুমের চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠছিলো। বেশিরভাগ সময় সে তারপুলিনের তলায় ঘুমাতো। মেঘমুক্ত শান্ত দিনে সমুদ্র যখন নিস্তরঙ্গ থাকতো কিংবা শান্ত রাতে সে বেরিয়ে আসতো। তার প্রিয় বিশ্রামের ভঙ্গি ছিলো নৌকার পিছনের বেঞ্চে কাত হয়ে শোয়া। তার পেট বেঞ্চ থেকে ঝুলে থাকতো, সামনের এবং পেছনের পা থাকতো দু'পাশের বেঞ্চে ছড়ানো। একটি বাঘের জন্য এভাবে শুয়ে থাকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু রিচার্ড পার্কার ওর পাছাকে গোল করে এভাবে শোয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। ও যখন সত্যি সত্যি ঘুমাতো তখন সামনের দু'পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমাতো। কিন্তু সে যখন একটু সজাগ থাকতো, সে যখন চোখ মেলে তাকাতে চাইতো, সে তার মাথা ঘোরাতো এবং নৌকার মাথাকাঠে থুঁতনি ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকতো।

তার আর একটি প্রিয় ভঙ্গি ছিলো আমার দিকে পিছন ফিরে শোয়া। এ সময় তার শরীরের পিছনের অংশ থাকতো নৌকার খোলে এবং সামনের অংশ থাকতো বেঞ্চের ওপর। তার মাথা থাকতো পিছগলুইতে তোলা এবং সামনের পা দুটো ভাঁজ হয়ে থাকতো মাথার দু'পাশে। তার ভাব দেখে মনে হতো সে যেনো আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে। এ সময় সে একদম স্থির হয়ে থাকতো, শুধু খাড়া কান দুটি নড়ে উঠতো মাঝেমধ্যে।

৬৯

অনেক রাতে দূরে কোনো আলো দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। অতিরিক্ত আশায় রকেট ফ্লেয়ার ছোঁড়ার পরও হাত ফ্লেয়ার জ্বালতাম। জাহাজগুলো কি এসব দেখতে পেতো না? তারা কি এটাকে কোন তারার ঢেউয়ের আড়ালে লুকোচুরি মনে করতো? তারা কি এটাকে কোনো দৃষ্টিভ্রম মনে করতো? যাই হোক প্রতিবারই আমার আলোক সঙ্কেত ছোঁড়া ব্যর্থ হতো। প্রতিবারই আলো দেখে অনেক আশায় ফ্লেয়ার ছুঁড়তাম আর নিরাশ হতাম। বিরক্ত হয়ে আশা ছেড়ে দিতাম প্রায়ই। সমুদ্রতলের পাঁচ ফুট উচ্চতা থেকে যদি দিগন্তের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল হয় তবে জাহাজগুলো কতো দূর দিয়ে যায়, যেখানে ভেলায় মাস্তুলে হেলান দেয়া আমার উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে মাত্র তিন ফুট? এই বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে এই স্বল্প পরিসরে তাহলে আমি কোনো উদ্ধারকারী জাহাজ কী করে আশা করতে পারি? সুতরাং একমাত্র কোন কূলে পৌঁছাই এই মুহূর্তে উদ্ধারের একমাত্র পূর্বশর্ত।

ব্যবহার করা হ্যান্ড ফ্লেয়ারের গন্ধ আমার এখনও মনে আছে। কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এর ঘ্রাণ হতো একেবারে জিরার মতো। মন উতাল করা ঘ্রাণ। এ ঘ্রাণে আমার পন্ডিচেরির কথা মনে পড়ে যেতো আর আমি ভুলে যেতাম উদ্ধার পাবার চিন্তা। এ জিরার ঘ্রাণে পুরো পন্ডিচেরি শহর যেনো জীবন্ত হয়ে উঠতো আমার সামনে। (এখন জিরার ঘ্রাণ পেলে আমার প্রশান্ত মহাসাগরের কথা মনে পড়ে যায়)।

যখনই কোন হ্যান্ড ফ্লেয়ার বা রকেট ফ্লেয়ার ছুঁড়তাম, রিচার্ড পার্কার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকতো। ওর চোখদু'টি স্থির হয়ে থাকতো ফ্লেয়ারের উজ্জ্বল সাদা-গোলাপী আলোতে। আমি হাতে ফ্লেয়ারটা ধরে থাকতাম যতোক্ষণ এটা সম্পূর্ণ নিভে না যেতো। এর আঁচ এসে লাগতো আমার হাতে। এ আলোর উদ্ভাসে জড়ো হতো সাগরতলের যতো মাছ।

৭০

কচ্ছপের মাংস বের করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমি প্রথম যে কচ্ছপটি ধরেছিলাম সেটি ছিলো বাজপাখি চক্ষু। রক্তের জন্যই মূলত কচ্ছপ ধরার প্রতি আমার ঝোঁক ছিলো। আমার সব সময় মনে পড়তো তথাপঞ্জির সেই কথাগুলো—"কচ্ছপের রক্ত খুব ভালো, পুষ্টিকর এবং লবণহীন পানীয়।" আমি কচ্ছপটির শক্ত খোল এক হাতে ধরে অন্য হাতে এর পিছনের একটি পা ধরে ফেললাম। এটাকে পানির ওপর তুললাম এবং ভেলায় তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এটা এমন ধস্তাধস্তি করতে শুরু করলো যে ভেলায় তোলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো না। হয় এটাকে ছেড়ে দিতে হবে নইলে নৌকায় নিয়ে তুলতে হবে। তাকিয়ে দেখলাম এটা একটা মেঘহীন শুমোট দিন। রিচার্ড পার্কার নিশ্চয়ই আজ সূর্যাস্তের আগে তারপুলিন থেকে বেরুবে না।

আমি এক হাতে কচ্ছপের পা শক্ত করে ধরে অন্য হাতে নৌকার দড়ি ধরে টানতে লাগলাম। এটাকে নিয়ে নৌকায় ওঠা কঠিন ব্যাপার। অগত্যা এটাকে শূন্যে তুলে এক ঝটকায় তুলে শূন্যে উড়িয়ে ছুঁড়ে ফেললাম তারপুলিনের এপাশে। যেমন ভেবেছিলাম রিচার্ড পার্কার বাব দুয়েক ঘর ঘর শব্দ করে চুপ হয়ে গেলো। এ গরমে সে আর জায়গা থেকে নড়লো না।

এটির রক্ত খাওয়ার জন্য আমি ছিলাম অনেকটা মরিয়া। আমার আর তর সইছিলো না। তথাপঞ্জিটাকে রান্নার বইয়ের মতো অনুসরণ করছিলাম। সে অনুযায়ী এটাকে চিৎ করে শোয়ালাম। এরপর বলা হয়েছে গলায় ছুরি চালানোর কথা। কিন্তু তাকিয়ে এর গলা-মাথা কিছুই খুঁজে পেলাম না। খোলসের ভেতর এটি মাথাটা ঢুকিয়ে নিয়েছে। খোলসের ভেতর থেকে এটি আমার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছিলো। ছুরি দিয়ে সামনের পায়ে খোঁচা দিলাম যাতে মাথা বের করে। এতে এটা বরং মাথাটা আরও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো। সরাসরি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি এর মাথার গর্তে চাকুটা ঢুকিয়ে দিলাম। এটি মাথাটা আরো ঢুকিয়ে তারপর হাঁৎ মাথা বের করে আমাকে কামড়াতে চাইলো। ভয়ে লাফিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলাম। আমি ছোট কুড়ালটা তুলে নিলাম এবং এর মাথায় দিলাম এক কোপ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। আমি দাগকাটা পান পাত্র নিলাম এবং ৩০০ মিলিলিটার রক্ত নিলাম এতে যেমনটা বলা হয়েছে রক্তটার তেমন আলাদা কোন স্বাদ নেই। উষ্ণ পশুরক্তের মতো। আমি পুরো রক্ত খেয়ে নিলাম।

ভেবেছিলাম কুড়াল দিয়ে পেটের শক্ত খোলসটা কেটে বের করবো। কিন্তু ছোরার যেদিকে করাতের মতো সেদিক দিয়ে এ কাজ আরও সহজ হলো। ছুরির করাত মাথার দাঁত খোলসের সাথে আটকে এর অন্য মাথা খোলসের মাঝে রেখে কয়েকবার জোরে চাপ দিতে এটি খুলে এলো। এ কাজ করতে করতে ঘেমে জবজবে হয়ে গেলাম। পেটের খোলসটা খোলার সময় চুসনির মতো এক ধরনের শব্দ হলো। ভেতরের অংশ দেখতে পেলাম। ভেতরের সবকিছু তখনও নড়ছিলো—মাংসপেশি, চর্বি, রক্ত, হাড়। এক কোপে এর মাথাটা বিচ্ছিন্ন করলাম। তারপরও চার পা খুব জোরে তড়পাতে লাগলো। আমি এগুলো কেটে কেটে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। এবার বুক খোলা কচ্ছপটাকে ছুঁড়ে দিলাম রিচার্ড পার্কারের দিকে। এটা এমন ভীষণ করে তাকালো যে মনে হলো ছুটে আসবে। আমি দ্রুত ভেলায় পালিয়ে এলাম।

আমি লক্ষ্য করলাম এক তৃপ্তির আওয়াজ তুলে রিচার্ড পার্কার এটি সানন্দে খেতে শুরু করলো। কচ্ছপের পিছনে এতো পরিশ্রমের পুরস্কার ৩০০ মিলিগ্রাম রক্ত!

রিচার্ড পার্কারের বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুললো। সবমে সে তারপুলিনের তলা থেকে বেরোয় না এটা আর আমার জন্য যথেষ্ট ছিলো না। লকার এবং তারপুলিন পর্যন্ত আমার অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করতে হবে।

এখন সময় এসেছে আমার এলাকার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের।

৭১

আমার মতো যদি কেউ বিপদে পড়ে তবে তার করণীয় সম্পর্কে আমার পরামর্শ হচ্ছে—

১) এমন একটি দিন বেছে নিন যেদিনের ঢেউগুলো ছোট এবং একই ধরনের। আপনার জীবনতরীর পানির ওপরের অংশের বাইরের দিকের পরিচর্যা করুন, যেনো এটি ডুবে না যায়।

২) নোঙর ছেড়ে দিন পুরো মাত্রায়। এতে আপনার নৌকা কম দুলবে এবং অনেক আরামদায়ক হবে। আপনার জীবনতরীকে আপনার স্বর্গ করে গড়ে তুলুন। যদি পারেন তো আপনার কিছু দিয়ে ঢেকে নিন। কাপড়, কম্বল যা পান তাই দিয়ে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ অংশ ঢেকে নিন।

৩) এবার কঠিন কাজটি সারতে হবে। যে জন্তুটি আপনার যন্ত্রণার কারণ তাকে আহ্বান করুন। বাঘ, গণ্ডার, উটপাখি, বন্য শূকর, বাদামী ভালুক যে জন্তুই হোক না কেন আপনি এটিকে ছাগলে পরিণত করুন। এটা করার সেরা উপায় হচ্ছে আপনি আপনার সীমানার শেষ প্রান্তে গিয়ে নিরপেক্ষ অঞ্চলে চিৎকার করে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন। আমি এমনটি করেছিলাম। আমি তারপুলিনের প্রান্তে চলে গিয়েছিলাম এবং লাফিয়ে মাঝের বেঞ্চে গিয়ে পা দাপিয়ে জোরে জোরে বাঁশি বাজিয়েছিলাম। মনে রাখতে হবে যে শব্দ দিয়ে আপনি আপনার তাঁবিপত্র কায়েম করবেন দীর্ঘদিন ক্রমাগত এটিকে ঐ শব্দ দিয়ে ভয় ধরাতে হবে। কিন্তু আপনাকে সতর্ক হতে হবে। আপনার ভেতরের পশুটাকে জাগাবেন ঠিকই তবে এটিকে আক্রমণ করার জন্য নয়, শুধু ভয় দেখানোর জন্য। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না এটি আপনাকে আক্রমণ করে বসুক। এটি যদি আক্রমণ করেই বসে তবে (ঈশ্বর আপনার সহায় হোন) আর আপনার উপায় নেই। অচিরেই এটি আপনাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। আপনি চাইবেন জন্তুটি বিদেশী হোক, কুপিত হোক, বিরক্ত হোক, যন্ত্রণাকাতর হোক—শুধু যেন আক্রমণাত্মক না হয়। কোনো অবস্থাতেই আপনি এটির এলাকায় ঢুকবেন না। শুধু এর চোখের দিকে ভীষণভাবে তাকিয়ে একে ভয় দেখান।

৪) যখন আপনার জন্তুটি খেপে যাবে এটি যাতে আপনার এলাকায় ঢুকে না পড়ে তার ব্যবস্থা করুন। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে জোরে চিৎকার করে এটাকে পিছু হটতে বাধ্য করুন। মনে রাখবেন এ সময় ওর চোখ থেকে চোখ সরাবেন না। এটি যখন আপনার এলাকায় পা রাখবে মনে করুন আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। ওর পা কোথায় পড়লো সে ব্যাপারে খুঁতখুঁতে হবেন না। দ্রুত এর মুখোমুখি হোন। একে বুঝিয়ে দিন এর প্রতিবেশী সীমালঙ্ঘন পছন্দ করে না।

৫) যখন এটি আপনার সীমানায় ঢুকে পড়বে আপনি প্রতিরোধ করতে না গিয়ে পিছু হটুন এবং নিরাপদ এলাকায় চলে যান। জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে থাকুন এবং তৎক্ষণাৎ নৌকার নোঙরটা তুলে ফেলুন। এ দু'টি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নৌকার খোলা অংশ বরাবর

ঢেউ লাগাতে পারলে খুব ভালো হয়। যতো দ্রুত ঢেউয়ের দোলায় নৌকাটিকে দোলানো যায় ততোই ভালো।

৬) ক্রমাগত বাঁশি বাজিয়ে গেলে আপনার পরিত্যক্ত পশুটি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়বে। নৌকার প্রান্তে দু'দিকে পা দিয়ে নৌকাটা ক্রমাগত দোলাতে থাকুন। আপনার নৌকা যতো বড়োই হোক ক্রমাগত চেষ্টায় এটা দুলতে থাকবে। তবে লক্ষ্য রাখবেন নৌকাটা আবার ডুবে না যায়। আমি নিশ্চিত এতে আপনার নৌকা এলভিস প্রিসলির রক্ত এ্যান্ড রোল নাচের মতো দুলতে থাকবে। সেই সাথে বাঁশি বাজিয়ে যাওয়ার কথা ভুলবেন না।

৭) আপনার জন্তু তা সে বাঘ, গণ্ডার যাই হোক না কেন দোলাতে দোলাতে একে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত করুন। এর মুখ দিয়ে গাজলা উঠুক বমি করুক থামবেন না। এটির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইলেও বিচলিত হবেন না। আপনার নিজের যদি বমি আসে তাহলে তা বাইরে না ফেলে আপনার সীমানা রেখায় ফেলুন। বমি সীমান্য নির্ধারণে দারুণ কার্যকর।

৮) যখন দেখবেন আপনার জন্তুটি ভদ্র হয়ে গেছে এবং অসুস্থ তখন থামুন। সমুদ্রপীড়া দ্রুত আক্রান্ত করে, কিন্তু এর ঘোর কাটতে অনেক সময় লাগে। আপনার তখন আর বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না। এ অসুস্থতায় কেউ মারা যায় না বটে তবে এর আধিক্যে বাঁচার আগ্রহ চলে যেতে পারে। আবার নোঙর ফেলুন; এটির মাথার ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করুন। এটি যখন সুস্থ হয়ে উঠবে তখন যাতে পানি খেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। পারলে পানিতে সমুদ্রপীড়া নিরোধক ট্যাবলেট গুলে দিন। মনে রাখবেন এ অবস্থায় পানিশূন্যতা খুবই বিপজ্জনক।

৯) জন্তুটি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যান। বাঁশির শব্দে এবং দুলুনিতে এটি তখন এতোই ভীত হয়ে উঠবে যে এরপর যখনই এটির মেজাজ বিগড়ে যেতে চাইবে তখন কেবল বাঁশি বাজালেই চলবে। পশুটি এ অবস্থায় শুধু বাঁশি দেখলেই ভয় পাবে—এটি আর তখন বাজাতে হবে না।

৭২

রিচার্ড পার্কারকে বশ করার অনুশীলনে আমি আত্মরক্ষার জন্য কচ্ছপের খোল দিয়ে ঢাল বানিয়ে নিতাম। আমি খোলটির দু'পাশে দু'টি খাজ কেটে একটি দড়ি বেঁধে আমার ঢাল বানাতাম। ঢালটি আমার চাহিদার চেয়ে একটু বেশি ভারি হয়ে গেলো, কিন্তু যুদ্ধের সময় কোনো যোদ্ধা কি তার পছন্দমতো অস্ত্র বেছে নিতে পারে?

প্রথমবার যখন আমি আমার কর্তৃত্ব ফলাতে যাই রিচার্ড পার্কার দাঁত খিঁচে এগিয়ে এলো, ওর কানটা চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো, গলা খাকারি দিয়ে আক্রমণ করলো। সামনের পা পুরো তুলে মারলো এক থাবা। আমি ছিটকে পড়লাম পানিতে। কচ্ছপের ঢালটা পানিতে পড়ে সাথে সাথে তলিয়ে গেলো। আমি ভীষণ ভয় পেলাম। দ্রুত সাঁতরাতে থাকলাম ভেলাটার দিকে। মনের ভেতর আবার চাগিয়ে উঠলো হাঙরের ভয়। পড়িমরি করে সাঁতরাতে লাগলাম। ভেলায় উঠেই সমস্ত দড়িদড়া খুলে দিলাম। তারপর হাঁটুতে আর হাতের ভাঁজে মাথা গুঁজে প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকা শরীরটাকে বশে আনার চেষ্টা করলাম। এমন ভয় পেয়েছিলাম যে, এ কাঁপন থামতে অনেক সময় লেগেছিলো। সেদিন সারাদিন এবং সারারাত ভেলায় কিছু না করেই কাটালাম। কিছু খেলাম না, এমনকি পানিও ছুঁলাম না।

আরেকটি কচ্ছপ ধরার পর আমি আবার এটা করলাম। আমি এটার খোড়লে খাজ কেটে দড়ি বেঁধে আবার একটি ঢাল বানিয়ে নিলাম। এটা ছিলো আগেরটার চেয়ে একটু ছোট এবং হাল্কা। এতে বরং আমার সুবিধাই হলো। আমি আবার নৌকায় গিয়ে নৌকার মাঝবরাবর গিয়ে দাপাদাপি শুরু করলাম।

আমি আশ্চর্য হবো কেউ যদি আমার এ কাজটিকে পাগলামি এবং আত্মহত্যার চেষ্টা মনে না করেন। কিন্তু আমার উপায় ছিলো না। হয় এটাকে পোষ মানাতে হবে, প্রমাণ করতে হবে আমি উর্ধতন প্রাণী আর ও অধোস্তন নইলে হয়তো সমুদ্র উত্তাল হলে নৌকায় আশ্রয় নিলে ও আমাকে মেরেই ফেরবে।

আমি এ গভীর সমুদ্রে এটাকে পোষ মানাতে পেরেছিলাম কারণ রিচার্ড পার্কার আমাকে সত্যি সত্যি মারতে চায়নি। বাঘ, এমনকি কোনো পশুই তার আওতা প্রতিষ্ঠায় আক্রমণাত্মক হয় না। যখন কোনো পশু আক্রমণ করে তখন এটিকে মেরে ফেলার জন্যই আক্রমণ করে; কারণ তার ধারণা জন্মে তাকে মেরে ফেলা হবে। সরাসরি সংঘাতে যাওয়া ক্ষতিকর। কোনো না কোনো ক্ষতি হয়ই। তাই পারতো পক্ষে পশুরা সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। এজন্যই পশুদের মধ্যে রক্তারক্তি এড়াতে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দেয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে আর এরা এটা বুঝে উঠতে পারলে দেখা যায় দ্রুত পিছু হটছে। কোনো বাঘ কি তার এলাকায় অনুপ্রবেশকারীকে সাবধান না করে আক্রমণ করে?

রিচার্ড পার্কার চারবার আমাকে থাবা মেরেছিলো। চারবারই ডান পা দিয়ে। এবং চারবারই আমি কচ্ছপের ঢাল হারিয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর এ প্রতিটি আক্রমণের আগে, আক্রমণের সময় এবং আক্রমণের পরে আমি ভীষণভাবে ভয় পেতাম এবং ঘাবড়ে যেতাম। প্রতিটি আক্রমণের আগেই সে আমাকে সতর্ক করার জন্য আওয়াজ করতো। তার কান, চোখ, গোঁফ, দাঁত, লেজ, গলা আমাকে বলে দিতো সে কি করতে যাচ্ছে। সে পা তোলার আগেই আমি বুঝতে পারতাম যে সে আমাকে থাবা মারতে যাচ্ছে।

এর পরেই আমি শুরু করলাম নৌকা দুলিয়ে ওকে বমি করিয়ে ছাড়তে। সাথে ভীষণ জোরে এবং ক্রমাগত বাঁশি বাজিয়ে যেতাম। আর এতে রিচার্ড পার্কার গোঙাতে শুরু করতো, বমি করতো বা মুখে গাজলা তুলে পড়ে থাকতো নৌকার খোলে।

আমার পঞ্চম ঢালটি তাকে পুরোপুরি পোষ মানাতে পারা পর্যন্ত টিকে ছিলো।

৭৩

উদ্ধার পাওয়া ছাড়া আমার পরম আকাঙ্ক্ষা ছিলো একটি বই। এমন আশা করছিলাম যে বইটি এতো দীর্ঘ হবে যাতে এর গল্প না ফুরায়। এটি যেনো বার বার পড়া যায় এবং প্রতিবার নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন নতুন উপলব্ধিতে এটি পড়া যায়। কিন্তু হায় নৌকায় কোন বই-ই নেই। আমি যেনো বিধ্বস্ত রথে অসহায় অর্জুন যাঁর ওপর কৃষ্ণের কৃপা নেই। উদ্ধারের পর কানাডার হোটেলের কক্ষে বিছানার পাশে বাইবেল পেয়ে আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। পরদিনই আমি 'গাইডিয়ান'দের কিছু টাকা পাঠালাম তারা যেনো যে সমস্ত জায়গায় আক্রান্ত

যাত্রীরা কাটভোগ করছে তাদের যেনো বাইবেল পাঠায়। শুধু বাইবেল নয় অন্যান্য ধর্মীয় বইও যেনো পাঠায়। বিশ্বাস জড়িয়ে দেবার জন্য বইয়ের চাইতে ভাল মাধ্যম আর কী হতে পারে! উপাসনালয়গুলোর মানুষের মননে চাপ সৃষ্টির চেয়ে এটা ভালো মাধ্যম নয় কি? বই আপনাকে এমন ভদ্রভাবে আহ্বান করে যেনো এক বাক্সা মেয়ে চুমু খেয়ে বলছে—'হ্যালো'।

কমপক্ষে একটি ভালো উপন্যাস যদি পেতাম! কিন্তু ঐ তথ্যপঞ্জি ছাড়া আর কোনো বই ছিলো না। ওটা কতোবার যে পড়েছি—হাজারদশেক বার তো হবেই!

আমি একটি ডায়েরি লিখতাম। এটা এতো ছোট ছোট করে লিখেছিলাম যে, এখন এটার পাঠ উদ্ধার করা মুস্কিল। এতো মিতব্যয়ীভাবে সরু করে লেখা হয়েছে এখন এটা দেখলে চমৎকৃত হই। জাহাজডুবির সপ্তাহখানের পর থেকে আমি এটা লেখা শুরু করেছিলাম। কোনো দিন তারিখের উল্লেখ ছিলো না। এখন আশ্চর্য হই কী আশ্চর্যভাবে দিন কেটেছে। ডায়েরির প্রতি পাতায় কতো দিন, কতো সপ্তাহের ঘটনা লেখা! এটায় লেখা আছে কি কি ঘটনা ঘটেছে, আমি কি কি সমস্যায় পড়েছি, উদ্ধারে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি। আর আছে রিচার্ড পার্কারের কথা। আর এর সবই বাস্তব।

৭৪

এ চরম দুঃসময়ের নির্মম যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে আমি ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করতাম। মূর্তি ছাড়াই দর্শন করতাম, পূজা করতাম আর এ পূজার প্রসাদ হতো কচ্ছপের মাংস। কোনদিকে কিবলা না জানলেও পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়তাম আরবিতে সূরা পড়ে। এসব আমাকে প্রশান্তির পরশ বুলাতো। কিন্তু এটা ছিলো খুব শক্ত কাজ। মাঝে মাঝে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। মাঝে মাঝে মনে হতো আমার বিশ্বাসের বীজ প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় হারিয়ে যাবে।

মনের এমন সময় আমি নিজেকে উদ্ধারে উঠেপড়ে লাগতাম। জামা দিয়ে বানানো আমার পাগড়িটাকে ছুঁয়ে জোরে জোরে বলতাম—"এটা আল্লাহর টুপি।"

রিচার্ড পার্কারের দিকে আঙুল তুলে বলতাম, "এটা ভগবানের বিড়াল।"

আমি আমার প্যান্টটাকে পাট পাট করে চিৎকার করে বলতাম, "এটা ঈশ্বরের ভূষণ।"

জীবনতরীকে নির্দেশ করে বলতাম, "এটা আল্লাহর জাহাজ।"

দুই হাত প্রসারিত করে বলতাম, "এ হচ্ছে ঈশ্বরের বিশাল ভুবন।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে জোরে বলতাম, "ঐ হচ্ছে ঈশ্বরের কান।"

এইভাবে আমি আমার ভেতর ধর্মানুভূতি ফিরিয়ে আনতাম। কিন্তু আল্লাহর পাগড়ির পাক প্রায়ই খোলা থাকতো, ঈশ্বরের প্যান্ট পড়ে থাকতো। ভগবানের বেড়ালটা ছিলো জলজ্যান্ত বিপদ। ঈশ্বরের বিশাল ভুবন আমাকে মেরে ফেলছিলো। আল্লাহর নৌকা আমার জেলখানা। আর ঈশ্বরের কানকে মনে হতো কালা—আমার এতো ফরিয়াদ, শুনতে পায় না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার ভেতর জেগে ওঠা নেতিবাচক ধারণা সহসাই দূর হয়ে যেতো। ঠিক তখনই এক ঝাঁক মাছ ভেসে উঠতো বা আমার পরিবারে কথা মনে পড়ে যেতো আর ঈশ্বর ফিরে আসতেন আমার ভেতর।

৭৫

একদিন হঠাৎ দিনক্ষণ হিসেব করে মনে হলো এটা আমার মায়ের জন্মদিন। সেদিন জোরে জোরে আমি আমার মায়ের উদ্দেশে গেয়েছিলাম—"হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।"

৭৬

অচিরেই রিচার্ড পার্কারের বিষ্ঠা পরিষ্কারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। যখনই তার ভেতর পায়খানা করার লক্ষণ দেখতে পেতাম, আমি এটা পরিষ্কার করতে ছুটে যেতাম। এটা ছিলো খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কিন্তু আমাকে এটা করতেই হতো; অন্তত ওর স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনা করে। ওকে পায়খানা করতে দেখলেই কাছে ছুটে যেতাম। ওর পায়খানা করা শেষ হলেই হাতের কাঁচ দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তারপুলিনের কাছে নিয়ে আসতাম। এর বিষ্ঠা হয়তো জীবাণুতে গিজ গিজ করতো। জঙ্গলে প্রাণীদের বিষ্ঠা নিয়ে কেউ কখনো ভাবে না। প্রাণীরা তো নয়ই। যারা গাছে বাস করে তারা তো নিজ চোখে তাদের বিষ্ঠা দেখতেই পায় না। জীব-জন্তু তাদের নিজেদের বিষ্ঠা খেয়ে যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়ে তার জন্য চিড়িয়াখানায় এদের খাঁচা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। এর জন্য লোক আছে। একজন চিড়িয়াখানার মালিকের ছেলে হয়ে কোনদিন এর ধারে কাছেও আমাকে যেতে হয়নি। সেই অত্যন্ত জরুরি কিন্তু অস্বস্তিকর কাজ করতে হচ্ছিলো আমাকে নিজ হাতে। না, ওই সময় অস্বস্তি তো দূরের কথা, একটুও খারাপ লাগতো না। অবশ্য রিচার্ড পার্কার প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগতো এবং মাসে হয়তো একবার পায়খানা করতো। আরেকটা কারণে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে এ কাজ করতাম। প্রথম যখন রিচার্ড পার্কার নৌকায় পায়খানা করে তখন দেখলাম সে এটা সেটা দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে। এতে তার জীবাণু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। ওর পায়খানা আমি দেখতে পাবো, এর গন্ধ আমাকে বিব্রত করবে এতে যেনো ওর জাত যাচ্ছিলো। ওর এটা লুকানোর চেষ্টা অস্বাভাবিক, ভিন্ন এক আমার কাছে।

পায়খানা করার সময় ওকে খুব অসহায় লাগতো। সে নিচু হয়ে মাথা পিছনে খিচে কান ছড়িয়ে খুব কষ্ট করে এ কাজটি করতো। এ সময় তার মুখ দিয়ে ঘর ঘর শব্দ হতো। আমি কোঁচ দিয়ে ওর নাদা সরিয়ে আনতে আনতে বাঁশি বাজাতাম। এ সময় রিচার্ড পার্কার কখনো পিছনে তাকাতো না।

আমিও রিচার্ড পার্কারের মতো সমুদ্র জীবনের প্রথম থেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছিলাম। আমাদের আমিষ খাওয়া পড়ছিলো বেশি আর পানি খাওয়া হচ্ছিলো কম—এটাই বোধহয় এর অন্যতম কারণ। আমিও প্রায় মাসখানেক পর পর পায়খানা করতাম।

৭৭

রসদ ফুরিয়ে আসছিলো। আমি আমার খাবার কমিয়ে দিলাম। প্রতি আধ ঘন্টায় মাত্র দুটি বিস্কুট খাওয়া শুরু করলাম। সব সময় ক্ষুধা লেগেই থাকতো। যতো কম খেতাম ততোই আমার ক্ষুধা বেড়ে যেতো। মনে হতো পুরো ভারতের সমান খাবার পেলে যেনো আমার ক্ষুধা মিটতো। এক গঙ্গা ডাল, রাজস্থানের সমান চাপাতি, উত্তর প্রদেশের সমান এক বল ভাত, পুরো তামিলনাড়ু ডোবানো নারকেল আর হিমালয়ের সমান আইসক্রিম হলে যেনো আমার ক্ষুধা মিটতো।

প্রথম প্রথম মাছ ধরে এগুলোর চামড়া ছিলে কেটে কেটে খেতাম। কিন্তু ক্ষুধার চোটে অচিরেই চামড়াসহ মাছ খেতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম মুখে পিচ্ছিল লাগতো, কিন্তু পরে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। উড়াল মাছ আগে খেতাম না। এখন খাওয়া শুরু করলাম। গোলাপী-সাদা এ মাছগুলো খেতে বেশ লাগতো। ডোরাডো মাছ খুব পেটপুরে খেতাম। এগুলো ছিলো কড়া স্বাদের। আগে মাছের মাথাগুলো রিচার্ড পার্কারকে খেতে দিতাম বা মাছের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতাম। এখন এগুলো আমিই খেতে শুরু করলাম। একটা মজার ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেললাম। আগে শুধু মাছের চোখ থেকে সুস্বাদু রস খেতাম। এখন দেখি মেরুদণ্ডের রস আরও মজার। আগে কচ্ছপ ধরে ছুরি দিয়ে এর পেটের খোল ফেলে ছুঁড়ে দিতাম রিচার্ড পার্কারের জন্য। এখন ওগুলো আমার জন্য রসে ভরপুর এক বল অনন্য খাবার। এর মধ্যে প্রীহা, মাংস, চর্বি খুব মজা করে খেতাম।

কচ্ছপের খোলস আমার অনেক কাজে আসতো। এগুলো অচিরেই আমার নিত্য কাজের অনুষঙ্গ হয়ে উঠলো। এর খোলের ওপর রেখে মাছ কাটতাম। এর খোড়লে খাবার তৈরি করতাম। এগুলো পেটে-পিঠে-মাথায় লাগিয়ে রোদের হাত থেকে বাঁচতাম। পোশাক তো ছিঁড়েছিলোই, কম্বলগুলোও খসে খসে গিয়েছিলো। তাছাড়া ঢাল হিসেবে ব্যবহার তো করতামই। আমি যতো খেতে পারতাম ততোই আমার মনটা ভালো থাকতো।

বিস্কুটগুলো যখন একেবারেই শেষ হয়ে গেলো তখন বাছাবাছি একেবারেই বাদ দিলাম। যা পেতাম তাই খেতাম।

একবার তো রিচার্ড পার্কারের বিষ্ঠাই খেতে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ঘটেছিলো যখন খাবার ফুরিয়ে গিয়ে আমি কি খাবো, কি করে বেঁচে থাকবো এই চিন্তায় অস্থির। রিচার্ড পার্কারকে বালতিতে সোলার স্টিলের পানি দেয়ার পর ও এক চুমুকে শেষ করে তারপুলিনের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। ফিরে আসার সময় রুটিনমতো লকারের কাছে যেতেই কিসের যেনো গন্ধ পেলাম। তারপুলিনের নিচে তাকিয়ে যথারীতি রিচার্ড পার্কারের দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। তাকিয়ে দেখি আমার দিকে পিছন ফিরে রিচার্ড পার্কার পায়খানা করবে করবে ভাব। আমার কী যে হলো—ভেতরের ক্ষুধাটা চাগিয়ে উঠলো যেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলে ও হয়তো টেরই পাবে না। দুই হাতে ক্রিকেট বল ক্যাচ ধরার মতো কাপ বানালাম এবং আমার হাতের কাপ এগিয়ে ধরলাম ওর পাছার তলায়। গরম একনাদা পড়তেই হাতদুটো সাবধানে সরিয়ে আনলাম। পিচ্ছিল, কিন্তু ভারি শক্ত। মনে হচ্ছে গুলতিতে ভরে ছুঁড়ে মারলে গণ্ডার মারা যাবে। পানিতে একটু ধুয়ে নিয়ে মুখের কাছে ধরলাম। স্বাদ হয়তো খুব একটা খারাপ ছিলো না—কিন্তু

আমার মুখ বেঁকে বসলো। থুথু করে ফেলে দিলাম। ওই মুহূর্তে রিচার্ড পার্কার আবার কোৎ দিতেই ওর নাদাগুলো আবার একইভাবে হাতে নিলাম। তবে এবার আর মুখে নয়—ছুঁড়ে ফেললাম পানিতে, মাছদের জন্য।

অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার শরীর বিগড়ে গেলো। পা এবং গোড়ালি ফুলে গেলো। দাঁড়াতে খুব কষ্ট হতো।

৭৮

আকাশ যে কতো রকম হতে পারে! কতো রঙে কতোভাবে যে আকাশ নিজেকে সাজায় তা বোধহয় সমুদ্রে পড়া মানুষ না হলে বুঝতেই পারতাম না। কখনও এটি বড়ো বড়ো সাদা মেঘে ঢাকা থাকতো। কখনও একেবারে মেঘহীন, স্বচ্ছ। কখনও মেঘের কম্বলে ঢাকা, ভ্যাপসা গরম অথচ বৃষ্টির দেখা নেই। আবার কখনও বা ছোট ছোট সাদা মেঘের ভেলা। কখনও পেজা তুলার মেঘ ছুটে যাচ্ছে। কখনও আকাশ কালো করে মেঘ তাকে ঢেকে দেয়—শুরু হয় বৃষ্টি।

সমুদ্রেরও কতো রূপ! কখনও এটি বাঘের মতো গর্জন করতে থাকে। কখনও এটি এমনভাবে ফিসফিস করে যে মনে হবে আপনার কোনো বন্ধু কানে কানে কোনো গোপন কথা বলছে। কখনও এটি পকেটে ভাঙতি পয়সার মতো টুং টাং আওয়াজ করে। কখনও মনে হয় পর্বত থেকে কোনো হিমবাহ গড়িয়ে পড়ছে। একসময় মনে হবে কোন মিস্ত্রি কাঠে শিরীষ কাগজ ঘষছে। কখনও মনে হবে কেউ বমি করছে। আবার কখনও একে মনে হবে মৃত, স্থির।

আর এই আকাশ আর সাগরের মাঝে আছে বাতাস। আর আছে রাতের পর রাত এবং চাঁদ।

একজন সমুদ্রে পড়া মানুষকে মনে হবে এক বিশাল বৃত্তের মাঝে কেন্দ্রবিন্দু।

এরা কতো দ্রুতই না রূপ বদলায়। ফিসফিস করা সমুদ্র হয়ে ওঠে গর্জনশীল, স্বচ্ছ নীল আকাশ হয়ে ওঠে কালো মেঘে ঢাকা ভয়ঙ্কর—কিন্তু ভূগোল বদলায় না। সমুদ্রে পড়া মানুষের ভাগ্য বদলায় না। প্রকৃতির রূপ বদলের সাথে সাথে ভোগান্তির রূপ বদলায় শুধু।

যখন দিনের পর দিন রোদেলা আকাশ, মেঘের চিহ্ন নেই আপনি হয়তো এর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে হয়তো খুশিই হবেন যে এতে আপনার ঝুলিয়ে রাখা মাছ আর মাংসের ফালি শুঁটকি হচ্ছে। আপনার সোলার স্টিলে দেখুন দ্রুত বিশুদ্ধ পানি জমছে। আবার যখন দিনের পর দিন বৃষ্টিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন—ভেবে দেখুন আপনার নোনা শরীর ধুয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি, বৃষ্টির পানি ধরে জমিয়ে রাখতে পারছেন। এমন করেই প্রাকৃতিক সবকিছুরই ভালো এবং মন্দ দু'দিকই আছে।

ভেলায় ভাসা জীবন কি জীবন! এতো জীবনের শেষ! দাবা খেলার শেষের অবস্থা, অল্প কটা ঘুঁটি দিয়ে শেষ চাল পর্যন্ত কোনো মতে টিকে থাকা। সেখানেও আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন যখন দেখবেন পায়ের তলায় পড়ে আছে ছোট এক মরা মাছ।

৭৯

রোজই নানারকম হাঙর আসতো। এর বেশিভাগই ছিলো ম্যাকো এবং নীল হাঙর। আমাকে ভড়কে দিয়ে কালো পানি থেকে একদিন উদয় হয়েছিলো এক টাইগার হাঙরের। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হচ্ছে এদের আসার সময়। তবে এগুলো আমাদের তেমন কোনো অসুবিধা করেনি। মাঝে মাঝে তারা অবশ্য লেজ দিয়ে নৌকায় আঘাত করতো। আমি মনে করতাম না এগুলো কোনো দুর্ঘটনা ছিলো। বরং এ ছিলো মাছেদের এক ধরনের খেলা। কচ্ছপ এবং অন্যান্য মাছও এটি করতো। এরা যখন এরকম তেজ দিয়ে নৌকায় আঘাত করতো তখন কুড়াল দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলেই এরা অদৃশ্য হতো।

আমি ছোট ছোট অনেক হাঙর ধরেছিলাম। এর বেশিরভাগই ছিলো নীল হাঙর। কয়েকটা ম্যাকোসও ধরেছিলাম। এদের সবক'টিকেই ধরেছিলাম সূর্যাস্তের পর এবং নৌকা থেকে খালি হাতে।

আমার ধরা প্রথম ম্যাকোসটাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো—চার ফুট। নৌকার সামনের গলুইয়ের কাছ দিয়ে এটি বেশ কয়েকবার এলো এবং গেলো। আবার যখন এটি নৌকার গলুইয়ের তলা দিয়ে যাচ্ছে আমি খপ করে এর লেজের উপরের অংশ ধরে ফেললাম। এর চামড়া বেশ খসখসে বলে শক্ত করে ধরতে পারলাম। কি করতে যাচ্ছি ভালোমতো চিন্তা না করেই এটিকে টেনে তুললাম। যখন এটিকে তুললাম এমনভাবে লাফালো এবং ঝামটা দিলো—মনে হলো আমার হাতটাই খুলে যাবে। আমাকে ভড়কে দিতে এটি পানি ছিটালো মুখ দিয়ে। এক মুহূর্তের জন্য বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম কি করতে হবে। শেষে বেদিশা হয়ে দিলাম ছুঁড়ে রিচার্ড পার্কারের দিকে। আকাশ থেকে এটি রিচার্ড পার্কারের কাছে গিয়ে পড়লো। এটা ধপ করে পড়েই ভীষণভাবে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করলো। রিচার্ড পার্কার চমকে গেলো। সাথে সাথে সেও আক্রমণ করলো। যেন একটা মহাযুদ্ধই শুরু হয়ে গেলো। প্রাণিবিদ্যার তথ্য অনুযায়ী একটি বাঘ কখনও কোনো হাঙরকে প্রথমে দাঁত দিয়ে আঘাত করে না। রিচার্ড পার্কার থাবা দিয়ে এটির ওপর বণবাদ্য বাজাতে শুরু করলো যেন। হাঙরটাও এতো জোরে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করলো যে ভয়ে আমি রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলাম। ম্যাকোর বড়ো হা দেখে রিচার্ড পার্কার খেপে গেলো আরও। সে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করতে লাগলো। মনে হলো আগুনের গোলা এসে লাগলো আমার কানে। পরে জেনেছিলাম ঐ সময় ১৫০ মাইল দূর দিয়ে যাওয়া এক জাহাজের পর্যবেক্ষক এটাকে বিড়ালের ডাক মনে করে লগ খাতায় লিখে রেখেছিলো। রিচার্ড পার্কারের গর্জন ছিলো ভয়ঙ্কর।

রিচার্ড পার্কার ধস্তাধস্তিতে তার বাম পায়ে জখম হয়েছিলো। কিন্তু এটা স্থায়ী জখম ছিলো না, কারণ ওর কোন নখর বা আঙুল খোয়া যায়নি। আর ম্যাকোর লেজ এবং মাথা ছাড়া শরীরের আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিলো না। রিচার্ড পার্কার এটির মাংস তেমন খেলোই না বলা চলে। শুধু লেজ আর মাথার কাছ থেকে কিছুটা খেলো। বাকি মাছ পড়েই থাকলো আর রোদে শুকাতে থাকলো। শেষে আমি কোঁচ দিয়ে টেনে নিয়ে এলাম।

খাবো কিনা সংশয় হচ্ছিলো। শেষে লেজ মাথা বাদে বাকিটা ফালি করার সময় খেয়ে দেখি খারাপ নয় খেতে।

এরপর থেকে শুধু ছোট হাঙর ধরতাম। তাও শুধু আমার নিজের জন্য। এদের চোখ দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে দ্রুত এদের কব্জা করা যেতো। বাকি কাজ সারতাম হাত কুড়াল দিয়ে।

৮০

আমি অনেক ডোরাডো মেরেছি। কিন্তু একটা ডোরাডো মারার স্মৃতি এখনও আমাকে উজ্জীবিত করে। কোনো এক মেঘলা দিনের সকালবেলা। উড়াল মাছের ঝড় উঠেছে। রিচার্ড পার্কার উড়াল মাছ দু'হাতে সামলাচ্ছে আর খাচ্ছে। আমি একটা কচ্ছপের খোল দিয়ে মুখ ঢেকে উড়াল মাছের আক্রমণ ঠেকাচ্ছিলাম। একটি কোঁচের সাথে জাল গেঁথে। ভেবেছিলাম এটি দিয়ে মাছ ধরবো। কিন্তু খুব একটা সুবিধা হচ্ছিলো না। যে ডোরাডোটা উড়াল মাছ দাবড়ে আনছিলো সেটি পানি থেকে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু এর হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেলো। ভড়কে যাওয়া উড়াল মাছটা অল্পের জন্য জালে আটকালো না। কিন্তু ডোরাডো মাছটা হিসেবে একটু ভুল করলো। এটি কামানের গোলার মতো নৌকার মাথাকাঠের ওপর গোত্তা খেয়ে পড়ে ছিটকে পড়লো তারপুলিনের ওপর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো এর শরীর থেকে। একটি হাঙরকে ডিঙিয়ে ধেয়ে গেলাম এর দিকে। ডোরাডো মরে গিয়েছিলো বা আধমরা ছিলো, আর নানা রঙে নিজের রঙ বদলাচ্ছিলো। 'দারুণ! দারুণ!' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গিয়ে ধরলাম এটাকে। এটা ছিলো মোটা এবং মাংসল। এটার ওজন ৪০ পাউন্ডের কম হবে না।

কিন্তু হায়! রিচার্ড পার্কারের নজর পড়ে গেলো এর ওপর। ওর বড়ো মাথাটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি চোখের কোনা দিয়ে এটিকে দেখছিলাম। এখনও উড়াল মাছ উড়ে আসছিলো। কিন্তু ওর দেখলাম ওদিকে খুব একটা আগ্রহ নেই। আমার হাতের মাছের দিকেই ওর নজর। সে আমার থেকে মাত্র ৮ ফুট দূরে। তার মুখ অর্ধেক হা করা, যার ভেতর এখনও একটা মাছ দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর পাছাটা গোল হয়ে উঠছিলো, লেজ নড়ছিলো। এটা স্পষ্ট এটা আমাকে আক্রমণ করতে আসছে। পালিয়ে যাওয়ার সময় নেই। এমনকি গলা থেকে বাঁশি মুখে নেয়াও সম্ভব ছিলো না। আমার সময় শেষ।

কিন্তু অনেক হয়েছে, আর কতো? আমি ছিলাম ভীষণ ক্ষুধার্ত। না খেয়ে আপনি কতোদিন থাকতে পারবেন?

ক্ষুধা আমাকে হিংস্র করে তুললো। আমি রুখে দাঁড়ালাম। সোজা ওর চোখের দিকে তাকালাম ভীষণ ক্রুদ্ধতায়। চিড়িয়াখানার জ্ঞান থেকে জানতাম যদি হরিণ বা এন্টিলোপও বাঘের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে তো এটা আক্রমণ করে না। আমি চোখ সরালাম না। শেষপর্যন্ত মনোস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে আমিই জিতলাম। বাঘটা রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছু হটলো। আমি ভেলায় নিয়ে গেলাম মাছটা। অবশ্য সেখান থেকে একটা বড়ো অংশ ওকে দিতে ভুললাম না।

সেদিন থেকে বাঘটির ওপর আমার পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হলো। তখন থেকে আমি নৌকায়ই বেশি সময় কাটাতাম। তারপুলিনের ওপর এর গোটানো কুণ্ডলীতে কনুইতে ভর দিয়ে শুয়ে থাকতাম। কিছুদিন পর তো মাঝখানের বেঞ্চে শুয়ে থাকতাম। আমার কখনও কখনও রিচার্ড পার্কারের এলাকায় গিয়েও পড়তো।

৮১

আমি জানি আমার এভাবে বেঁচে থাকা অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি নিজেও যখন চিন্তা করি, এর কোনো খেই পাই না।

রিচার্ড পার্কার সমুদ্রে মানসিকভাবে দুর্বল এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না আমার বেঁচে থাকার। আমি ছিলাম ওর খাদ্য এবং পানীয়ের সরবরাহকারী। মনে রাখা দরকার, ও একটা চিড়িয়াখানার প্রাণী। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ও চিড়িয়াখানার বাসিন্দা। জঙ্গল জীবন ওর অজানা। যখন বৃষ্টি হতো এবং পুরো নৌকাটাই বৃষ্টির পানির পাত্রে পরিণত হতো—ও বুঝতে পারতো কোত্থেকে এ পানি আসে। উড়াল মাছের ঝাঁক যখন আসতো সে লুকানোর জন্য কোনো জঙ্গল খুঁজে পেতো না এবং পানি খাবে কোন নদী থেকে জানতো না। এখনও আমি ওর খাদ্য এবং পানীয়ের যোগানদাতা। এর প্রমাণ: আমি এখনও বেঁচে আছি। প্রমাণ: সে আমাকে আক্রমণ করেনি এমনকি তারপুলিনে ঘুমিয়ে থাকার সময়ও নয়। প্রমাণ: আমি আপনাকে গল্পটা বলছি।

৮২

আমি বৃষ্টির পানি এবং সোলার স্টিলে যে পানি পেতাম তা ৫০ লিটারের তিনটি প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে লকারে রাখতাম। সাবধান থাকতাম রিচার্ড পার্কার যেনো কোনোভাবেই এগুলো দেখতে না পায়। ওই ব্যাগ তিনটি আমার কাছে সোনা, নীলকান্তমণি, রুবি এমনকি হীরার চেয়েও মূল্যবান ছিলো। আমি সব সময় এগুলোর জন্য উদ্বিগ্ন থাকতাম। ভয়ে ভয়ে থাকতাম লকার খুললেই হয়তো দেখতে পাবো এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য এগুলোকে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে নৌকার ধাতব তলের সাথে ঘষায় ঘষায় এগুলো ক্ষয়ে না যায়। পারতোপক্ষে এগুলোকে সরানড়া করতাম না—ছিঁড়ে যাবার ভয়ে। পানি যখন পর্যাপ্ত থাকতো। অর্থাৎ ক্রমাগত বৃষ্টিতে পানি যখন উদ্বৃত্ত থাকতো আমি বালতিগুলো এবং অন্যসব পাত্র ভরে পানি রাখতাম।

রিচার্ড পার্কারকে পানি দেবার সময় আমি কিছু সমুদ্রের পানি মিশিয়ে দিতাম। যখন দিনের পর দিন খরা যেতো তখন কোনো কোনো দিন রিচার্ড পার্কার মাথা নুইয়ে দু'-এক চুমুক পানি খেয়েই ফেলতো। কিন্তু ভয়ে খুব তাড়াতাড়িই এ অভ্যাস বদলে ফেলেছিলো।

এখনও আমরা পানির ব্যাপারে বড্ডো হিসেবি। আমাদের পুরো যাত্রায় খাবার পানির চিন্তা সব সময়ই আমাদের উদ্বিগ্ন করে রাখতো।

খাদ্য যা কিছুই সংগ্রহ করতাম, রিচার্ড পার্কারের জন্য বরাদ্দ থাকতো বড়ো অংশ। যখনই কোন কচ্ছপ, ডোরাডো বা হাঙর ধরতাম ও কটমটিয়ে চেয়ে থাকতো। ওকে দিলে তবে ও শান্ত হতো। আমার ধারণা কচ্ছপের পেটের খোল কেটে মাংস বের করার ক্ষেত্রে আমি বিশ্ব রেকর্ড করে ফেলেছি। মাছের ক্ষেত্রেও ওরকমটিই হবে। তাজা লাফ পাড়তে থাকা মাছ কি দক্ষতায় যে ধরে টুকরো টুকরো করে কাটতাম! কাটার সময় ভুলে যেতাম ছিটকে এসে আমার গায়ে

বিঁধলো, নাকি রিচার্ড পার্কারের দিকে চলে গেলো। আর রিচার্ড পার্কার তো তার সীমানায় দাঁড়িয়ে সব সময় পা ঠুকতো এ সময়। এখন ভাবলে অবাক হই, দিনের পর দিন কিভাবে জন্তুর মতো এভাবে আমি কাঁচা মাছ খেয়েছি।

৮৩

একদিন দুপুরে ঝড় উঠলো। ভয়ঙ্কর মেঘগুলোকে মনে হচ্ছিলো বাতাসের আগে ছুটে আসছে। নিমিষে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলো। দ্রুত সোলার স্টিল আর জাল নৌকায় তুলে ফেললাম। ওহ, কী ভয়ানক সে দৃশ্য, যদি দেখতেন! সে দৃশ্য স্মরণ করে এখনও চোখ বুজলে শুধু দেখতে পাই পানির পাহাড়। না, না, পানির পর্বত। আমরা আমাদের যে পানির উপত্যকায় প্রত্যক্ষ করেছি তা যে কতো গভীর! নৌকাটা মনে হচ্ছিলো এই বিশাল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে সার্ফিং করছে। ভেলাটার অবস্থা ছিলো আরও শোচনীয়। আমি দ্রুত ভেলাটা নৌকায় তুলে দুটি নোঙরই পুরো দৈর্ঘ্যে ছেড়ে দিলাম। দুটোর দৈর্ঘ্যে কিছুটা তারতম্য রাখলাম যাতে প্যাঁচ খেয়ে না যায়।

পর্বতের মতো ঢেউয়ের মাথায় যখন নৌকাটা উঠছিলো তখন এ নোঙর দুটিকে মনে হচ্ছিলো পর্বতারোহীর কোমরে বাঁধা দড়ি। ফেনাওঠা সাদা মাথার ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছিলো নৌকাটা। তখন চারদিকে মাইলখানেক এলাকা দেখতে পাচ্ছিলাম, কেবল ঢেউ আর ঢেউ। এবার নামার পালা—যেনো অতল গহ্বরে নেমে যাচ্ছি, যেন এ গহ্বরে তলিয়ে যাবে সমস্ত তারকারাজি নক্ষত্র। এই আবার ক্রমশ উঠে যাচ্ছি ঢেউয়ের মাথায়। মনে হচ্ছে নোঙরের দড়ি ছিঁড়ে যাবে।

এ নোঙরগুলো খুব কাজে দিয়েছিলো। প্রতিটি ঢেউ এসে মনে হচ্ছিলো আমাদের উড়িয়ে ভাসিয়ে নেবে। শুধু দুদিকে দুটো নোঙর আছে বলে রক্ষা। যখন একটি ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো আমাদের ওপর আমি কোনোরকমে নৌকা ধরে আকড়ে থাকলাম, নইলে ভেসে গেছিলাম প্রায়। রিচার্ড পার্কার ভয়ে গর্জন করে উঠলো। এখন আমার সামনে মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। এখন আমাকে বেছে নিতে হবে পানির হাতে মরবো, নাকি পশুর হাতে। আমি পশুর হাতে মৃত্যুকে সঁপে দিলাম।

ঢেউটা যখন আমাদের নৌকার পিছন দিয়ে বয়ে গেলো, আমি বিদ্যুত গতিতে লাফিয়ে গিয়ে তারপুলিনের কুণ্ডলী খুলে ফেললাম। দ্রুত এটা নৌকার দুপাশের হুকগুলোতে লাগিয়ে দিলাম। দর্জির সেলাই মেশিনের দ্রুততায় যেন কাজটা সারলাম। নৌকাটা আবার উপরে উঠে যাচ্ছে, শরীরে ভারসাম্য বজায় রাখা মুশকিল হলো। এখন নৌকাটা পুরোপুরি তারপুলিনে মোড়া। শুধু আমার এদিকটা ছাড়া। আমি পাশবেঞ্চ এবং তারপুলিনের ভেতর শরীর গলিয়ে দিয়ে কুঁকড়ে থেকে বাকি তারপুলিন মাথার ওপর দিয়ে টেনে ধরে থাকলাম। চারটি মাত্র হুকে তারপুলিন পরাতে পারিনি। আমি এক হাত বাড়িয়ে দড়ি টেনে টেনে হুকে পরাতে চেষ্টা করতে থাকলাম। একটায় পরানোর পর অন্যটায় পরানো আরো কঠিন হয়ে পড়ছিলো। আরো দুটো হুকে তারপুলিন পরালাম। নৌকাটা আবার উঠে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায়। নেমে যাওয়ার সময়

প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী কোণে নামছিলাম। হাত দড়িতে পেঁচিয়ে ধরে আরও একটি হুকে দড়ি পরালাম। এ কাজগুলো করতে হয় নৌকার বাইরে থেকে। কিন্তু আমাকে করতে হচ্ছে ভেতর থেকে। আমি দড়ি ধরে জোরে টান দিলাম। নৌকাটা যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে নামছিলো তখন আমার কাজ করতে সুবিধা হচ্ছিলো। যখন ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছিলাম তখন আমরা ছিলাম ষাট ডিগ্রী কোণে। ঢেউয়ের একটা ছোট অংশ আমাদের ওপর আছড়ে পড়লো। মনে হলো নাকে মুখে কেউ যেনো সজোরে ঘুষি মারলো। পুরো নৌকাটা উপরে উঠে গেলে আমাদের অবস্থা হলো উল্টোমুখী। সবকিছু বিপরীত দিকে। আমার অবস্থান এখন নৌকার একেবারে তলায়। নৌকায় যে পানি জমেছে তাতে ভেসে বাঘটা এসে কখন গায়ে গায়ে লেগেছে বুঝতে পারিনি। তারপুলিনের নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু আমরা পরের ঢেউয়ের ঢালে যেতেই আমি আধা ডোবা ডুবে গেলাম।

বাকি দিন এবং রাত শুধু ঢেউয়ের দোলায় উঠতে থাকলাম এবং নামতে থাকলাম। যতোক্ষণ না ভয়ঙ্কর দৈত্যটা আমাদের প্রায় অবশ করে দিলো ততক্ষণ এটা চলতেই থাকলো। আমি এক হাতে তারপুলিনের দড়ি এবং অন্য হাতে পাশবেঞ্চটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলাম সটান। পানি ঢুকছিলো এবং বেরুচ্ছিলো। কচ্ছপের ধারালো খোলের ঘষায় কতো জায়গায় যে ছড়ে গেলো ইয়ত্তা নেই। ঝড়ের গর্জন এবং বাঘের গর্জন ক্রমাগত চলতে থাকলো।

মাঝরাতের কোনো এক সময় মনে হলো ঝড় থেমেছে। আমরা তখন স্বাভাবিক দোলায় দুলছিলাম। তারপুলিনের এক ছেঁড়া অংশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম রাতের আকাশ তারাময় এবং মেঘমুক্ত। আমি তারপুলিনের ফাঁক গলে নৌকার ওপরে উঠে শুয়ে পড়লাম।

ভোরের আলো ফুটলে দেখলাম ভেলাটা ভেসে গেছে। শুধু দুটো বৈঠা আর তাদের সাথে বাধা একটা লাইফ জ্যাকেট টিকে আছে। কোন বাড়ি পুড়ে গেলে যেমন তার একটি দু'টি খুঁটি ঠিকে থাকে—কালো, ভুতুড়ে অবস্থায়—এ দুটোর অবস্থাও তেমনি। আমি দিগন্তের চারদিক নজর ঘোরালাম—না, কিছুই নেই। আমার ছোট্টো সাগর-শহর হারিয়ে গেছে। শুধু নোঙর দুটো আমাদের রক্ষা করে এখনও টিকে আছে। ভেলাটার হারিয়ে যাওয়া মানসিকভাবে আমার কোমর ভেঙে দিলো যেন।

নৌকার অবস্থা শোচনীয়। তারপুলিন অনেক জায়গায় ছিড়ে গেছে। কিছু জায়গা ছিঁড়েছে রিচার্ড পার্কারের নখের খোঁচায়। আমাদের বেশিরভাগ খাবারই ভেসে গেছে। সমস্ত শরীর ছিঁড়ে যাওয়া ছাড়াও আমার উরুতে বেশ বড়ো একটা জখম হয়েছে। মাংসের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। লকার খুলতে ভয় পাচ্ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনটি পানির ব্যাগই বহাল তবিয়তে আছে। লকারে জাল এবং সোলার ষ্টিলগুলো ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। ওগুলোর চাপে পানির ব্যাগ হড়কে যেতে পারেনি।

বিধ্বস্ত এবং ঘোর লাগা অবস্থাতেই তারপুলিন খুলতে শুরু করলাম। রিচার্ড পার্কার এতো চুপচাপ পড়েছিলো যে আমি ভেবেছিলাম ও ভেসে গেছে। কিন্তু না! সে আছে। আমি মাঝের বেঞ্চ পর্যন্ত তারপুলিন খুলতেই তার ওপর দিনের আলো পড়লো। সে ভীষণ করে তাকালো এবং গর্জে উঠলো। সে পানি থেকে উঠে এলো এবং পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলো। আমি সুঁই সুতা নিয়ে তারপুলিন সেলাই করতে লাগলাম।

পরে আমি একটি বাকেটে দড়ি বেঁধে নৌকা সেচতে শুরু করলাম। আমি যা কিছুই করছিলাম তাতেই যেন সে বিরক্ত হচ্ছিলো। দিনটা ছিলো গরম এবং আমি ধীরে ধীরে কাজ

করতে থাকলাম। একবার লম্বা করে পানি সেচতে গিয়ে মনে হলো কিছু একটা হারিয়েছি। আমি এবং আমার মৃত্যুর মাঝে যা আমার হাতের তালুতে দোল খেতো কমলা রঙের বাঁশিগুলোর সেই শেষ বাঁশিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

৮৪

তারপুলিনের ওপর কম্বল জড়িয়ে শুয়েছিলাম। ঘুমাচ্ছিলাম, স্বপ্ন দেখছিলাম, জেগে উঠছিলাম, দিবা স্বপ্ন দেখছিলাম আবার চোখ লেগে আসছিলো—এভাবেই বয়ে যাচ্ছিলো সময়। স্বাভাবিক গতিতে বাতাস বইছিলো। মাঝে মাঝে নৌকার তলা আর ঢেউয়ের চূড়ার সংঘর্ষে ছিটকে আসছিলো পানি। রিচার্ড পার্কার পড়েছিলো তারপুলিনের তলায়। তার মনে হয় কিছুই ভাল লাগছিলো না। কিন্তু আকাশ ছিলো নীল, উষ্ণ ছিলো হাওয়া আর সমুদ্র ছিলো স্বাভাবিক। হঠাৎ এক প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ খুলে দেখলাম আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে যেনো পানি। আমি আবার উপরে তাকালাম। আকাশ নীল, স্বচ্ছ, মেঘহীন। আবার প্রচণ্ড শব্দ, তবে আগেরটার মতো জোরালো নয়। শব্দটা হলোা আমার বাঁয়ে। রিচার্ড পার্কার ভয়ে গর্জে উঠলো। আরও পানি ছিটে এসে লাগলো গায়ে। একটি বিদঘুটে গন্ধ লাগলো নাকে।

নৌকার কিনার দিয়ে নিচে তাকালাম। প্রথমে যা আমার নজরে পড়লো তা হচ্ছে পানিতে ভাসমান একটি কালো বস্তু। এটা কি বুঝে উঠতে আমার দু'-তিন সেকেন্ড সময় লাগলো। এর পাশে ধনুকাকৃতির একটি ভাঁজ আমার নজর কাড়লো। এটা একটা চোখ। আমার মাথার সমান। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা ছিলো একটি তিমি।

রিচার্ড পার্কার তারপুলিন থেকে বেরিয়ে এলো। তিমিটাকে দেখে সে হিস্ হিস্ করে উঠলো। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড সে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর ডুব দিয়ে তলিয়ে গেলো। আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম এটি হয়তো এর লেজ দিয়ে আমাদের আঘাত করবে। কিন্তু এটি ডুব দিয়ে গভীর নীলে তলিয়ে গেলো আর উঠলো না। এটির লেজ গোল, অনেকটা অংকের বন্ধনী চিহ্নের মতো আর এতো বিশাল ছিলো যে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

আমার ধারণা তিমিটা সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। আমার আকার দেখে ওর বোধহয় পছন্দ হয়নি। তাছাড়া আমার যে সঙ্গী আছে, রিচার্ড পার্কার তা দেখেও হয়তো ওর মোহ ভঙ্গ হতে পারে।

এরপর আমরা বেশকিছু তিমি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রথম তিমিটার মতো আর কোনো তিমি এতো কাছাকাছি আসেনি। এছাড়া ডলফিন তো প্রায়ই আসতো। আর ওরা আসতো দলবেঁধে। একবার তো একদল ডলফিন পুরো একদিন এবং একরাত আমাদের সাথে সাথে থেকেছিলো। আমি একটা ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এরা নৌকার ততো কাছ দিয়ে চলতো না যে কোঁচ দিয়ে মারতে পারি। তাছাড়া এগুলো ছিলো বেশ বড়ো।

ছ'টি পাখি দেখেছিলাম। প্রতিটি পাখি দেখেই খুশি হয়ে উঠতাম—এই বুঝি কূলের কাছে এসে পড়েছি। কিন্তু প্রতিবারই আমাকে হতাশ হতে হয়েছিলো।

এলবাট্রাস দেখেছিলাম দু'বার। এরা অনেক উপর দিয়ে আমাদের না দেখেই চলে গিয়েছিলো। আমি হা করে তাকিয়ে থেকে দেখেছিলাম। আমার কাছে এগুলোকে স্বর্গীয় দূত মনে হয়েছিলো।

অবশেষে ছোট লেজের একটি সয়্যারওয়াটার পাখি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। এটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে দিতে এসে পানিতে বসলো। এটা এতো হাল্কাভাবে বসেছিলো যে মনে হচ্ছিলো সোলা ভাসছে। আমি বড়শিতে টোপ গেঁথে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম দু'বার কাছে যায়নি। অবশেষে তৃতীয়বার টোপটা গিয়ে পড়লো ওর অনেক কাছে। পাখিটা টোপ গিলতে পানির মধ্যে মাথা ডোবালো। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে যখন টান দিলাম বড়শিতে এটি ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উড়ে পালালো। পড়ে রইলো শুধু এর কয়েকটা পালক।

অচিরে পাখি ধরার আরও সহজ সুযোগ পেয়ে গেলাম। ভোজবাজির মতোই হঠাৎ এটি কোত্থেকে এসে উদয় হলো। এটা ছিলো একটি মাস্কড বুবি। একদম নৌকার মাথাকাঠে আমার কয়েক ফুট দূরে এটি বসলো। আমি আমার হাতের তালুতে ডোরাডো মাছের একটি টুকরো নিয়ে এগিয়ে ধরলাম। কি আশ্চর্য—এটি এগিয়ে এসে আমার হাতের তালু থেকে ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে খেতে থাকলো। আমি দেরি না করে খপ করে ওর গলা চেপে ধরলাম। অন্য হাত দিয়ে এটির পাখা ধরে ফেললাম। এটি বেশ বড়ো পাখি ছিলো—বরফ সাদা রঙের, পাখার প্রান্তগুলো কালো। কমলা-হলুদ ঠোঁট; লাল চোখ।

আমি এর গলা টেনে ছিঁড়ে ফেললাম। এর পালক টেনে তুলতে গিয়ে চামড়াই তুলে ফেলছিলাম। অবশেষে ছুরির সাহায্য নিলাম। হায় ঈশ্বর—পালক ছাড়ানোর পর এটি এতোটুকু পাখি! শুধু বুকের কাছেই একটু মাংস। আমি ছুরি দিয়ে এর পেট চিড়ে ফেললাম। মাংস তেমন স্বাদ নয়। কলজে-গিলা খেয়ে এর মাথা ভেঙে মাথার ঘিলুটুকু খেলাম। বাদবাকি পালক-পাখনাসহ রিচার্ড পার্কারের তারপুলিনের নিচে ফেললাম। এর পেটের পাকস্থলীতে দুটি মাছ পাওয়া গেলো—জারক রসে লেপ্টে আছে। পানিতে ধুয়ে এ দুটো খেয়ে ফেললাম।

৮৫

একবার খুব বিজলি চকমাচ্ছিলো। আকাশ এতো কালো ছিলো যে দিনকেও রাতের মতো লাগছিলো। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো। দূরে বজ্র নির্ঘোষ শুনতে পেলাম। ভেবেছিলাম শব্দটা দূরেই থেকে যাবে। কিন্তু একটি বাতাস উঠলো। একবার এদিক থেকে একবার সেদিক থেকে ছিটকে আসচিলো প্রবল বৃষ্টিধারা। ঠিক তার পরেই আকাশ ফুঁড়ে পানি চিড়ে চিড়ে বেরিয়ে এলো এক টুকরো সাদা। এটা ছিলো নৌকা থেকে বেশ দূরে, কিন্তু নৌকা থেকে দেখা যাচ্ছিলো। এর পেছনের পানিগুলোকে মনে হচ্ছে সাদা শেকড়। যেনো এক স্বর্গীয় বৃক্ষ উঠে এলো মহাসাগরের অতল গহ্বর থেকে। এও কি সম্ভব? এ যে কল্পনারও অতীত.....আলোর ঝলক, সমুদ্রর পানিকে চিড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে আসা...কলজে চমকানো বজ্র নির্ঘোষ, তীব্র-উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি!

আমি রিচার্ড পার্কারের দিকে ফিরে বলে উঠলাম, 'দেখো, রিচার্ড পার্কার, দেখো বজ্রের আলোক ঝলকানি। তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। সে নৌকার খোলে টান টান হয়ে শুয়ে ছিলো। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ঝুলে পড়ে থরথর করে কাঁপছিলো।

আমার প্রতিক্রিয়া ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি যেনো সমস্ত মানবিক বোধশক্তি হারিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

হঠাৎ খুব কাছেই যেনো বজ্রপাত হলো। হতে পারে এটা আমাদের জন্য কোনো সংকেত। একটি ঢেউয়ের চূড়া থেকে সবে তখন এর উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নামছি আমরা। ওটা ছিলো গরম হাওয়া আর গরম পানির বিস্ফোরণ। দুই-তিন সেকেন্ড পর এক বিশাল চোখ ধাঁধানো সাদা মৃৎপাত্র যেনো মহাজাগতিক জানলা ভেঙে নাচতে নাচতে আকাশে ভেসে এলো। দশ হাজার রণতূর্য আর বিশ হাজার ড্রামবিটের মিলিত শব্দও যেনো এই আলোক বিস্ফুরণসহ বজ্র নির্ঘোষের সমান আওয়াজ করতে পারবে না। এটা যেন কানে তালা লাগিয়ে দেবে। এখন সমুদ্র কেবলই সাদা—অন্য সব রঙ যেনো নেই হয়ে গেছে। তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলো। এটা যতো দ্রুত আমাদের নজরে আসছিলো ততোই কমে আসছিলো বজ্র নিনাদ। আমাদের ওপর গরম পানির ছিটকে পড়াও বন্ধ হয়ে গেলো। ঢেউগুলো অন্ধকারে মুখ লুকালো।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়, যেনো বা তড়িতাহত। কিন্তু ভয় পাইনি। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সারাবিশ্বের প্রভু হে দয়াময়, বিচারদিনের স্বামী!" আমি বিড় বিড় করে বললাম। রিচার্ড পার্কারকে বললাম, "কাঁপাকাঁপি থামা, ব্যাটা উজবুক! এটা একটা জাদু। এটা এক স্বর্গীয় কৃপা। এটা....এটা..." আমি বুঝতে পারছিলাম না কী এটা, এতো বিশাল, এতো অদ্ভুত। আমার কথা এবং নিশ্বাস দুটোই উত্তেজনায় বন্ধ হয়ে আসছিলো। আমি তারপুলিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম হাত-পা ছড়িয়ে। বৃষ্টি আমার হাড়ে পর্যন্ত কাঁপন ধরাচ্ছিলো। আমি হাসছিলাম। আমার এই দীর্ঘ সমুদ্র ভোগান্তিতে আমি এমন তড়িতাহত হওয়ার মতো খুশি হইনি।

মানুষ যখন বিস্ময়ের ঘোরে থাকে তখন ছোটখাটো ভাবনা-চিন্তার কথা ভুলে যায়।

৮৬

"রিচার্ড পার্কার, একটি জাহাজ!"

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। খুশিতে আমি আত্মহারা। যেন লাফাতে লাফাতে হৃৎপিণ্ডটাই বেরিয়ে পড়বে—এমনই টগবগ করে খুশি ফুটছিলো আমার ভেতর।

"আমরা পেরেছি! আমরা এখন নিরাপদ! বুঝতে পেরেছো, রিচার্ড পার্কার! আমরা *নিরাপদ!* হা, হা, হা, হাহ্!"

আমি আমার উচ্ছ্বাসকে বশে রাখার চেষ্টা করছিলাম। কি হতো জাহাজটা যদি অনেক অনেক দূর দিয়ে যেতো আমাদের দেখতে না পেরে? আমার কি তখন রকেট ফ্লেয়ার ছোঁড়া ঠিক হতো? গাধা কোথাকার!

"এটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। রিচার্ড পার্কার! ওহ্ তোমাকে ধন্যবাদ গণেশ, ধন্যবাদ আল্লাহ্-ভগবান।"

এটা আমাদের দেখতে নাও পেতে পারতো! দুঃসহ জীবন থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে কি। নিশ্চয়ই নয়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। অনেকদিন পর এই প্রথম আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"তুমি কি ভাবতে পারো, রিচার্ড পার্কার? মানুষ, খাদ্য, একটি বিছানা। আমরা আবার জীবন ফিরে পাচ্ছি। ওহ্ কি অসীম দয়া!"

জাহাজটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এটা দেখতে তেলের ট্যাঙ্কারের মতো। ঐ তো জাহাজের সামনেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সাদা বর্ডারের কালো ধাতব অংশ দেখতে পাচ্ছি।

"আর যদি এটা....?"

আশঙ্কার কথাটা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারলাম না। তাহলে কি বাবা-মা-রবি বেঁচে আছে? 'সিমিটস্থ' জাহাজে অনেকগুলো জীবনতরী ছিলো। ওঁরা হয়তো কয়েক সপ্তাহ আগেই কানাডা পৌঁছে গেছে আর উদ্বিগ্ন হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সম্ভবত আমিই একমাত্র নিখোঁজ।

"হা ঈশ্বর তেলের ট্যাঙ্কার এতো বড়ো?"

একটা পর্বত যেনো এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

"হয়তো তারা এর মধ্যেই উইনিপেগে পৌঁছেছে। উইনিপেগে আমাদের বাড়িটা কেমন? তুমি কি ধারণা করতে পারো, রিচার্ড পার্কার, কানাডার ভেতর বাড়ি কি তামিলনাড়ুর মতোই? হয়তো নয়। আমার মনে হয় সেখানে শীতকালে বরফ জমে থাকে।"

জাহাজটা এখন খুব কাছে। নাবিকদের এখনই জাহাজটা থামানো উচিত। অথবা জাহাজের মাথা ঘোরানো উচিত।

"হ্যাঁ, কোন্ প্রজাতি...? হা, ঈশ্বর!"

আমি বুঝতে পারলাম জাহাজটা শুধু আমাদের দিকে এগিয়েই আসছে না,আমাদের অতিক্রম করেও যাওয়ার দশা। জাহাজের সামনের অংশ কী বিশাল! প্রতি মুহূর্তেই এটা বড়ো হচ্ছে। রিচার্ড পার্কার উত্তেজিত হয়ে উঠলো, "উউফ্! উউফ্!" কিন্তু তার এ ডাকটা কুকুরের মতো ছিলো না—বাঘের মতোই ছিলো।

"রিচার্ড পার্কার, এটা আমাদের ফেলে যাচ্ছে! কি করা যায়? জলদি, জলদি এক ফ্রেয়ার! না, কয়েকটা...! হাম্প! হাম্প! হাম্প! হাম্প! হাম্প! হাম...."

জাহাজের সামনের অংশ আমাদের পার হয়ে গেলো। রিচার্ড পার্কার নখ দিয়ে আচড়া আচড়ি করলো! তার লোমগুলো খাড়া। জাহাজের ঢেউয়ে নৌকাটা একটু পিছিয়ে গেলো এবং দুই ফুটেরও কম জায়গার জন্য এটাকে ছুঁতে পারলো না।

জাহাজটা মনে হয় মাইলখানেক লম্বা এক দুর্গ। দুর্গ প্রাকারের বাইরের কিছু যেন এটি দেখতে পাচ্ছে না। আমি একটি রকেট ফ্লেয়ার ছুঁড়লাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য যথার্থ হলো না। এটা জাহাজের ওপর ক্যাপ্টেনের নাক বরাবর তাক করা উচিত ছিলো। কিন্তু এটা জাহাজের পাশে লেগে পানিতে পড়ে হিস হিস করে নিভে গেলো। জোরে জোরে বাঁশি বাজালাম। ফুসফুসে যতো জোর আছে চিৎকার করলাম। কিন্তু সব বৃথা।

এর ইঞ্জিন চলতেই থাকলো আর প্রপেলার ঘুরতেই থাকলো। জাহাজটি আমাদের তার নিজেরই ঢেউয়ের ওপর ফেলে রেখে চলে গেলো। অনেক সপ্তাহ ধরে প্রাকৃতিক শব্দে অভ্যস্ত আমি ইঞ্জিনের এই অদ্ভুত বিকট শব্দে মূক হয়ে গেলাম।

বিশ মিনিটেরও কম সময়ে তিনশ' হাজার পাউন্ডের জাহাজটা দিগন্তে হারিয়ে গেলো। আমি যখন জাহাজটির দিক থেকে ফিরলাম—দেখি রিচার্ড পার্কার তখনও ওদিকে তাকিয়ে আছে। অল্প কয়েক সেকেন্ড পরে সেও মুখ ফেরাল আর আমাদের চোখাচোখি হলো। একাকিত্বে, অসহায়ত্বে আমার হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিলো। বিড়ালের মতো 'মিউ' ডেকে রিচার্ড পার্কারও হতাশ হয়ে বসে পড়লো।

"আমি তোকে ভালোবাসি!" হৃদয় উজার করে একান্ত সুখন, আমার রিচার্ড পার্কারকে বললাম, "সত্যিই আমি তোকে ভালোবাসি, রিচার্ড পার্কার! তুই না থাকলে এ মুহূর্তে কী করতাম জানি না। আমি এটা চিন্তাও করতে পারি না। আমি হয়তো হতাশায় মরেই যেতাম। ভেঙে পড়িস না রিচার্ড পার্কার। আমি তোকে ডাঙায় নিয়ে যাবো। আমি কথা দিচ্ছি, সেরিস— এই আমি তোকে ডাঙায় নিয়ে যাবো!"

৮৭

বেঁচে থাকার জন্য আমি শ্বাস নিতাম যতোটা না নিলেই নয়। এজন্য আমি একটা কম্বলের টুকরো ব্যবহার করতাম। এটার নাম দিয়েছিলাম 'স্পঞ্জ কম্বল।' আমি এটাকে সমুদ্রের পানিতে ভিজিয়ে নিতাম যাতে এটি আমার ত্বকে এঁটে থাকে—পড়ে না যায়। এরপর আমি তারপুলিনে চিত হয়ে শুয়ে এটিকে আমার সারা মুখমণ্ডলে চেপে বসিয়ে শুয়ে থাকতাম নির্জীব। এটা নাকের ওপর থাকার ফলে আমার ফুসফুস কম বাতাস টানতে পারতো। আমি এভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে জগত সংসারের সবকিছু ভুলে যেতাম। ভুলে যেতাম আনন্দ-বেদনা-হতাশা-ভালোবাসা এমনকি কখনও কখনও নিজের অস্তিত্বও। এভাবে সময় বয়ে যেতো। কম্বলটা শুকিয়ে গেলে বুঝতাম—কিছুটা সময় অন্তত আরও পার করলাম। আমার বর্তমান অবস্থা আমার এই ক'দিন আগের অবস্থার চেয়েও একদম অন্যরকম।

৮৮

একদিন আমাদের নৌকা জঞ্জালের ওপর এসে পড়লো। প্রথমে নৌকাটা তেলের একটা আস্তরণ পার হলো। তারপর শুরু হলো জঞ্জাল। গৃহস্থালি নানা বস্তু, পচা-বাসি, চটে যাওয়া নানা রঙ। পলিথিনের নানা খালি প্যাকেট, বিয়ারের খালি ক্যান, খালি মদের বোতল, ছেঁড়া কাপড়, দড়ির টুকরো আর এগুলোকে ঘিরে হলুদ ফেনা। আমি এর ভেতর কাজে লাগানো যায় এমন বস্তু খুঁজছিলাম। কর্ক আঁটা একটা শূন্য মদের বোতল দেখে সেটা তুলে নিলাম। নৌকাটা একটা ফ্রিজের সাথে ধাক্কা খেলো। ফ্রিজটার মোটর নেই। এটা দরজার দিকে মুখ করে ভাসছিলো। এক ঝটকায় দরোজাটা খুলে ফেললাম। এক ঝটকায় দরোজাটা খুলে ফেললাম। ওহ্, কি বদগন্ধ! হাত দিয়ে নাক চেপে ভেতরে তাকালাম। পচা, ঘোলা রস, একেবারে পচে যাওয়া কিছু সবজি, দুধ এমন পচেছে যে জেলির মতো সবুজ হয়ে গেছে; একটা মরা জন্তু, এটার রঙ কালো হয়ে এমন হয়েছে যে, বোঝা মুশকিল কি প্রাণী ছিলো এটা। আমার ধারণা হলো এটা ভেড়ার মাংস ছিলো। গন্ধে বমি আসছিলো। তাড়াতাড়ি দরোজা বন্ধ করে ছেড়ে দিলাম। ভাগ্য ভালো সমুদ্রের স্রোত আমাদের দ্রুত ভাসিয়ে নিলো।

আমরা জঞ্জাল পিছে ফেলে এলাম। দীর্ঘক্ষণ যখনই ওদিক থেকে বাতাস বয়ে আসছিলো, গন্ধটা নাকে এসে লাগছিলো। ওই তেলের স্তর পার হতে আমাদের একদিন লেগেছিলো।

বোতলটায় আমি একটি জরুরি বার্তা লিখে ভরলাম। আমি লিখলাম : "পানামার পতাকাবাহী জাপানী জাহাজ *'সিমিটসুম'* ২ জুলাই, ১৯৭৭ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে, ম্যানিলা থেকে ছেড়ে আসার চারদিন পর ডুবে গিয়েছিলো। আমি এখন জীবনতরীতে ভাসছি। আমার নাম পাই প্যাটেল। অল্প কিছু খাবার আর পানি আছে। কিন্তু সঙ্গে থাকা একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার এক বড়ো সমস্যা। দয়া করে কানাডার উইনিপেগে আমার পরিবারের কাছে খবরটা পৌছে দিন। যে কোন ধরনের সাহায্য স্বাগত। ধন্যবাদ।" বোতলের ছিপি এঁটে লাগিয়ে প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে মুড়ে দিলাম। তারপর বড়শিরা সুতো দিয়ে বোতলের গলা শক্ত করে বেঁধে ভাসিয়ে দিলাম বোতলটি।

৮৯

সবকিছুই মলিন হয়ে যাচ্ছিলো। রোদে পুড়ে, জোলো আবহাওয়ায় সবকিছুরই রঙ চটে যাচ্ছিলো। কমলা রঙের সবকিছু সাদাটে হয়ে গেলো। যা কিছু তীক্ষ্ণ ছিলো ভোঁতা হতে লাগলো। শীর্ণ হয়ে রিচার্ড পার্কারের হাড়গোড় বেরিয়ে গেলো। আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত। কম্বল এবং কচ্ছপের খোল দিয়ে শরীর ঢেকে না রাখলে এ ক্ষতগুলোতে বোধহয় পচন ধরতো। যখন গরমে অসহ্য হয়ে পড়তাম, সমুদ্র থেকে এক বালতি পানি তুলে ঢেলে দিতাম শরীরে। রোদেরও যে কতো ধরনের গন্ধ হতো। এখন মনে নেই। শুধু মনে আছে ফ্রেয়ারের জিরার গন্ধ। এমনকি আমি এখন রিচার্ড পার্কারের গন্ধও ভুলে গেছি।

আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রিচার্ড পার্কারের কমলা রঙের ভেলভেট চামড়া তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছিলো। ওর ওজন ভয়ানকভাবে কমে গিয়েছিলো, কংকালসার দেহটা যেন রঙ চটে যাওয়া ফারের ব্যাগ। আমিও ভীষণ হাল্কা হয়ে গিয়েছিলাম।

রিচার্ড পার্কারের দেখাদেখি আমিও দীর্ঘ ঘুম দিতে শুরু করলাম। অবশ্য একে ঠিক ঘুম বলা যাবে না। অর্ধচেতন হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকতাম।

আমার ডায়েরির শেষ পাতাগুলো হচ্ছে :

আজ একটা হাঙর দেখলাম, এর আগে দেখা সব হাঙরের চেয়ে বড়ো ছিলো এটা। ডোরাকাটা। একটি টাইগার শার্ক—ভীষণ বিপজ্জনক। ভয় করছিলাম কখন এটি আক্রমণ করে বসে। এক বাঘের হাত থেকে বেঁচে অন্য বাঘের হাতে মরবো? কিন্তু এটি আক্রমণ করলো না। ভেসে চলে গেলো। মেঘলা আকাশ, কিন্তু কিছু নেই।

বৃষ্টি নেই। শুধু ভোরের ধূসরতা। ডলফিন। একটাকে কোঁচে গাঁথতে চাইলাম। টের পেলাম দাঁড়াতে পারছি না। রি.পা. দুর্বল এবং খিটখিটে। আমি এতো দুর্বল যে আক্রমণ করলে কোনোরকম প্রতিরোধ করতে পারবো না। বাঁশি বাজাবার শক্তিও নেই।

শান্ত এবং ভীষণ গরম দিন। রোদ নির্দয়ভাবে পোড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথার ভেতর মগজ টগবগ করে ফুটছে। আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত।

শরীর এবং মন আনত হয়ে আসছে। শীঘ্রই মারা যাবো। রি.পা. দম নিচ্ছে, কিন্তু নড়াচড়া করছে না। ও-ও মারা যাবে। আমাকে মারবে না।

উদ্ধার। এক ঘন্টার মুষলধারে বৃষ্টি, কী স্বাদের, কী সুন্দর বৃষ্টি! মুখ ভরে খেলাম। ব্যাগ ভরলাম, ক্যান ভরলাম। যতোটুকু ধরে খেলাম। আমার শরীর সব লবণ ধুয়ে নিলো। হামাগুড়ি দিয়ে রি.পা.কে দেখলাম। ও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। লেজ ছড়িয়ে শরীর কুঁকড়ে আছে। চামড়া ভিজে শপশপে। ভিজে গেলে ওকে আরও ছোট দেখায়। হাড় জিরজিরে। প্রথমবারের মতো ওকে ছুঁলাম—মরে গেছে কিনা দেখার জন্য। না। শরীর এখনও গরম। তাকে ছুঁয়ে পুলকিত হলাম। এমনকি এ অবস্থায়ও দৃঢ়, পেশীবহুল, জীবিত। আমি তাকে ছুঁলাম আর তার চামড়া এমনভাবে কুঁচকালো যেন কোন ডাশ মাছি বসেছে। অবশেষে অর্ধেক পানিতে ডুবে থাকা মাথা তুলে তাকালো। ডুবে যাওয়ার চেয়ে পান করা ভালো। এখনও লক্ষণ ভালোই: লেজটা লাফিয়ে উঠলো। নাকের কাছে কয়েক টুকরা কচ্ছপের মাংস ফেললাম। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অবশেষে পানি খাওয়ার জন্য মাথাটা একটু তুললো। অনেক পানি খেলো। মাংসটুকু খেলো। পুরো উঠলো না। ঘন্টাখানেক জিভ চেটে সময় কাটালো। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

এটার আর কোনো দরকার হবে না। আজ আমি মরে যাচ্ছি।

আজ আমি মরে যাবো।

আমি মরবো।

ডায়েরিতে এই আমার শেষ লেখা। এরপরও লিখেছি—কিন্তু দাগ হয়নি। পৃষ্ঠার মার্জিনে অদৃশ্য লেখার আঁচড় দেখতে পাচ্ছেন না? আমি ভেবেছিলাম কাগজে টান পড়বে। শেষপর্যন্ত দেখুন—কালিই শেষ হয়ে গেলো।

৯০

রিচার্ড পার্কারের চোখের সামনে হাত দুলিয়ে বললাম, "রিচার্ড পার্কার, তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছো?"

দু'দিন ধরে ও শুধু চোখ কচলাচ্ছিলো আর ককাচ্ছিলো। এখন আমাদের রসদ আর পর্যাপ্ত ছিলো না, পর্যাপ্ত ছিলো ব্যথা আর বেদনা। গত তিনদিন ধরে কিছুই খাইনি। অবশেষে একটি ডোরাডো ধরতে পারলাম। কাল নৌকার কাছে একটি কচ্ছপ এসেছিলো। কিন্তু এতো দুর্বল ছিলাম যে ওটা তোলারও শক্তি ছিলো না। মাছটাকে দু'ভাগ করলাম। রিচার্ড পার্কারের ভাগ ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। আমি ভেবেছিলাম ও খপ করে মুখ দিয়ে ধরে ফেলবে এটি, সচরাচর যেমনটি ধরে। কিন্তু মাছটি গিয়ে ওর মুখে আছড়ে পড়লো। ডানে-বাঁয়ে শুকে শুকে ও এটিকে খুঁজে পেলো এবং খেতে শুরু করলো। আমরা এখন খুবই ধীরে ধীরে খাই।

আমি তার চোখের দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। ঠিক যেমনটি চোখের ডাক্তাররা দেখে। হয়তো চোখের অভ্যন্তরীণ ক্ষরণে ও কষ্ট পাচ্ছে। এটা অবশ্য আশ্চর্য হবার মতো কোনো ঘটনা ছিলো না। ও এখন অস্থিচর্মসার। আমি ওর চোখের দিকে তাকাতেই ও চোখ সরিয়ে নিলো। এতে নিশ্চিত হলাম যে ও অন্ধ হয়ে যায়নি।

রিচার্ড পার্কারের জন্য আমার খুবই দুঃখ হয়। আমাদের দিন ফুরিয়ে আসছে।

পরদিন সকালে আমার চোখের ভিতর কি যেন খচখচ করতে লাগলো। আমি চোখ কচলাতে থাকলাম, কিন্তু চোখের ভেতরের খচখচানি গেলো না। বরং উল্টোটা হলো। আর রিচার্ড পার্কারের চোখে কিছু না হলেও আমার চোখে ধীরে ধীরে পুঁজ জমতে লাগলো। তারপর নেমে এলো অন্ধকার। সবকিছু ঘোলা ঘোলা দেখছি। প্রথমে এটি দেখলাম আমার সামনে, সবকিছুর মাঝখানে একটি কালো বিন্দু দেখলাম। যা দেখি তার ভেতরই কালো দাগ। এ কালো বিন্দুটি ক্রমে বড়ো হতে লাগলো। পরদিন সকালে চোখ খুলতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে বাম চোখটি একটু ফাঁক করতে পারলাম আর অনেক উপরের জানালার মতো এক চিলতে আলো দেখতে পেলাম। দুপুর নাগাদ চোখের ওপর পিচের মতো কালো পর্দা নেমে এলো।

কোনোরকমে জীবন ধরে রেখেছিলাম। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। দাঁড়াতে পারছিলাম না একেবারেই। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে চৌচির। মুখ শুকনো খটখটে। মুখের লালা আঠালো আর বিদঘুটে গন্ধ। রোদে পুড়ে গেছে চামড়া, পেশীতে পেশীতে ব্যথা। পা দুটো ফুলে গেছে—সব সময় প্রচণ্ড ব্যথা এতে। পেটে ভীষণ ক্ষুধা কিন্তু একটুও খাবার নেই। আর রিচার্ড পার্কারকে বেশি পানি দিতে গিয়ে আমি দিনে মাত্র পাঁচ চামচ করে পানি খেতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু শরীরের কষ্টের চাইতে মানসিক যন্ত্রণা ছিলো আরও দুঃসহ। যেদিন থেকে অন্ধ হয়ে গেলাম সেদিন থেকে শুরু হলো আমার চরম দুর্দিন। জাহাজডুবির কতোদিন পর অন্ধ হয়েছিলাম আজ আর মনে নেই—একশ' দিন পরে হতে পারে আবার দুইশ' দিন পরেও হতে পারে।

পরদিন সকালে আমার ভেতর থেকে মৃত্যু চিন্তা একেবারেই উঠে গেলো এবং আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় অনেকটা তৈরি হয়েই থাকলাম।

আমার পক্ষে আর রিচার্ড পার্কারকে দেখাশোনা করা সম্ভব ছিলো না। ওকে যতোটা যত্ন করেছি ততোটা নিজেকেও করিনি। বিড়বিড় করে বললাম, "বিদায়, রিচার্ড পার্কার। তোমাকে আর খাওয়াতে পারছি না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আমার সাধ্যমতো করেছি। বিদায়। প্রিয় বাবা, প্রিয় মা, প্রিয় রবি আমার শুভেচ্ছা নিও। তোমাদের প্রিয় পুত্র, প্রিয় ভাই অচিরেই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসছে। এমন কোনো ঘণ্টা ছিলো না যখন আমি তোমার চিন্তা করিনি। কিন্তু এখন আর পারছি না। এখন তোমার সমস্ত ভার ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, যাঁকে আমি ভালোবাসি এবং আমাকেও যিনি ভালোবাসেন।"

শুনতে পেলাম কে যেন বললো, "কেউ কি ওখানে আছে?"

একাকিত্বের নির্মম প্রহরে এমন শব্দ শোনা চরম বিস্ময়ের। আমি কোনো অবয়ব দেখতে পাচ্ছি না, কেবল শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কণ্ঠস্বরটি আবার বললো, "কেউ কি ওখানে আছে?"

আমি বোধহয় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। বিপদগ্রস্তরা সঙ্গ চায় এবং সে সঙ্গ লাভের জন্য পাগল হয়ে যায়।

"কেউ কি ওখানে আছে?" আবার কণ্ঠটি শুনতে পেলাম। ভারি, ঘসঘসে গলা। আমিও কথা বলে উঠলাম—

"অবশ্যই সেখানে কেউ আছে। ওখানে সবসময় একজন আছে। নইলে কেউ কেনো তা জিজ্ঞেস করছে?"

"আমারও তেমনটি আশা ছিলো যে, কেউ হয়তো আছে।"

"তুমি কি বোঝাতে চাইছো? তুমি কি জানো তুমি কোথায় আছো? তোমার যদি এই কৌতুককর কথাবার্তা পছন্দ না হয় তো অন্যখানে যাও। অনেক মজার মজার ব্যাপার পাবে।"

"তাহলে ওখানে কেউ নেই, আছে কি?"

"হিশ্‌শ্‌....আমি ডুমুর স্বপ্ন দেখছি।"

"ডুমুর! তোমার কাছে কি একটি ডুমুর হবে? আমি কি একটি পেতে পারি? প্লিজ, একটি ডুমুর...আমি খুব ক্ষুধার্ত!"

"আমার কাছে একটি নয়—পুরো এক কাদি ডুমুর আছে আমার কাছে।"

কণ্ঠস্বরই হোক বা এটা কোনো ঢেউ বা বাতাসের শব্দই হোক মিলিয়ে গেলো।

"এগুলো খুব মাংসল, ভারি এবং রসালো," আমি বলতে থাকলাম। "ডুমুরের ভারে এর শাখা নুইয়ে পড়েছে। গাছটায় মনে হয় তিনশ'রও বেশি ডুমুর আছে।"

কিছুক্ষণ সবকিছু নীরব।

কণ্ঠটি আবার বলে উঠলো, "খাবার নিয়ে কথা বলা যাক..."

"চমৎকার আইডিয়া।"

"চাইলে পাওয়া যায়—এমন হলে তুমি কি খেতে চাইবে?"

"চমৎকার প্রশ্ন। টেবিল সাজানো থাকবে সব খাবারে। ভাত এবং সম্বার দেয়া নাবড়া দিয়ে খেতে শুরু করবো। বুটের ডাল-ভাত, ছানা-ভাত এবং—"

"আমি নেবো—"

"আমাকে শেষ করতে দাও। আমি ভাতের সাথে নেবো রসালো তেঁতুলের সম্বার এবং ছোট পেঁয়াজের সম্বার এবং—"

"আরও কিছু?"

"বলতে দাও। সবজি মেশানো সাগু নেবো, সবজির কোরমা নেবো, আলুর মাসালা, বাঁধাকপি ভাজি...."

"আচ্ছা!"

"রোসো। চাটনির কথা তো বলাই হয়নি! নারকেলের চাটনি, লবঙ্গের চাটনি, কাঁচামরিচের আচার, বৈচির আচার, সাথে লুচি, পরাটা এবং পুরি তো থাকবেই।"

"হুম্‌।"

"আর সালাদ! আমের দইয়ের সালাদ, ওকরা দই সালাদ এবং শুধু শশার সালাদ। আর থাকবে নানা ফলের ফলারি, ভ্যানিলা আইসক্রিম, সাথে গরম, ঘন চকোলেট সস।"

"তাই?"

"স্ন্যাক শেষে দশ লিটারের গ্লাসের এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানি—পরিষ্কার এবং ঠাণ্ডা আর খাবো কফি।"

"শুনতে ভালই লাগছে।"

অনেক ধরনের খাবারের কথা চলতেই থাকলো।

"তারপর কি খাবে?"

"বাদামী সসের সাথে বাছুরের মগজ।"

"শেষপর্যন্ত মাথায় চলে গেলে।"

"মগজের চচ্চড়ি!"

"ওহ্ তোমার খাবারের বাহার দেখে আমার মাথা ঘোরাচ্ছে আরও কিছু খাবে?"

"ষাঁড়ের লেজের স্যুপের সাথে যে কি নেবো! শূকরের মাংসের রোস্ট সাথে ভাত। মাখন, সরষের তেলে ধনেপাতার সস। খরগোশের মাংসের কুঁর সাথে লাল মদ। মুরগির কলিজা। শূকরের মাংস, আর ব্যাঙ! আমাকে ব্যাঙ দাও, ব্যাঙ!"

"ওহ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

কণ্ঠটি মিলিয়ে গেলো। আমি ঘোরের মধ্যে কাঁপতে থাকলাম। মনের পাগলামি এক জিনিস, কিন্তু যখন পেটের পাগলামি শুরু হয়?

"রক্তাক্ত তাজা, কাঁচা গরুর মাংস খাবো?"

"অবশ্যই, আমি এটা খুব পছন্দ করি।"

"তুমি কি মরা শূকরের রক্ত খেতে?"

"প্রতিদিন, সাথে আপেলের সস।"

"তুমি কি পশুর সবকিছুই খাও, নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত?"

"থালা ভরে ভরে এগুলো খাই।"

"গাজর? তুমি কি কাঁচা গাজর খাও?"

উত্তর নেই।

"তুমি কি শুনতে পারছো না? তুমি কি গাজর খাও না?"

"আমি ঠিকই শুনতে পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি আমি গাজর পছন্দ করি।"

আমি হাসলাম। আমি এটা জানি। আমি কোনো ভৌতিক শব্দ শুনছি না। রিচার্ড পার্কার আমার সাথে কথা বলছে।

"একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। বলো না—তুমি কি কখনও মানুষ মেরেছো?"

এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিলো। মানুষখেকো পশুর চেয়ে মানুষখেকো মানুষের সংখ্যা বেশি। রিচার্ড পার্কারকে একেবারে শিশু অবস্থায় ধরা হয়েছিলো। কে বলতে পারে ও যখন একেবারে ছোটো ওর মা ওকে কোনো মানুষ মেরে খাইয়েছে কি-না!

"প্রশ্নের কি ছিরি!"—রিচার্ড পার্কার উত্তর দিলো।

"হতেও তো পারে, এটা তো অসম্ভব নয়।"

"তাই?"

"তাই।"

"কেনো?"

"তোমাদের তো এব্যাপারে খ্যাতি আছে।"

"আমিও?"

"অবশ্যই। তুমি কি ও ব্যাপারে অজ্ঞ?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো; তবে শুনে রাখো মানুষ মারার ব্যাপারে তোমাদের খ্যাতি আছে। আচ্ছা, তুমি কি কখনও মানুষ মেরেছো?"

নীরবতা।

"শুনতে পাচ্ছো? উত্তর দাও।"

"হ্যাঁ।"

"ওহ্! ভয়ে আমার মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত বইছে। ক'টা মানুষ মেরেছো?"

"দুটো।"

"দুটো মানুষ মেরেছো?"

"না, একজন পুরুষ আর একজন নারী।"

"একই সাথে?"

"না। পুরুষটাকে আগে, তারপর নারীটাকে।"

"ব্যাটা দানব! আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি ঠাট্টা করছো। তুমি নিশ্চয়ই তাদের চিৎকার এবং ছটফটানি উপভোগ করেছো?"

"সত্যি, না।"

"তারা কি *ভালো* ছিলো?"

"হ্যাঁ। তোমার বুদ্ধি এতো ভোঁতা কেনো? তাদের স্বাদ কি ভালো ছিলো?"

"না, তাদের স্বাদ ভালো ছিলো না।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। তাহলে মেরেছিলে কেনো?"

"সহজাত প্রবৃত্তির কারণে।"

"একটা দানবের প্রবৃত্তি, কোনো অনুশোচনা?"

"হয় ওদের মরতে হতো, নয় আমাকে।"

"সবাই এরকম বলে। কিন্তু এখন কোনো অনুশোচনা?"

"এটা এক মুহূর্তের ব্যাপার। পরিস্থিতি বাধ্য করেছিলো।"

"প্রয়োজন, এটাকে বলে বেঁচে থাকার প্রয়োজন। বলোনি, কিন্তু এখনও কোনো অনুশোচনা হয় কি-না?"

"আমি ভেবে দেখিনি।"

"যথার্থই পশুর মতো কথা বললে।"

"আর তুমি কি?"

"একজন মানুষ, তোমার জানা থাকা উচিত।"

"কি দম্ভ!"

"এটা এক নির্জলা সত্য।"

"তাহলে প্রথম পাথরটা তুমিই ছুঁড়েছিলে, তুমিই?"

"কখনও উথাপম খেয়েছো?"

"না, খাইনি। কিন্তু এটা কি বলবে তো? উথাপমটা কী?"

"এটা খুব ভালো জিনিস।"

"শব্দটা তো ভালোই লাগছে, কি জিনিস এটা?"

"এটা সেটা ফেলে দেয়া জিনিস টুকরো টুকরো করে এটা বানানো হয়। এর স্বাদটা বেশ স্মরণীয় হয়ে থাকে।"

"আমি এটা চোখে দেখতে পারি।"

আমি ঘুমিয়ে গেলাম। আসলে ঘুম মৃত্যু গহ্বরে তলিয়ে গেলাম হয়তো বা।

কিন্তু তুচ্ছ কোনো ব্যাপার আমাকে খোঁচাচ্ছে। ব্যাপারটা কি বলতে পারছি না। যাই হোক, ব্যাপারটা আমার মৃত্যুকে জ্বালাচ্ছিলো।

ও, মনে পড়েছে। আমি জানতাম কি আমাকে বিরক্ত করছে।

"ক্ষমা করবেন কি?"

"জি!" বিধ্বস্ত গলায় ফ্যাসফ্যাসিয়ে বললো রিচার্ড পার্কার।

"ওভাবে জি করে উঠলে যে?"

"আমি নই, তুমি জি করেছো।"

"না, আমি না, তুমি 'জি' উচ্চারণ করেছো।

"আমি বলছি জি 'জি', এটা যেমন উচ্চারিত হওয়ার কথা। তুমি মনে হয় মুখে গরম মার্বেল রেখে উচ্চারণ করেছো। তোমার উচ্চারণটা ভারতীয়দের মতো।"

"তুমি এমনভাবে বলছো যেন তোমার জিভ করাত আর ইংরেজি শব্দগুলো হচ্ছে তক্তা। তোমার উচ্চারণ অনেকটা ফরাসীদের মতো।"

এটা একেবারেই বেখাপ্পা উচ্চারণ। রিচার্ড পার্কার জন্মেছিলো বাংলাদেশে আর বেড়ে উঠেছে তামিলনাড়ুতে। তাহলে উচ্চারণে কোনো ফরাসী টান ওর? না হয় পন্ডিচেরি একসময় ফ্রান্সের কলোনি ছিলো তাই বলে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না যে চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণী ফরাসী ভাষায় এমন হরহরিয়ে কথা বলবে।

ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আমার চেতনা আবার ধোঁয়াসার অতলে হারিয়ে গেলো।

হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম। ওখানে কেউ আছে! এটা কোনো বাতাসের শব্দ নয়, কিংবা কোন জন্তুর কণ্ঠও নয়। এটা অন্য কেউ। আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো নিজের বিধ্বস্ত শরীর থেকে রক্ত শুষে খাই। শুকনো গলা ভেজাতে মরিয়া হয়ে উঠলো মন।

"শুধু একটি প্রতিধ্বনি, আমি ভয় পাচ্ছি," আমি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"অপেক্ষা করো, আমি এখানে।" আমি চিল্লিয়ে বললাম।

"সমুদ্রে একটা প্রতিধ্বনি...."

"না, এটা আমি!"

"এই বোধহয় শেষ!"

"কি ব্যাপার বন্ধু?"

"আমি ভেসে যাচ্ছি দূরে..."

"তুমি থাকো, থাকো!"

আমি তাকে কোনোমতে শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমি চিৎকার করলাম।

সেও চিৎকার করলো।

ওহ্, অনেক হয়েছে। আমি পাগল হয়ে যাবো।

মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেলো।

"আমার নাম," আমি সর্বশক্তি দিয়ে গর্জে উঠলাম, "পাইসাইন মলিটর প্যাটেল।" একটা প্রতিধ্বনি আবার কোনো নাম উচ্চারণ করে কি করে?

"শুনতে পাচ্ছো? আমি পাইসাইন মলিটর প্যাটেল, সবার কাছে পাই প্যাটেল বলে পরিচিত।"

"কি? ওখানে কি কেউ আছে?"

"হ্যা, ওখানে কেউ আছে!"

"কি! এও কি সত্যি হতে পারে? আপনার কাছে কোনো খাবার হবে, প্রিজ! যে কোনো ধরনের খাবার। আমার একদম খাবার নেই। আমি কয়েকদিন ধরে কিছুই খাইনি। আমাকে কিছু খেতেই হবে। তুমি যা দেবে তাতেই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কৃপা কর, দাও।

"কিন্তু আমারও তো কোনো খাবার নেই।" আমি উত্তর দিলাম। "আমিও অনেকদিন ধরে কিছুই খাই না। আমি আরও ভেবেছিলাম তোমার কাছে খাবার আছে। তোমার কাছে পানি হবে? আমার খুব অল্প পানি আছে।"

"না, নেই। তোমার কাছে কি একটুও খাবার নেই? কিছুই নেই?"

আবার গভীর নীরবতা।

"তুমি কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি এখানে," সে উদ্বেগের সাথে উত্তর দিলো।

"কিন্তু কোথায়? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কেনো, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না?

"আমি অন্ধ হয়ে গেছি।"

"কি?" সে আশ্চর্য হলো।

"আমি অন্ধ হয়ে গেছি। আমার চোখ অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখে না। গত দু'দিন আমি ত্বকের সাহায্যে সময় বোঝার চেষ্টা করি। বোঝার চেষ্টা করি এটা রাত না দিন।"

আমি একটি ভয়ঙ্কর গোঙানী শুনতে পেলাম।

"কি? এটা কি বন্ধু?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সে গুঙিয়েই যায়।

"দয়া করে উত্তর দাও। এটা কী? আমি অন্ধ এবং আমাদের কোনো খাদ্য এবং পানি নেই। কিন্তু আমরা একে অন্যের জন্য আছি। ওখানে কিছু আছে। দামী কিছু একটা। জিনিসটা কি ভাই?"

"আমিও অন্ধ!"

"কি?"

"আমিও তোমার মতো কিছু দেখতে পাই না।"

সে আবার ককিয়ে উঠলো। আমার কানে তালা লেগে গেলো। আমি কি আরেকটা নৌকায় আরেকটা অন্ধ লোকের সাক্ষাত পেলাম এই প্রশান্ত মহাসাগরেই?"

"কিন্তু তুমি অন্ধ হলে কিভাবে?"

"সম্ভবত তোমার মতো করেই। দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকা কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার নির্মম পরিণতি।"

আমরা দু'জনেই ভেঙে পড়লাম। সে গোঙালো আর আমি ককালাম। অনেক হয়েছে আর কতো! অনেক হয়েছে।

"আমার একটি গল্প আছে।" কিছুক্ষণ পর আমি বললাম।

"একটি গল্প?"

"হ্যাঁ।"

"গল্প দিয়ে কি হবে? আমার লেগেছে ক্ষুধা।"

"এটা খাবারের গল্প।"

"কথায় কোনো ফালরি নেই।"

"যেখানে খাদ্য আছে সেখানেই খাদ্য খোঁজো।"

"ভালো পরামর্শ।"

আবার নীরবতা। অনাহারি নীরবতা।

"তুমি কোথায়?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে। আর তুমি?"

"এখানে।"

পানিতে বৈঠা ফেলার শব্দ পেলাম। ভেঙে ভেসে যাওয়া ভেলার যে দুটি বৈঠা রক্ষা পেয়েছিলো তার একটা আনতে গেলাম। এটা এতো ভারি! আমি হাতিয়ে হাতিয়ে সবচেয়ে কাছের বৈঠা রাখার খাজটা খুঁজে বের করলাম। আমি এরা বৈঠাটা ফেললাম। বৈঠার হাতল ধরে টানলাম। আমার আর শক্তি নেই। তা সত্ত্বেও আমি সাধ্যমতো দাঁড় টানলাম।

"শোনা যাক তোমার গল্প," সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

"একদা একটি কলা এবং এটি বাড়তে লাগলো। এটা বাড়তে বাড়তে বড়ো হলো, শক্ত হলো, হলুদ হলো এবং পেকে ঘ্রাণ ছড়াতে থাকলো। তারপর এটি মাটিতে পড়লো এবং কেউ একজন এসে এটি মজা করে খেলো।" সে দাঁড় টানা বন্ধ করে দিলো। "কি চমৎকার গল্প!"

"ধন্যবাদ।"

"আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।"

"আমার আরও বলবার আছে," আমি বললাম।

"কি সেটা?"

"কলাটা মাটিতে পড়লো এবং কেউ এসে সেটি খেলো আর এটি খাওয়ার পর লোকটির *ভালো লাগতে* লাগলো।"

"এটা তো খুবই মজার ব্যাপার!" সে আশ্চর্য হলো।

"ধন্যবাদ।"

কিছুক্ষণের নীরবতা।

"কিন্তু তোমার তো কোনো কলা নেই!"

"না। একটা ওরাং-ওটাং আমার কলাগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছে।"

"একটি কি?"

"এটা এক দীর্ঘ কাহিনী।"

"কোনো টুথপেস্ট?"

"না।"

"মাছেদের পুষ্টি বাড়িয়েছে। কোনো সিগারেট?"

"আমি এর মধ্যে ওগুলো খেয়ে ফেলেছি।"

"তুমি এগুলো খেয়েছো?"

"আমার কাছে এখনও পাঁচটি ফিল্টার আছে। তোমার ইচ্ছে হলে নিতে পারো।"

"ফিল্টার! তামাক ছাড়া ফিল্টার দিয়ে আমি কি করবো? তুমি কি করে সিগারেট খেতে পারলে?"

"ওগুলো দিয়ে আর কিই-বা করতে পারতাম! আমি ধূমপান করি না।"

"ওগুলো বেচার জন্য রেখে দিতে পারতে।"

"বেচবো? কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

"আরে ভাই, যখন ওগুলো খাই তখন আমি ছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরে এক জীবনরক্ষীতে—একা।"

"তাতে কি?"

"তাই ঐ মধ্যসাগরে আমার কারও সাথে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না, যার কাছে আমি সিগারেটগুলো বেচতে পারি।"

"তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত ছিলো; বোকা ছেলে! এখন তোমার বেচবার কিছু নেই।"

"কিন্তু আমার কাছে যদি বেচবার কিছু থাকতোও, আমি কিজন্য এটা বেচতে যেতাম? তুমি কি করে ধারণা করলে যে আমি এটা বেচতে যেতাম।"

"আমার একটা বুটজুতা আছে," সে বললো।

"একটি বুটজুতা?"

"হ্যাঁ, একটি সুন্দর চামড়ার বুটজুতা।"

"প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যেখানে চামড়ার একটি বুটজুতা দিয়ে আমি কি করতাম? তুমি কি ভেবেছো সেখানে আমি অবসরে হাঁটতে বেরুতাম?"

"তুমি এটা খেতে পারতে!"

"একটি বুট খাওয়া? কি বুদ্ধি!"

"সিগারেট খেয়েছো আর একটি বুট খেতে পারতে না!"

"তোমার ধারণাটা বাজে। কার বুটজুতা, তাও আবার রাস্তায়?"

"আমি কি করে বলবো?"

"একজন অচেনা মানুষের বুট খাওয়ার বুদ্ধি দিচ্ছো?"

"তফাতটা কি হলো?"

"তুমি আমাকে হতবুদ্ধি করে দিলে। একটি বুটজুতা! আমি একজন হিন্দু—যে কিনা গরুকে দেবতা মানে সে খাবে চামড়ার বুট। এটা বাদ দিলেও ধুলা-ময়লার ব্যাপার? বানাবার পর থেকে বুটটা কতো ধুলা মাড়িয়েছে তার হিসেব আছে।"

"তাহলে তোমার কোনো বুট নেই।"

"আগে এটা দখতে দাও।"

"না।"

"কি? তুমি কি মনে করো যাকে দেখতে পাচ্ছি না সেই তোমার সাথে ব্যবসা করবো?"

"তোমাকে জানাতেই হচ্ছে, আমরা দু'জনই অন্ধ।"

"তাহলে বর্ণনা দাও। কি অসহ্য বিক্রেতা তুমি। এজন্যই বোধহয় খদ্দের পাও না।"

"ঠিকই বলেছো। বিক্রেতা হিসেবে আমি সুবিধার নই।"

"বেশ, তো বুটজুতা?"

"এটা একটা চামড়ার বুট।"

"কি *ধরনের* চামড়ার বুট?"

"সচরাচর যেমন হয়।"

"তার অর্থ?"

"একটি ফিতেওয়ালা বুট, ফিতে গাঁথার ছিদ্র আর একটি জিহ্বা। ভিতরে সুকতলি। সাধারণ মানের।"

"এটার রঙ কি?"

"কালো।"

"কি অবস্থায়?"

"ছেঁড়া। কিন্তু চামড়া খুব নরম এবং সহজেই এটাকে ধরে বাঁকা করা যায় আর খুব মোলায়েম।"

"আর ঘ্রাণ?"

"গরমের, আর চামড়ার ঘ্রাণ।"

"স্বীকার করতেই হয়, তুমি আমাকে ধাক্কায় ফেলে দিয়েছো।"

"তুমি এটা ভুলে যেতে পারো।"

"কেন?"

নীরবতা।

"কি ভাই, উত্তর দিচ্ছো না যে?"

"এখানে কোনো বুট নেই।"

"বুট নেই?"

"না।"

"এতো দেখছি পাগল করে ছাড়বে।"

"আমি এটা খেয়ে ফেলেছি।"

"তুমি বুট খেয়েছো?"

"হ্যাঁ।"

"এটা কি মজা?"

"না। সিগারেট কি মজা?"

"আমি এগুলো খেয়ে শেষ করতে পারতাম না।"

"আমিও বুটটা খেয়ে শেষ করতে পারিনি।"

"একদা এক কলা ছিলো এবং এটা বাড়ছিলো। এটা বেড়ে এক সময় বড়ো হলো, দৃঢ় হলো, হলুদ হলো এবং পেকে ঘ্রাণ বেরুলো। তখন এটি মাটিতে পড়ে গেলো এবং কেউ এসে পেয়ে এটিকে খেয়ে ফেললো। আর এটা খেয়ে লোকটার খুব ভাল লাগলো।"

"আমি দুঃখিত। আমি যা বলেছি এবং করেছি তার জন্য দুঃখিত। আমি একটা অকম্মা!" সে কেঁদে ফেললো।

"তুমি কি বোঝাতে চাইছো। তুমি হচ্ছো পৃথিবীর সবচেয়ে দামী এবং অদ্ভুত ব্যক্তি। এসো ভাই, আমরা একতাবদ্ধ হই এবং একজন আরেকজনের সঙ্গ অনুভব করি।"

"এসো!"

প্রশান্ত মহাসাগর নৌকা বাইচের জায়গা নয়, বিশেষ করে যারা দুর্বল এবং অন্ধ তাদের জন্য তো নয়ই। তার ওপরে বাতাসও সাহায্য করে না। সে কাছে ছিলো—দূরে ছিলো। সে আমার ডাইনে ছিলো—সে আমার বাঁয়ে ছিলো। সে আমার সামনে ছিলো—সে আমার পিছনে ছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা একটা ব্যবস্থা করতে পারলাম। আমাদের নৌকা 'ঘস্' করে

জঞ্জালের ওপর উঠে গেলো। কচ্ছপের পিঠের চেয়ে শব্দটা মধুর লাগলো। সে একটা নড়ি ছুঁড়ে দিলো এবং দড়িটা দিয়ে তার আর আমার নৌকা বাঁধলাম। আমি তার সাথে কোলাকুলি করার জন্য দু'বাহু বাড়িয়ে দিলাম। চোখ ভরে গেলো জলে এবং আমি হাসছিলাম। সে আমার সামনে। অন্ধ চোখের সামনে তার ঘোলাটে উপস্থিতি।

"ভাইটি আমার," আমি ফিসফিস করে বললাম।

"আমি এখানে," সে উত্তর দিলো।

আমি বিধ্বস্ত ঘর ঘর শব্দ শুনতে পেলাম।

"ওহ্ ভাই, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।"

সে সমস্ত ভার নিয়ে আমার ওপর পড়লো। আমরা পড়ে গেলাম। আমাদের অর্ধেক বইলো তারপুলিনে, অর্ধেক মাঝের বেঞ্চে। তার হাত আমার গলা খুঁজে পেলো।

"ভাই" আমি হাঁপাতে হাঁপাতে তার অত্যুৎসাহী কোলে নিঃশ্বাস ছাড়লাম। "আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সাথে কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে আমরা আমার জাহাজের অন্য অংশ মেরামত করতে পারি।"

"নির্মম সত্য কথাই বলেছো, তোমার হৃদয় আমার সাথেই।" সে বললো, "এবং তোমার কলজে, তোমার মাংস।"

আমি বুঝতে পারলাম সে তারপুলিনের ওপর দিয়ে হেঁটে মাঝবেঞ্চের ওপর উঠলো এবং নৌকার খোলের দিকে পা বাড়ালো।

"না, না ভাই আমার! যেও না! আমরা...নই।"

আমি তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গিয়েছিলো। 'একা' কথাটি উচ্চারণ করার আগেই আমি আবার একা হয়ে গেলাম। নৌকার খোলে শুধু নখরের আঁচড়ের শব্দ পেলাম। এটা চশমা পড়ে যাওয়ার শব্দের চেয়ে বেশি ছিল না। পর মুহূর্তেই আমার ভাই এমনভাবে আর্ত চিৎকার করে উঠলো যে, কোনো মানুষকেই আমি এভাবে আর্ত চিৎকার করতে শুনিনি। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেলো।

এই হচ্ছে রিচার্ড পার্কারের দুঃখজনক মহান আত্মদান। সে আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দিলো, কিন্তু একজনের মহান আত্মদানের মাধ্যমে। ঊর্মির কলধ্বনির মতো তার মাংস সে খুলে ফেললো মানুষের অবয়ব থেকে এবং মটমটিয়ে তার হাড় ভাঙলো। আমার নাকে তার রক্তের ঘ্রাণ পেলাম। আমার ভেতর ও কী যেন মরে গেলো যা আর কোনোদিন জীবন ফিরে পাবে না।

৯১

আমি আমার ভাইয়ের নৌকায় উঠলাম। হাতিয়ে হাতিয়ে এসব খুঁজে পেলাম। সে আমাকে মিথ্যে বলেছিলো। তার কাছে কিছু কচ্ছপের মাংস, একটি ডোরাডোর মাথা, এমনকি বিস্ময়করভাবে কিছু বিস্কুটের টুকরোও পেলাম। আর পেলাম পানি। আমি পুরো পানিটুকু এক চুমুকে শেষ করলাম। আমি তার নৌকা থেকে আমার নৌকায় এলাম।

আমি খুব কেঁদেছিলাম। পরিণামে তাতে আমার চোখের জন্য উপকারই হলো। চোখের উপরে এক চিলতে জানালার ফাটল খুলে গেলো। আমি আমার চোখে সমুদ্রের পানির ছিটা দিলাম। প্রতি ছিটাতেই জানালাটা একটু একটু করে খুলতে লাগলো। দু'দিনেই আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েই যা আমাকে দেখতে হলো তাতে মনে হচ্ছিলো এর চেয়ে বরং অন্ধ থাকাই ভালো ছিলো। তার ক্ষতবিক্ষত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ পড়ে ছিলো নৌকার খোলে। রিচার্ড পার্কার তার শরীরের বিভিন্ন অংশ চিবিয়েছে এমনকি তার মুখও ক্ষতবিক্ষত। আর তাই আমি আমার ভাইয়ের চেহারা দেখতে পারলাম না। তার হাত-পা-মাথাবিহীন দেহ থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়েছিলো। তার ভাঙা পাঁজর জাহাজের মতো বেঁকে ছিলো। দেখে মনে হচ্ছিলো আমাদের এই জীবনতরীরই ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন। এই ছিলো তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ভয়ঙ্কর পরিণতি।

আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে কোঁচ দিয়ে আমি তার একটি হাত টেনে এনে এর মাংস বড়শির টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমি আরও স্বীকার করছি বেঁচে থাকার চরম প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে আমি তার কিছু মাংস খেয়েছিও। অবশ্য শুকিয়ে যাবার পর কোঁচের মাথায় খুঁচিয়ে যতোটা মাংস আনা যায় এমন ছোট ফালি। খেতে অবশ্য অন্য পশুর মাংসের মতোই লেগেছে। নিজের অজান্তেই কখন এগুলো মুখে পুরেছি, খেয়েছি তা নিজেও বুঝতে পারিনি। একটি মাছ ধরতে পারার পর আমি ওর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।

আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে রোজ মোনাজাত করতাম।

৯২

অপ্রত্যাশিত চমকের মতোই একদিন গাছপালা আবিষ্কার করে ফেললাম। এমন অনেকেই হয়তো আছেন যারা আমার পরবর্তী উপাখ্যান বিশ্বাস করবেন না। তা সত্ত্বেও এটা আপনাকে বলতেই হচ্ছে কারণ এটা এই গল্পেরই অংশ এবং সত্যিই ঘটেছিলো।

একদিন দুপুরের দু'-তিন ঘন্টা পর কাত হয়ে শুয়েছিলাম। দিনটি ছিলো নরম রোদের আর ঝিরঝিরে বাতাসের। অল্প কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। কোনো স্বপ্ন-টপ্ন দেখিনি, এমনি এমনিই ঘুমটা ভেঙে গেলো। ভাবলাম পাশ ফিরলে শরীরে একটু বল পাওয়া যাবে—যেমনটি আমার ক্ষেত্রে হয় আর কি। তো পাশ ফিরলাম এবং চোখ খুললাম।

খানিক দূরে গাছ দেখতে পেলাম। আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম ঘোরের মধ্যে এটা দেখেছি এবং এখনই তা মরীচিকার মতো উঠে যাবে।

কিন্তু গাছগুলো থেকে গেলো। শুধু তাই নয়, বড়ো হতে হতে এগুলো বনের আকার নিলো। এটা একটা নিচু সমতলের দ্বীপের অংশ। নিজেকে অনেকটা ঠেলেই তুললাম। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। শরীরের রোমে রোমে রোমাঞ্চ। গাছগুলো কী সুন্দর! এ ধরনের গাছ আমি আগে কখনও দেখিনি। গাছগুলোর ছাল পাণ্ডুর আর ডালগুলো চারদিকে সমানভাবে ছড়ানো। তাতে নজরকাড়া প্রচুর পাতা। পাতাগুলো উজ্জ্বল সবুজ। এতো উজ্জ্বল সবুজ যে ঠিক পান্নার মতো। এর কাছে মৌসুমী শাক-সবজির সবুজ অনেকটা বাদামী হয়ে আসা জলপাই পাতার মতো।

আমি বার বার চোখ কচলালাম, যেনো চোখে করাতকলের কাঠের গুঁড়ো ঢুকেছে। কিন্তু না, গাছগুলো এখনও দিব্বি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নিচে তাকালাম। যা দেখলাম তাতে যেমন খুশি হলাম তেমনি হতাশও হলাম। দ্বীপটাতে কোনো মাটি নেই। আবার গাছগুলো পানিতেও দাঁড়িয়ে নেই বরং তারা নিবিড় সবুজের ওপর দাঁড়িয়ে। তলার গুল্মের পাতাগুলোও গাছের পাতার মতোই উজ্জ্বল সবুজ। মাটিহীন জায়গার কথা কে কবে শুনেছে? গাছগুলো দেখছি নিবিড় গুল্মের ওপর গজিয়েছে! খুশি

হলাম এ কারণে যে, এমন ভূ-চিত্র সন্দেহাতীতভাবেই অলীক কল্পনা মনের ভুল। একই সাথে হতাশ এ কারণে যে একটি দ্বীপ, তা সে যে কোনো দ্বীপই হোক না কেনো, যতো অদ্ভুতই হোক না কেনো আক্রমণাত্মক হতে বাধ্য।

গাছগুলো যেমন নিরবধি দাঁড়িয়েছিলো, আমিও নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলাম। নীলের রাজ্যে থেকে থেকে এমন সবুজের দর্শন আমার দৃষ্টিকে মধুর সঙ্গীতসুধায় সিক্ত করছিলো। সবুজ হচ্ছে এক মুগ্ধ করা রঙ। এটা ইসলাম ধর্মের রঙ, আমার প্রিয় রঙ।

স্রোতে ভেসে ভেসে নৌকাটা মায়াদ্বীপের আরও কাছে চলে এলো। এর তীরকে ঠিক সৈকত বলা যাবে না। তীরে কোন বালিও নেই, নুড়িও নেই। এমনকি পাড়ে কোন ফেনাও জমে নেই, কারণ ঢেউগুলো এসে সোজা হারিয়ে যাচ্ছে সবুজের দঙ্গলে। একপ্রান্ত থেকে তিনশ' গজের মতো হবে দ্বীপটা। দ্বীপটা ঢালু হয়ে ঢুকে গেছে সমুদ্রে। চল্লিশ গজের মতো ঢালু হয়ে এসে সবুজের এ আঁচলটি সোজা ঢুকে গেছে প্রশান্তের গভীরে। সম্ভবত এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো মহাদেশীয় সোপান।

মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর ইতি ঘটানোর জন্য রাস টেনে ধরলাম। নৌকাটা যখন দ্বীপে লাগলো আমি নড়লাম না। তখনও স্বপ্নের ঘোরেই ছিলাম। পুরো দ্বীপটা মনে হয় নলখাগড়ার মতো এ সামুদ্রিক গুল্মে গালিচার মতো বোনা যার ব্যাস হবে দু'আঙুলের চেয়ে একটু কম। কী মজার দ্বীপ—ভাবলাম।

কয়েক মিনিট পর হামাগুড়ি দিয়ে নৌকার এক পাশে গেলাম। "সবুজ খোঁজো"—টিকে থাকার তথ্যপঞ্জির কথাটি মনে পড়ে গেলো। বেশ, এই তো সবুজ পেলাম। সবুজ কি, এটা তো ক্লোরোফিলের স্বর্গ। খাদ্যবস্তু এবং নিয়নে তো এই সবুজেরই প্রলেপ। মাতাল করা সবুজ। "পা-ই হচ্ছে মাটি খুঁজে পাবার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অঙ্গ"—তথ্যপঞ্জির নির্দেশ। দ্বীপটি এখন পা বাড়িয়ে পৌঁছে যাবার মতো দূরত্বে। পরখ করে হতাশ হবো—নাকি পরখ করবোই না এ দোদুল্যমানতায় ভুগছিলাম।

শেষপর্যন্ত পরখ করারই সিদ্ধান্ত নিলাম। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম হাঙর আছে কিনা। না, নেই। নৌকার মাথাকাঠে পেট ঠেকিয়ে তারপুলিন আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে একটা পা নামালাম। আমার পা পানি ছুঁলো। ওহ্! কী চমৎকার ঠাণ্ডা পানি। আর একটু পা বাড়ালেই মাটি পাওয়া যাবে, পানির নিচে কাঁপছে। আমি পা টান করলাম। আশা করছিলাম ঘোর লাগা বুদ্বুদটা যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে।

কিন্তু না। আমার পা পরিষ্কার পানিতে ডুবে গেলো এবং রবারের মতো নরম কিন্তু শক্ত জিনিসে ঠেকলো। আমি আর একটু ভর দিলাম। তখনও কিছুটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আমি পায়ের ওপর পুরো ভর দিলাম। আরে ডুবে যাইনি! আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

চূড়ান্ত রায় দেবে আমার নাক—এটা মাটি না অন্য কিছু। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সজাগ করলাম। লম্বা শ্বাস নিয়ে শুকে দেখলাম—আরে কী তাজা ঘ্রাণ? আমি আনন্দে আত্মহারা—গাছ-গাছালির ঘ্রাণ। আমি বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিলাম। মাসের পর মাস লোনাজলের গন্ধের পর এই তাজা গাছ-গাছালির ঘ্রাণ আমাকে মাতাল করে তুললো। এবার আমার বিশ্বাস হলো যে সত্যিই তীরের সন্ধান পেয়েছি। এই তুমুল উত্তেজনা আমার বিধ্বস্ত স্নায়ু যেনো আর সইতে পারছিলো না। আমার পা কাঁপতে শুরু করলো।

"ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর!" আমি বিড়বিড় করতে লাগলাম। আমি নৌকার বাইরে পড়ে গেলাম।

শক্ত মাটি এবং ঠাণ্ডা পানি আমাকে শক্তি যুগিয়ে তীরের দিকে নিয়ে চললো। আমি আধো আধো বোলে শুধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে থাকলাম এবং পড়ে গেলাম।

কিন্তু আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমি এখন উত্তেজনার তুঙ্গে। আমি পায়ের ওপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। আমার মাথা মনে হয় রক্তশূন্য হয়ে গেছে। পায়ের নিচে ভয়ানকভাবে কাঁপছে মাটি। মাথা ঝিমঝিম করছে—চোখে অন্ধকার দেখছি। মনে হয় মূর্ছা যাবো। নিজেকে শান্ত করলাম। তবু নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। হাঁপরের মতো বুক ওঠা-নামা করছে, রীতিমতো হাঁপাচ্ছি। কোনো রকমে উঠে বসলাম।

"রিচার্ড পার্কার! কূলের নাগাল পেয়েছি! কূলে উঠেছি, কূল, মাটি! আমরা নিরাপদ!" আমি চিৎকার করে বললাম।

এই গুল্মের ঘ্রাণ খুব জোরালো। এতো তরতাজা সবুজ আমার ভেতর শক্তি এবং আমেজ এনে দিচ্ছে। চোখ দিয়ে যেনো সবুজের সুধা পান করছি।

এই অদ্ভুত নলাকৃতির জট পাকানো গুল্মটা কী? এটা কি খাওয়া যায়? মনে হয় এটা এক ধরনের সমুদ্র শৈবাল, কিন্তু বেশ শক্ত। স্বাভাবিক শৈবালের চেয়ে একেবারে ভিন্ন। হাতের চাপে এটা ভিজে যাচ্ছে এবং মচমচে। একটা ধরে টান দিতে সহজেই উঠে এলো। এর কাণ্ডের দুটি দেয়াল। বাইরের ভেজা এবং কিছুটা খসখসে অংশটা গাঢ় সবুজ তার নিচে একটু ফাঁপা জায়গা, আর একেবারে ভেতরে সাদা শক্ত মূল অংশ। একটি টেনে তুলে নাকের কাছে ধরলাম। স্বাভাবিক তৃণের ঘ্রাণের সাথে অন্যরকম এক ঘ্রাণ। আমি একটু চেটে দেখলাম। আমার নাড়ি দ্রুত চলতে শুরু করলো—বিশুদ্ধ পানি!

একটু কামড়ালাম। কিছুটা হোঁচট খেলাম। ভেতরের অংশ খুব নোনতা। কিন্তু বাইরের অংশ শুধু খাওয়া যায় তাই নয়, পুষ্টিকরও। আমার জিভ কাঁপতে লাগলো, যেমন আঙুল কাঁপে বহুদিন আগে ভুলে যাওয়া কোনো শব্দ ডিকশনারিতে খুঁজতে গেলে। আঙুল ডিকশনারিতে শব্দটি খুঁজে পেলে যে দশা হয়—আমার জিভের দশাও তাই। আমার জিভ স্বাদ খুঁজে পেয়েছে: *মিষ্টি!* শুধু ভালো অর্থে মিষ্টি নয়—রীতিমতো চিনির স্বাদ। সমুদ্রে কতো কী-ই না খেয়েছি, কিন্তু কোথাও এই মিষ্টি স্বাদ পাইনি! আমাদের কানাডার বাড়ির ম্যাপল গাছের মতোই এটা মিষ্টি! আরও কাছাকাছি উদাহরণ হচ্ছে জল-কাঠবাদাম।

আমার শুকনো মুখ ভরে গেলো মিষ্টি লালায়। আনন্দে চিৎকার করতে করতে আমি এ গাছগুলো ছিঁড়তে লাগলাম আর চিবুতে লাগলাম চারপাশ থেকে। শৈবালের ভেতরের নোনতা অংশ আর বাইরের মিষ্টি অংশ সহজেই পৃথক করা যাচ্ছিলো। আমি বাইরের মিষ্টি অংশ খেতে লাগলাম। আমি দুই হাতে এগুলো ছিঁড়তে লাগলাম আর খেতে লাগলাম। আমার হাত আমার মুখকে দ্রুত চিবাতে বাধ্য করলো। আমার চারদিকের শৈবাল শেষ হয়ে একটা পরিখার মতো তৈরির আগ পর্যন্ত আমি ছিঁড়তে থাকলাম আর চিবাতে থাকলাম।

একাকী একটি গাছ দাঁড়িয়ে ছিলো প্রায় দুইশ' গজ দূরে। পাড় থেকে ঢালের দিকে এটি একমাত্র গাছ, মনে হচ্ছে এটি অনেক দূরে। আগে যেমনটি বলেছিলাম—দ্বীপটি বেশ নিচু। সমুদ্র থেকে উঠে উঁচু হতে হতে এটি মাত্র পঞ্চাশ-ষাট ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়েছে। কিন্তু আমার তখন এমনই অবস্থা যে এ উচ্চতাকেই মনে হচ্ছিলো পর্বতের মতো। গাছটা আমাকে আরও আকর্ষণ করতে থাকলো। এর ছায়ার মায়ায় পড়ে গেলাম। আবার দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। গুটিশুটি মেরে আসন পিঁড়ি অবস্থায় এলাম। কিন্তু যেই উঠে দাঁড়াতে গেলাম, মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারলাম না। তাই বলে মুখ থুবড়ে পড়লাম না। আমার পা আর

আমাকে ধরে রাখতে পারছিলো না। আমি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল। সামনে এগিয়ে যেতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হামাগুড়ি দিয়ে, মাটিতে মাটিতে নিজেকে কোনোমতে টেনে নিলাম গাছের কাছে।

খুশিতে আত্মহারা আমি নিজেকে যেনো ধরে রাখতে পারছিলাম না। গাছটা এমন মায়াময় ছায়ায় ঘেরা, এর পাতাগুলো এতো চমৎকার চিত্রবিচিত্র আর চকচকে, তার ওপর ঝিরঝিরি বাতাসে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি—মুগ্ধ আবেশে আমাকে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গেলো এটা। গাছটা যে দ্বীপটির সবচেয়ে বড়ো এবং সুন্দর তা নয়। দ্বীপটির প্রান্তভাগের উঁচুটা দিকে গড়ানো জায়গায় বলে বেশি আলো ঝলমলে ছিলো। এটি বরং দ্বীপের অন্যান্য গাছের তুলনায় চিকন এবং ছোটই ছিলো। কিন্তু তারপরও এটা একটা গাছ। আর এ গাছটিই এতোদিন উত্তাল, ঊষর সাগরে ধুকে ধুকে বেঁচে ওঠার পর প্রথম দেখা গাছ। গাছটিকে বন্দনা করে আনন্দে গান গেয়ে উঠলাম। গাছটির প্রশংসা করতে করতে আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করলাম আর আনন্দে কেঁদে ফেললাম।

আল্লাহ্‌র অপার মহিমার প্রশস্তি গীতে আমার হৃদয় মন সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলো। মাটির কোনো চিহ্ন নেই। শৈবালে নিবিড় বুনট থেকে উঠে গেছে গাছের কাণ্ড। মাটি থাকলেও অনেক গভীরে। অথবা এমনও হতে পারে—গাছটি পরজীবী। গাছের কাণ্ড মানুষের বুকের সমান মোটা। ধূসর সবুজ রঙের ছাল পাতলা এবং মসৃণ। এটি এতো নরম যে সহজেই কচি লাউয়ে নখ দাবানোর মতো নখ দাবাতে পারলাম। হৃৎপিণ্ড-আকারের মতো পাতাগুলো বেশ বড়ো এবং চওড়া এবং এক পত্রশীর্ষবিশিষ্ট। গাছটির মাথা ছাতার মতো গোল, অনেকটা আম গাছের মতো।

একটি গর্জন শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি রিচার্ড পার্কার নৌকা থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। সে দ্বীপটিকেও দেখছিলো। দেখে মনে হলো সে নিচে নামতে চাইছে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে। পায়চারি করতে করতে শুকতে শুকতে একসময় সে নেমেই গেলো। আমি কমলা রঙের বাঁশিটা মুখে নিলাম। বলা তো যায় না—আক্রমণ যদি করেই বসে?

খেয়ে, বিশ্রাম করে এবং দাঁড়ানোর চেষ্টা করে করে সুখের সাগরে বিশ্রাম করে করে আমি দিনটা কাটালাম। আবেগের মাত্রা বেড়ে গেলেই আমার বমি বমি লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো পায়ের নিচের মাটি যেনো সরে সরে যাচ্ছে। আর আমি পড়ে যাচ্ছি। এমনকি বসা অবস্থায়ও এমন লাগছিলো।

পড়ন্ত বিকেলে উদ্বেগের সাথে রিচার্ড পার্কারের কথা ভাবতে লাগলাম। এখন রাজ্যপাট বদলে গেছে। বদলে গেছে ওর আর আমার রাজ্যসীমা। এখন আমার সাথে ও কেমন আচরণ করে কে জানে!

নিরাপত্তার কথা ভেবে হামাগুড়ি দিয়ে আমি নৌকায় উঠে গেলাম। নৌকাটা বাঁধা দরকার। বলা তো যায় না—যদি ভেসে যায়! খুঁজে পেতে একটি বৈঠা নিয়ে বৈঠার হাতলের দিক গেড়ে দিলাম ঘন শৈবালের দঙ্গলে। তারপর এর সাথে নৌকাটা বেঁধে নিলাম।

হামাগুড়ি দিয়ে তারপুলিনের ওপর উঠে গেলাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিলো। সারাদিন এতো বেশি পরিমাণে খেয়েছি, আর হঠাৎ এ ভাগ বদলে মনের ভেতর এতো উত্তেজনা যে আমার স্নায়ু এর ভার যেনো সইতে পারছে না। দিন শেষ হয়ে এলে আমি যেনো দূরে রিচার্ড পার্কারের গর্জন শুনতে পেলাম, কিন্তু ততোক্ষণে আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে।

তলপেটে এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো। ভাবলাম শৈবালগুলো বুঝি বিষাক্ত, তাই পেটে খিল ধরছে। একটা শব্দ হলো। রিচার্ড পার্কার নৌকায়।

আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন সে উঠে এসেছে নৌকায়। সে মিঁয়াও মিঁয়াও করছিলো আর পায়ের থাবাগুলো চাটছিলো। তার ফিরে আশা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলার আগেই পেটে খিল ধরার মাত্রা বেড়ে গেলো আর প্রচণ্ড ব্যথা করতে লাগলো। আমার শরীর কাঁপতে লাগলো এতে। খুব কষ্ট করে পায়খানা করলাম। আর কি আশ্চর্য, এরপর খুব আরাম লাগতে লাগলো। আর এমন ঘুম দিলাম যে *সিমিটসুম* জাহাজ ডোবার আগের রাতেই শুধু এমনটি ঘুমিয়েছিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছুটা সতেজ লাগছিলো। কালকের চেয়ে শক্ত-পোক্তভাবে হামাগুড়ি দিয়ে নির্জন গাছটির তলায় চলে এলাম। শৈবাল খেয়ে খেয়ে যেমন পেট ভরাচ্ছিলাম, সকালের সোনা রোদে গাছটির পাতা দেখে দেখে তেমনি মন ভরাচ্ছিলাম। শৈবাল তুলে খেতে খেতে গাছের চারপাশে গর্ত করে ফেললাম।

নৌকা থেকে নামার আগে আজও রিচার্ড পার্কারের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা দেখা গেলো। মধ্য সকালে সে লাফিয়ে নামলো। তার অর্ধেক শরীর পড়লো জলে, অর্ধেক ডাঙায়। তাকে আজ বেশ উত্তেজিত লাগছে। সে থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে হিস হিস করতে করতে অন্যদিক দিয়ে উঠে হারিয়ে গেলো দ্বীপে।

একদিন গাছে ঠেস দিয়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। মনে হচ্ছিলো মাটি কাঁপছে আর সবকিছু দুলছে। চোখ বন্ধ করে এবং গাছটা আঁকড়ে ধরেই কেবল এটা থামাতে পারছিলাম। আমি গাছটাকে ধাক্কা দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলাম। সাথে সাথে পড়ে গেলাম। তবে চোট পেলাম না। দ্বীপটি এমন ঠাস বুনটের নরম শৈবালে মোড়া যে মনে হলো আবার হাঁটতে শেখার জন্য এটা উত্তম জায়গা। যেভাবেই পড়ে যাই না কেনো, ব্যথা পাবো না।

আরেক রাত আয়েশে ঘুমানোর পর পরদিন সকালে হাঁটতে সক্ষম হলাম। আজ রাতেও রিচার্ড পার্কার ফিরেছিল। প্রায় আধ ডজনবার পড়ে গিয়ে আমি গাছের কাছে পৌছতে পারলাম। এটা টের পাচ্ছিলাম যে প্রতি ঘণ্টাতেই আমার শক্তি বাড়ছিলো। কোঁচ বিঁধিয়ে গাছের একটি ডাল টেনে আনলাম। কয়েকটা পাতা ছিঁড়লাম। পাতাগুলো নরম এবং অপিচ্ছিল। আর স্বাদ তেতো। রিচার্ড পার্কার নৌকায় তার জায়গাতেই ছিলো—আরেক রাতে তার ফিরে আসার ব্যাপারে এই ছিলো আমার ব্যাখ্যা।

বেলা ডুবে যাচ্ছিলো। আমি বৈঠায় নৌকা ঠিকমতো বাঁধা আছে কিনা দেখে নিচ্ছিলাম। বৈঠাটা পানিতে ডুবে ছিলো। এমন সময় সে ফিরে এলো। আগের মতো ভয়ঙ্কর দর্শন—জলজ্যান্ত বাঘ, রিচার্ড পার্কার। ও এগিয়ে আসছিলো। আমি গলার বাঁশি বাজিয়ে ওকে বশ করতে চাইছিলাম।

আমি পড়েছি দুই ধরনের ভয় আছে যা কখনও আমাদের ছেড়ে যায় না : অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড শব্দের চমকের প্রভাব এবং মাথা ঝিমঝিম করা। আমি এর সাথে আরেক ধরনের ভয়কে যোগ করতে চাই—অনবরত এবং সরাসরি কোনো ঘাতকের এগিয়ে আসার ভয়।

রিচার্ড পার্কার নৌকায় উঠে আসছে। আমি লকার খুলে বাঁশিটা খুঁজলাম। পেলাম না। অগত্যা গুটিগুটি মেরে রইলাম তারপুলিনের ওপর। রিচার্ড পার্কার এসে নৌকার পিছনদিক দিয়ে উঠলো। সে নৌকার মাথাকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে কয়েক মুহূর্ত দেখলো। ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে গেলো। কিন্তু সে আমাকে আক্রমণ করলো না। সে তার জায়গায়, তারপুলিনের তলায় আশ্রয় নিলো। আমি তারপুলিনের উপরে। মনে হচ্ছিলো—ইস, পাখা থাকলে এই মুহূর্তে উড়ে পালিয়ে যেতাম।

আমি নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিতে চাইলাম যে, দীর্ঘদিন ধরেই তো আমরা একসাথে বাস করছি। সে তারপুলিনের তলায়—আর আমি উপরে।

সকালে রোজকার মতো সে নৌকা থেকে দ্বীপে নেমে গেলো।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আর একটু সবল হলে দ্বীপটা ঘুরে দেখতে হবে। সৈকতের বিস্তার দেখে মনে হয় দ্বীপটা বেশ বড়োই হবে। একদিন আমি নৌকা থেকে গাছ এবং গাছ থেকে নৌকায় হাঁটাহাঁটি করে পায়ের জোর বাড়ানোর অনুশীলন করলাম। কতোবার যে পড়ে গেলাম। যতোবার পড়লাম ততোবার শৈবাল তুলে তুলে খেলাম।

গতকালের চেয়ে একটু আগেই আজ রিচার্ড পার্কার ফিরলো। আমি তার আসার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। আমি শক্ত করে বসে থাকলাম এবং বাঁশি বাজালাম না। সে কিনারা থেকে এক লাফে নৌকায় উঠে এলো। আমার দিকে না তাকিয়ে একরাশ ভয়ের দোলায় দুলিয়ে সে তার জায়গায়—তারপুলিনের তলায় আশ্রয় নিলো।

পরদিন সকালে রিচার্ড পার্কার বেশ খানিকটা পথ চলে যাবার পর আমি নামলাম। আজ দ্বীপটা ঘুরে দেখবো। আমি দ্বীপের প্রান্তে উঠে গেলাম। একবারও পড়লাম না। পাগুলো দুর্বল হলেও দ্বীপের প্রান্তের পর কি আছে দেখার জন্য আমাকে বয়ে নিয়ে গেলো।

উপরে উঠে দেখলাম পুরো দ্বীপটাই শৈবালে ছাওয়া। আমি এক সবুজ উপত্যকা দেখতে পেলাম, যার মাঝখানে একটি সবুজ বন। আমি বনটার চারদিকে তাকালাম। দেখলাম ছড়িয়ে আছে একইরকম দেখতে বেশকিছু পুকুর। আর পুকুরের চারপাশে পাতলাভাবে একইরকম করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গাছ। সবকিছু মিলে সন্দেহাতীতভাবে এটি একটি পরিকল্পিত ব্যাপার।

কিন্তু 'মীরকাটগুলো' আমার মনে যে ছাপ ফেলেছে তা কোনোদিনই মুছে যাবে না। এক পলকে যা দেখলাম তাতে একসাথে শত শত হাজার হাজার 'মীরকাট'তো হবেই। পুরো দৃশ্যপট জুড়েই এদের বিস্তার। আমি যখন হাজির হলাম এর সবগুলোই আমার দিকে ঘুরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেনো ফার্মের মুরগি।

আমাদের চিড়িয়াখানায় কোনো মীরকাট ছিলো না। কিন্তু আমি এগুলো সম্বন্ধে পড়েছি। বইতেও পড়েছি সাময়িকীতেও পড়েছি। মীরকাট হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী, অনেকটা বেজি বা নেউলের মতো। মাটিতে গর্ত করে বাস করা মাংসাশী এরা। একটি পরিণত মীরকাট এক ফুটের মতো লম্বা হয় এবং এর ওজন হয় প্রায় দুই পাউন্ড। বেজির মতো রোগা গড়নের এ প্রাণীগুলোর নাক শূকরের মতো লম্বা। চোখ দুটি মাথার সামনে, ছোট্ট পা, থাবাগুলোর নখ চারটি এবং লম্বা। নখগুলো উল্টাদিকে বাঁকানো নয়, লেজটা প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা। চামড়ার রঙ হাল্কা বাদামী থেকে ধূসর। লেজের কাছে কালো বা বাদামী ঘের। এর কান এবং চোখের চারপাশটা কালো। সুঠাম দেহের মীরকাট দেখতে বেশ। এদের আচরণ আটপৌড়ে এবং সামাজিক। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে এরা অন্য অনেককিছুর সাথে বিচ্ছুও খায়, কারণ বিচ্ছুর বিষ এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এরা যখন খাদ্য খোঁজে বা অন্য কিছু খোঁজে তখন এগুলো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে লেজে ভারসাম্য রেখে দাঁড়ায়। একদল মীরকাট এমন ভঙ্গিতে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে মনে হয় একদল যাত্রী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনের পাগুলো এমনভাবে ঝুলে থাকে যে মনে হয় কোনো বাচ্চা ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়েছে বা ছবি তোলার পোজ দিচ্ছে।

শত শত হাজার হাজার নয় লাখ লাখ মীরকাট দাঁড়িয়ে আছে আমার চারদিকে। আমার চারদিকে ওরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন বাধ্য ছাত্রের মতো বলছে—"ইয়েস স্যার।"

দাঁড়িয়ে থাকা মীরকাট একবারে আঠারো ইঞ্চির বেশি এগুতে পারে না। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম নীরবে। আমি যদি এখন এগুলোকে তাড়া করতে যাই তাহলে কী যে বিশৃঙ্খলা হবে ভাবতেও পারছিলাম না। ওরা যেভাবে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য ওরা যার যার কাজে ফিরে গেলো। একসাথে এতো প্রাণী দেখে আমার মসজিদে নামাজের সময়ের কথা মনে পড়ে গেলো।

মীরকাটগুলো মনে হয় মোটেও ভয় পায়নি। সমুদ্র পাড় থেকে আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে কেউ সামান্য ভয়ও পেয়েছে বলে মনে হলো না। আমি ইচ্ছে করলে ওদের ছুঁতে পারি। যে কোনো একটাকে ধরে কোলে নিতে পারি। কিন্তু আমি এর কিছুই করলাম না। আমি এগিয়ে গেলাম। এটা বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মীরকাট কলোনি! বাতাসে অবিরাম ভাসছে ওদের চ্যাচামেচির শব্দ। ওদের এ শব্দ শুনে মনে হচ্ছিলো আকাশ কালো করা বিশাল কোনো এক ঝাঁক পাখির কাকলির কথা।

ওরা আমাকে দেখে ভয় পেলো না কেনো? ওরা কি ভেবেছে উল্টো আমারই ভয় পাওয়া উচিত? একটু পরেই বুঝতে পারলাম এরা একেবারেই নিরুপদ্রব প্রাণী।

একটি পুকুর পাড়ে গিয়ে পা দিয়ে এদের কয়েকটা তাড়িয়ে দিলাম। ওরা এটাকে শত্রুভাবাপন্ন হিসেবে নিলো না। বরং সরে গিয়ে আমাকে পথ করে দিলো। আমি পুকুরের কাছে যেতেই পায়ের ওপর দিয়ে কয়েকটা চলে গেলো। আমি ওদের শরীরের উষ্ণতা অনুভব করলাম।

প্রতিটি পুকুরই গোলাকার এবং প্রায় সমান আকারের। মোটামুটি এদের ব্যাস গড়পড়তা ৪০ ফুট। আমি আশা করেছিলাম এগুলো হবে অগভীর। কিন্তু উঁকি দিতেই দেখি গভীর নীল পানি। দেখলাম এদেরও চারপাশে সবুজ শৈবাল।

একটা ব্যাপার আমাকে আশ্চর্য করলো। একটা নির্দিষ্ট পুকুরে কোনো মীরকাটের চ্যাচামেচি ছিলো না। এটাতে মীরকাটগুলো এমন ত্রস্তভাবে লাফিয়ে নামছিলো এবং উঠছিলো যে ওদের যেনো কিছুতে তাড়া করছে। হঠাৎ শত শত মীরকাট এতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদের মধ্যে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি লেগে গেলো কার আগে কে লাফিয়ে পড়বে। এমনকি রুগ্ন এবং বাচ্চারাও ছুটলো তাদের মা-বাবার হাত ধরে। আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম। কারণ এদের এ চরিত্রের সাথে কালাহারি মরুভূমির মীরকাটদের কোনো মিলই নেই। এরা বোধহয় মীরকাটদের কোনো বিশেষ ধরনের প্রজাতি।

ওদের এই কারবার দেখে আমিও ওই পুকুরটির দিকে ধেয়ে গেলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম মীরকাটরা সাঁতরাচ্ছে—হ্যাঁ সত্যি সত্যি সাঁতরাচ্ছে। শুধু কি সাঁতরাচ্ছে, ডজনে ডজনে মাছ ধরে আনছে দল বেঁধে। তাও আবার ছোট মাছ নয়। ডোরাডো। কোনো কোনো ডোরাডো তো নৌকায় যে ডোরাডোগুলো খেয়েছি তার চেয়ে বড়ো। বেশির ভাগ ডোরাডোই গায়ে গতরে মীরকাটদের চেয়ে ছোট। আমি ধন্ধে পড়ে গেলাম। কী করে মীরকাটরা এটি পারছে!

এরা সেই মীরকাট যারা হুড়োহুড়ি করে এই পুকুরে নেমেছে। আমি আশ্চর্য হলাম ওরা যে মাছগুলো আনছে সেগুলো মরা। কিন্তু তাই বলে মীরকাটরা এগুলো মারেনি।

আমি পুকুরের পানিতে হাত নামালাম। পানি খুব ঠাণ্ডা। একটা স্রোত বইছে যা সাগরের ঠাণ্ডা পানিকে পুকুরে নিয়ে আসছে। আঁজলা ভরে পানি তুললাম। মুখে দিলাম। আরে! একটুও নোনতা নয়। বিশুদ্ধ পানি। এবার আমি বুঝলাম ডোরাডোগুলোর মৃত্যুর কারণ। নোনা পানির মাছ বিশুদ্ধ পানিতে এলে মরে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদ্রের মাছ এখানে এলো কী করে।

আমি দ্রুত অন্য একটি পুকুরের পানি চেখে দেখলাম। বিশুদ্ধ পানি! এভাবে পর পর চারটি পুকুরের পানি চেখে একই অভিজ্ঞতা হলো। উত্তর খুঁজতে খুঁজতে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর একটা বের করলাম। শৈবাল। শৈবাল তো সর্বদা লবণ পানিতে ছেঁকে বিশুদ্ধ পানি করতেই পারে। আগেই দেখেছি পুকুরটাও শৈবালে ঘেরা। আর এজন্যই শৈবালের বাইরের অংশ মিষ্টি আর ভেতরের অংশ অমন তিতা।

আমি একটা পুকুরে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারলাম না। শরীর ভীষণ রুক্ষ। আমার শরীর, এমনকি চুল পর্যন্ত লবণের গাদে পরিণত হয়েছে। আমার চুলগুলো বড়ো হয়ে গিয়েছিলো। আমি ডলে ডালে শরীরের লবণ চুলের লবণ ধুতে থাকলাম।

হঠাৎ মীরকাটগুলো দূরে তাকালো। মানুষের মতো তারা একসাথে তাকালো। ব্যাপার কি দেখার জন্য তাকাতেই দেখি রিচার্ড পার্কার! এগিয়ে আসছে বাংলার বাঘ। কী তার চেহারা—কী বলিষ্ঠ তার ভঙ্গি! ওর দেখলাম মীরকাটগুলোর দিকে কোন নজর নেই। যদিও তখন আমার থেকে অনেক দূরে—ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে গেলো। এবার নিশ্চয়ই আমার পালা! এবার সে মীরকাটগুলো মারতে লাগলো। হত্যার জন্য মারা। খাওয়ার জন্য নয় পশুরা হত্যার জন্য মারলে তাকে খায় না। খাওয়ার জন্য মারার ধরনই আলাদা। বাঁশি, বাঁশি কোথায়? আমি গলায় বাঁশি খুঁজলাম।

পরদিন সকালে ও নৌকা থেকে নেমে যাবার পর আমি নৌকা পরিষ্কার করলাম। ও নেই তবু ভয়ে ভয়ে ওর জায়গায় হাত দিলাম না। কোঁচ দিয়ে টেনে আনলাম জঞ্জাল। কতো কী যে আছে এখানে। হাড়-গোড়—আগের জন্তুগুলোর তো ছিলোই, ডোরাডো, কচ্ছপ, এমনকি মীরকাটের অনেক দেহাবশেষ। কি গন্ধ! বালতি দিয়ে পানি তুলে তুলে ধুতে থাকলাম।

পরের দিনগুলো খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে কাটালাম। একদিন দ্বীপে ঘুরছি। উঠলো তুমুল ঝড়। সে কি ঝড়! মনে হয় সবকিছু ভেঙে তছনছ করবে। বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো দ্বীপে। অবশ্য ঢেউগুলো শৈবালের দঙ্গলে হারিয়ে যেতে থাকলো। ঢেউগুলো পার হয়ে গেলো যেনো উপকূলে আঘাত না করেই! অনেকটা ভোজবাজির মতো এগুলো হারিয়ে যেতে থাকলো।

গাছগুলো পরগাছা নয়। এর শেকড় দেখলাম শৈবালের দঙ্গলে হারিয়ে গেছে। গাছগুলোর কোন ফুল বা ফল নেই। একদিন জঙ্গলে ঘুরে বড়ো একটি গাছ বেছে নিয়ে তাতে নিচু দুটো শাখায় নৌকা থেকে আনা জাল টাঙিয়ে কম্বল বিছিয়ে নিলাম। এখন থেকে রাতে এখানেই থাকবো।

রাতে শুয়ে আছি। হঠাৎ বাতাসে এক অদ্ভুত চেঁচানির আওয়াজে সেদিকে তাকালাম। আরে দলে দলে লাখ লাখ মীরকাট এগিয়ে আসছে। ওরা যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পরে দেখলাম শুধু আমার দিকে নয়—প্রতিটি গাছের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদের ভাবসাব অনেকটা হিংস্র। তবে কি রাতে হিংস্র হয়ে ওঠে? এ কারণেই কি রিচার্ড পার্কার রাতে দ্বীপে না থেকে নৌকায় ফিরে যায়। ওরা এসে আমাকে ছেয়ে ফেললো। এখন আমার শরীর বাদামী রঙে ছাওয়া। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার শরীরের ওমে ঘুমিয়ে আছে মীরকাটগুলো।

বার বার রিচার্ড পার্কার আমার জীবন বাঁচাতে লাগলো। এখন ওকে সার্কাসের প্রাণীর মতোই এ দ্বীপে পোষ মানাচ্ছি। একটা লম্বা ছড়ি ধরি আর বাঁশি বাজাই। ও দৌড়ে এসে লাফিয়ে লাঠিটা পেরিয়ে যায়। ঘোরে। আবার আমি ছড়িটা মেলে ধরি—ও দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায়। এভাবে তিনবার পর্যন্ত ওকে লাফ দেয়াতে সক্ষম হলাম।

এরপর একদিন বনে ঘুরছি। দেখি একটি গাছে সবুজ ফল। এসব বনে অবশ্য মানুষখেকো গাছ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু আমার মধ্যে তখন এ চিন্তা কাজ করছিলো না। ফলগুলো অনেকটা কমলার মতো। কাণ্ডের সাথে লেপ্টে আছে পাতার মাঝে। গাছে উঠে একটা ছিঁড়লাম। আরে! এতো হাল্কা কেনো? ফলগুলো যেন পাতায় মোড়া। একটা একটা করে পাতা খুলছি। বেরিয়ে আসছে আরও পাতা। এভাবে পাতার পর পাতা খুলতে খুলতে শেষে সবুজ একটা পান্নার মতো চকচকে বস্তু পেলাম। এটা ভাঙতেই—আরে দাঁত। মানুষের দাঁত। মর্টেলের। এভাবে বত্রিশটি দাঁত পেলাম। তবে কি কোনো এক হতভাগাকে এ গাছ শুষে খেয়েছে আর এ হচ্ছে তারই দাঁত!

একদিন রাতে গাছে শুয়ে আছি। দেখি একটা পুকুরে মরে ভেসে উঠছে মাছ। একটার পর একটা। শত শত মাছ। পুকুরটাই মাছের রঙ ধারণ করলো। এরপর আরে হাঙর। রিচার্ড পার্কার কি এদের খেয়ে শেষ করতে পারবে?

একি রহস্য হঠাৎ করেই দেখি মাছগুলো নেই।

কিন্তু গাছের ফলগুলোর ভেতরের দাঁতগুলো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলো। আমি শুধু বিড় বিড় করে ঘোরের মধ্যে বলতে থাকলাম—কিছুই অবশিষ্ট নেই—শুধু দাঁত?

গাছ থেকে সবকিছু নামিয়ে নৌকায় তুললাম। এ রাক্ষুসে দ্বীপে আর নয়। নৌকার সব পাত্র বোঝাই করলাম পানিতে। পেট পুরে খেয়ে উটের মতো পেট ফুলিয়ে যতোটা ধরে পানি খেলাম।

কিন্তু রিচার্ড পার্কারকে সঙ্গে নিতে হবে। ও ছাড়া নৌকায় একা একা টিকবো কি করে। ও নৌকায় ফিরে এলে নৌকা ছেড়ে দিলাম। ধীরে ধীরে কেটে গেলো রাত।

সকালে উঠে দেখি—আরে দ্বীপটি নেই। সমুদ্র বেশ উত্তাল। আর আকাশে ধূসর মেঘ।

৯৩

অনিশ্চিত আবহাওয়ার মতোই আমার এই অনিশ্চিত ভবিষ্যত আমাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে তুলেছিলো। এতো যন্ত্রণা সত্ত্বেও কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম। এ কাহিনীর বাকি অংশ জুড়ে কেবলই দুঃখ, কেবলি বেদনা আর যন্ত্রণার তীব্র দহন।

উঁচু নিচুকে ডেকে আনে আর নিচু ডাকে উঁচুকে। আমি আপনাকে বলেছি, আমার মতো অবস্থায় পড়লে আপনিও কল্পনার ফানুস ওড়াতেন। আপনি যতো নিচে অবস্থান করবেন, ততো উপরে উড়ে বেড়াতে চাইবে আপনার মন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, অবিরাম বঞ্চনা আর যন্ত্রণায় টিকে থাকার বেপরোয়া সংগ্রামে আমি অবশেষে ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়েছিলাম।

৯৪

মেক্সিকোর উপকূলে যখন পৌঁছলাম শরীরে আমার খুশি হওয়ার মতো শক্তিও অবশিষ্ট ছিলো না। খুব কষ্ট করে আমাদের তীরে উঠতে হচ্ছিলো। সফেন ঢেউয়ে নৌকা তো প্রায় ডুবেই গিয়েছিলো। নৌকাটা ঢেউয়ের মাথায় উঠতেই নৌকার নোঙর ছেড়ে দিচ্ছিলাম পুরোপুরি—যাতে ঢেউয়ের ওপর নৌকাটা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার নৌকাটা ঢেউয়ের ওপর যখন উঠে যাচ্ছিলো তখন তুলে নিচ্ছিলাম নোঙর। এভাবে নোঙর ফেলে এবং নোঙর তুলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তীরের দিকে। এটা ছিলো খুবই বিপজ্জনক কাজ। এরপর এক বিশাল ঢেউ এসে নৌকাটাকে ঠিক জায়গামতো ধাক্কা দিতেই আমরা দ্রুত তীরের দিকে এগিয়ে গেলাম। শেষবারের মতো নোঙরটা তুলে নিলাম আমি। একসময় নৌকাটা এসে তীরের বালুতে ঘস ঘস শব্দ করে ঘষা খেয়ে থেমে গেলো।

নৌকা থেকে গড়িয়ে পড়লাম পানিতে। মুক্তির দ্বারপ্রান্তে এসে ডুবে যাবার ভয় করছিলাম। শরীর এতো দুর্বল ছিলো যে দু'ফুট পানিতেও ডুবে মরার ভয় করছিলাম। তীরের দিকে কতোটা পথ আমাকে যেতে হবে দেখার জন্য তাকালাম। আর তাকাতেই দেখি রিচার্ড পার্কার। সে আমার ওপর দিয়ে লাফিয়ে গেলো। আমার মাথার ওপর মখমলের চামড়ার রঙধনু বানিয়ে সে গিয়ে পানিতে পড়লো। লেজ তুলে পা ছড়িয়ে পানিতে পড়েই সে ছুটলো তীরের দিকে। সে বামদিকে গেলো। কিন্তু তার পা ভেজা বালিতে দেবে যাচ্ছিলো। এরপর সোজা আমার সামনে দিয়ে সে এগিয়ে গেলো ডান দিকে। সে একশ' গজের মতো দৌড়ে গিয়ে আমার দিকে ফিরলো। তার ভাবসাব সুবিধার মনে হলো না। বরং ওকে অসহযোগীই মনে হলো। সে বেশ ক'বার পড়ে গেলো। জঙ্গলের কিনারে গিয়ে সে থামলো। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে আমার দিকে ফিরবে। আমার দিকে তাকাবে। মাথা ঝাকিয়ে কান দুটিতে ফট্ ফট্ শব্দ করবে। গর্জন করবে। এবং এরকম কিছু একটা করে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটাবে। সে এসবের কিছুই করলো না। সে জঙ্গলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। আর সোজা হাঁটতে থাকলো। আমার দুর্দিনের বিব্রতকর সহযাত্রী, ভয়ঙ্কর সঙ্গী, দুঃখদিনের নির্ভরযোগ্য সাথী, উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগরে সাহস জাগানিয়া বাংলার বাঘ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এভাবেই শেষবারের মতো অদৃশ্য হলো আমার চোখের সামনে থেকে।

আমি তীরের দিকে এগুতে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেলাম বালুর ওপর। চারদিকে তাকালাম। সত্যি সত্যি আমি এখন একা। ভীষণ একা। বাবা-মা-ভাই নেই, রিচার্ড পার্কার নেই এমনকি আমার মনে হলো এই মুহূর্তে ঈশ্বরও নেই আমার সাথে। কিন্তু ভুল। সব সময়ই আমার ওপর ঈশ্বরের কৃপা ছিলো। সৈকতটা এতো নরম, দৃঢ় আর বিস্তীর্ণ যে মনে হলো ঈশ্বরের গাল।

কয়েক ঘণ্টা পর আমার প্রজাতির একজন আমাকে খুঁজে পেলো। সে ফিরে গিয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ফিরে এলো। দলে তারা ছয়-সাতজনের মতো হবে। হাত দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে তারা আমার কাছে এলো। এদের এ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলাম। এক বিচিত্র ভাষায় তারা আমার সাথে কথা বলতে লাগলো। নৌকাটিকে তারা তীরে টেনে তুললো। আমাকেও তারা বয়ে নিয়ে চললো। তখনও আমার হাতে ধরে থাকা এক টুকরো কচ্ছপের মাংস তারা আমার হাত থেকে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো।

আমি বাচ্চার মতো কেঁদে উঠলাম। এজন্য নয় যে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি; এজন্য নয় যে আমি আমার জাতী ভাই-বোনের কাঁধে চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছি—আমি কাঁদছিলাম কারণ রিচার্ড পার্কার এভাবে অসৌজন্য ভাব দেখিয়ে চলে গেলো তাই। ব্যক্তি হিসেবে সবকিছু আমি সুসামঞ্জস্যভাবে শেষ করার পক্ষপাতি। উদাহরণ হিসেবে বলছি আপনি কি আমার এ তালগোল পাকানো গল্প ঠিক ঠিক ১০০ অধ্যায়ে শেষ করবেন? কমও না, বেশিও না? আমার ডাকনাম নিয়ে একটি গল্প বলেছিলাম, মনে আছে? সংখ্যা এভাবেই চিরযাত্রী হয়। একটি জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সব কাজ সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে শেষ করা। তার তালগোল পাকানো বিদায় আজও আমাকে দুঃখ দেয়। এখনও মনে হয় জীবনতরীতে গিয়ে তাকে দেখে আসি আমাকে আজো তার মনে আছে কিনা। ইচ্ছে হয় তখন তাকে বলি—হা, একটি বাঘকে এখনও জানি—ইচ্ছে হয় বলি, "রিচার্ড পার্কার শেষ। আমরা বেঁচে এসেছি। আপনি নিশ্বাস করবেন? ধন্যবাদ দিয়ে আমি আপনাকে খাটো করতে চাই না। আপনি না থাকলে তো আমি আমার এ কাহিনী পাঠকদের জানাতেই পারতাম না। এখন আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে চাই ঃ রিচার্ড পার্কার তোমাকে ধন্যবাদ। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো। সারাজীবন তো খাঁচায় বন্দী স্বাধীনতা ভোগ করেছো; এখন তুমি জানতে পারবে জঙ্গলের বন্দিত্ব কাকে বলে। আমি চাই তোমরা, সব পশু এটা ভোগ করো। মানুষ থেকে সাবধান। সে তোমার বন্ধু নয়। কিন্তু আশা করি আমাকে তুমি বন্ধু হিসেবে মনে রাখবে। এটা নিশ্চিত, আমি কোনোদিনই তোমাকে ভুলবো না। তুমি চিরদিনই আমার সাথে, আমার হৃদয়ে থাকবে। কী সেই হিস্‌স্‌স্‌ শব্দ? ওহ, আমাদের নৌকা তীরে লেগেছে। সুতরাং বিদায় হে বন্ধু রিচার্ড পার্কার, বিদায়।"

আমাকে যারা উদ্ধার করেছিলো তারা আমাকে তাদের গ্রামে নিয়ে গেলো। কয়েক মহিলা আমাকে গোসল করালো। এতো জোরে জোরে তারা আমাকে ঘসছিলো! তারা হয়তো ভেবেছিলো আমি কোনো শ্বেতাঙ্গের সন্তান। গায়ে ময়লা জমে এমন বাদামী হয়েছি। আমার ভীষণ লাগছিলো। আমি তাদের বোঝাতে চাইলাম! তারা মাথা ঝুঁকিয়ে হাসলো আর আগের মতোই জোরে ঘষতে লাগলো, যেনো কোনো জাহাজের ডেকের মরচে ঘষে তুলছে। মনে হলো ওরা আমার জীবন্ত চামড়া তুলে ফেলবে। কিন্তু তারা আমাকে সুস্বাদু খাবার খেতে দিলো। আমি খাচ্ছিলাম আর খাচ্ছিলাম, থামতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছে এ ক্ষুধা যেন জীবনেও মিটবে না।

পরদিন একটি পুলিশের গাড়ি এসে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো—যেখানে ইতি ঘটবে এ কাহিনীর।

যারা আমাকে উদ্ধার করেছিলো তাদের উদারতায় আমি বিমোহিত। দরিদ্র সেই লোকগুলো আমাকে খাইয়েছিলো, পরিধানের পোশাক দিয়েছিলো। ডাক্তার এবং নার্সরা আমাকে এতো যত্ন করেছিলো—যেন আমি এক অপরিণত নবজাতক। মেক্সিকো এবং কানাডার কর্মকর্তারা সব দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এজন্য আমি মেক্সিকোর সৈকত থেকে আমার পালিত মার বাড়ি পৌঁছতে পেরেছিলাম, টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ঢুকতে পেরেছিলাম। এঁদের সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে চাই।

তৃতীয় ভাগ

বেনিটো জুয়ারেজ্ ইনফারমারি, টোমাটলান, মেক্সিকো

৯৫

জাপানী যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সামুদ্রিক বিভাগের বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মি. তোমোহিরো ওকামোতো আমাকে পরে বলেছিলেন। তিনি এবং তাঁর তখনকার সহকর্মী মি. আটসুরো চিবা যখন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের লস এঞ্জেলসের কাছে ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচের কন্টেইনার পোর্টে অন্য একটি কাজে গিয়েছিলেন। তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে চিহ্নহীনভাবে ডুবে যাওয়া জাপানী জাহাজ তিমিটসুমের একমাত্র বেঁচে যাওয়া যাত্রীর সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে। তাকে ম্যাক্সিকোর ছোট্ট শহর টোমাটলানের কাছের উপকূল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ডুবে যাওয়া জাহাজটির ব্যাপারে তদন্তে তাঁদের অবিলম্বে কাজে নামার নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁরা একটি ম্যাপ কিনে ম্যাক্সিকোর টোমাটলানের সন্ধান করতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাদের চোখ পড়লো বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট উপকূলীয় শহর টমাটানের ওপর—যা ছোট হরফে ছাপা হয়েছিলো। তাঁরা ভুল করে এটাকেই টোমাটলান ভাবলেন। তারা ভাবলেন যেহেতু এটা বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে, তাই গাড়িতে যাবেন।

তাঁরা গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিলেন। আটশ' মাইল গাড়ি চালিয়ে তাঁরা টমাটানে এসে দেখেন এটা টোমাটলান নয়। মি. ওকামোতো সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা আরও দু'শ মাইল গাড়ি চালিয়ে সান্তা রোসলিয়ায় গিয়ে ফেরি ধরবেন। ফেরিটা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ছেড়েছিলো এবং এর গতি ছিলো খুব ধীর। ফেরিতে গুয়ামাসে গিয়ে আরো ১৩০০ কিলোমিটার সড়কপথে গেলে তবেই টোমাটলান। রাস্তা খুব খারাপ। তাদের গাড়ি ভেঙে পড়লো। তাদের মেকানিক গাড়ির যন্ত্রাংশ বদলিয়ে নিলো। এর খরচ যোগাতে হলো আরোহীদেরই কিন্তু ফিরে আসার পথে এটিও ভেঙে গিয়েছিলো। মি. ওকামোতো আমাকে বলেছিলেন, বেনিটো জুয়ারেজ ইনফামারি, টোমাটলানে যখন তাঁরা পৌঁছেন, তাঁরা তখন খুব ক্লান্ত ছিলেন।

তিনি এবং মি. চিবা পাইসাইন মলিটর প্যাটেলের তিন ঘণ্টার এক সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন এবং এটা টেপে রেকর্ড করা হয়েছিলো। মি. ওকামোতোর কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে পরে তিনি এ টেপের একটি কপি আমাকে দিয়েছিলেন। ভিন্ন হরফের ফন্টে ছাপা অংশ জাপানী ভাষায় বলা হয়েছিলো—যা পরে আমি অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলাম।

৯৬

"হ্যালো, মি. প্যাটেল, আমার নাম তোমোহিরো ওকামোতো। আমি জাপানী যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সামুদ্রিক বিভাগ থেকে এসেছি। ইনি আমার সহকারী আটসুরো চিবা। আমরা ডুবে যাওয়া সিমিটসু জাহাজের একজন যাত্রী হিসেবে আপনার খোঁজ নিতে এসেছি। আপনার কি আমাদের সাথে কথা বলার সময় হবে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"ধন্যবাদ। এটা আপনার দয়া। এখন, আটসুরো চিবা, তুমি তো এ ব্যাপারে বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং শেখার চেষ্টা করো।"

"জি, মি. ওকামোতো।"

"টেপ রেকর্ডার অন করেছো?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। উহ্, আমি খুব ক্লান্ত! রেকর্ডের জন্য বলছি, আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮। কেস ফাইল নং ২৫০৬৬২, নিখোঁজ কার্গো জাহাজ টিমিটসুমের প্রসঙ্গে। আপনি কি আরাম বোধ করছেন, মি. প্যাটেল?

"হ্যাঁ, আমি ভালো বোধ করছি। আর আপনারা?"

"আমরা বেশ আরাম বোধ করছি।"

"আপনারা কি টোকিও থেকে এসেছেন।"

"আমরা ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচ থেকে এসেছি। সড়কপথে।"

"আপনাদের ভ্রমণ কি আরামদায়ক ছিলো?"

"আমাদের ভ্রমণ ছিলো খুবই আরামের।"

"আমার ভ্রমণটি ছিলো ভয়ঙ্কর।"

"হ্যাঁ। এখানে আসার আগে আমরা পুলিশের সাথে কথা বলেছি। জীবনতরীটাও দেখেছি।"

"আমি একটু ক্ষুধার্ত।"

"একটি কুকি খাবেন?"

"হ্যাঁ, দিন।"

"এই নিন, খান।"

"ধন্যবাদ।"

"আপনাকেও ধন্যবাদ। এটা তো এটা কুকি ছাড়া কিছু নয়! এবার মি. প্যাটেল কি কি ঘটেছিলো যদি যতোটা সম্ভব বিস্তারিত বলতেন!"

"অবশ্যই! সোৎসাহে বলছি।"

৯৭

পুরো কাহিনী

৯৮

মি. ওকামোতো : "খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।"

মি. চিবা : "কী করুণ কাহিনী।"

"সে আমাদের বোকা ভেবেছে। মি. প্যাটেল, আমরা এখন ছোট্ট একটা বিরতি নেবো। তারপর আবার ফিরে আসবো, কেমন?"

"তাই ভালো। আরেকটি কুকি হলে মন্দ হতো না।"

"অবশ্যই, অবশ্যই।"

মি: চিবা : "এর মধ্যেই সে অনেক খেয়েছে। বেশিরভাগই এখনও তার খাওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই তার বিছানার চাদরের নিচে আরও আছে।"

"তাকে আরেকটি দিন। তার মেজাজ ভালো রাখতে হবে। আমরা কয়েক মিনিটেই ফিরে আসছি।"

৯৯

মি. ওকামোতো : "মি. প্যাটেল, আমরা আপনার গল্প বিশ্বাস করি না।"

"দুঃখিত—এই কুকিগুলো ভালোই। তবে খুব সহজেই পুট পুট করে ভেঙে যায়। আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। কেনো বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"এটা হতে পারে না।"

"কি বলতে চাইছেন?"

"কলা ভাসে না।"

"আমি দুঃখিত।"

"আপনি বলেছেন ওরাং-ওটাংটা একটা কলার দ্বীপে ভেসে এসেছিলো।"

"হ্যাঁ, বলেছি।"

"কলা ভাসে না।"

"হ্যাঁ, কলা ভাসে।"

"কলা খুব ভারি।"

"না, এরা ভারি নয়। এই নিন, আমার কাছে দু'টি কলা আছে, পরীক্ষা করে দেখুন।"

মি. চিবা : "ওগুলো কোত্থেকে এলো? না জানি তার বিছানার চাদরের নিচে আরও কতো কী আছে!

মি. ওকামোতো : "যেতে দাও। না, ঠিক আছে।"

"ওগুলো ওখানে ডুবেছিলো।"

"আচ্ছা, মানলাম।"

"আমি বলছি, ওই সিঙ্কারে পানি ভরে কলাগুলো ছেড়ে দিন। দেখি আমরা কে ঠিক বলছি।"

"আমরা সামনে এগুতে চাই।"

"আমি অবশ্যই বলবো।"

[নীরবতা]

মি. চিবা : "আমরা কি করবো?"

মি. ওকামোতো : আমার মনে হচ্ছে এ কাজ সারতে আরও একটি পুরো দিন লাগবে।

[একটি চেয়ার থেকে কারো ওঠার শব্দ হলো এবং ট্যাপ খুলে ট্যাপের পানি ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল]

পাই প্যাটেল : "কি হচ্ছে? আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না।"

মি. ওকামোতো [দূর থেকে] : "আমি সিঙ্কারে পানি ভরছি।"

"কলাগুলো নিয়েছেন?"

[দূর থেকে] "না।"

"আর এখন?"

[দূর থেকে] "ওগুলো ছেড়েছি।"

"আর।"

[নীরবতা]

মি. চিবা : "এগুলো কি ভাসছে?"

[দূর থেকে] "এগুলো ভাসছে।"

"তা, এগুলো কি ভাসছে?"

[দূর থেকে] "ভাসছে।"

"আমি আপনাদের কি বলছিলাম?"

মি. ওকামোতো : "হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু একটি ওরাং-ওটাংয়ের ভেসে থাকার জন্য তো অনেক কলার দরকার।"

"হ্যাঁ। সেখানে প্রায় এক টন কলা ছিলো। কলাগুলো ভেসে গিয়েছিলো বলে এখনও আমার আফসোস হয়।"

"দুঃখজনক ঘটনা। এখন....."

"আমি কি আমার কলাগুলো ফেরত পেতে পারি?"

মি. চিবা : "এগুলো আমি দেখবো।"

[একটি চেয়ার সরিয়ে কারও ওঠার শব্দ হলো।]

[দূর থেকে] "ঐ দেখো! এগুলো ঠিকই ভাসছে।"

মি. ওকামোতো : "আপনি যে শৈবাল দ্বীপের ওপর দিয়ে এসেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

মি. চিবা : "এই নিন আপনার কলাগুলো।"

মি. প্যাটেল : "ধন্যবাদ। হ্যাঁ?"

"দুঃখিত, বলতে বাধ্য হচ্ছি ব্যাপারটা এমন উদ্ভট, আমরা আপনার অনুভূতিকে অবজ্ঞা করছি না, আপনি নিশ্চয়ই আশা করছেন না আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করবো? মানুষখেকো গাছ? মাছখেকো শৈবাল, যা বিশুদ্ধ পানি উৎপন্ন করে? ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতের প্রাণীর সাথে গাছে রাত্রি যাপন? এগুলো সত্য হতে পারে না।"

"যেহেতু আমরা কখনও এমনটি দেখিনি।"

"ঠিক তাই। যা দেখেছি তাই শুধু আমরা বিশ্বাস করি।"

"কলম্বাসও এমনটি করেছিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার হলে কি করেন?"

"উদ্ভিদবিদ্যা অনুযায়ী আপনার ঐ দ্বীপ অসম্ভব ব্যাপার।"

"এ পর্যন্ত অন্য কারো চোখে এটি পড়লো না কেনো?"

"একটি ব্যস্ত জাহাজ এক বড়ো সাগর পাড়ি দেয়। কিন্তু আমি গিয়েছি ধীরে ধীরে। তাই আমি দেখেছিও বেশি।"

"কেনো বিজ্ঞানী আপনাকে বিশ্বাস করবে না।"

"কপারনিকাস এবং ডারউইনকেও কেউ বিশ্বাস করতো না। এখনও কি বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেন না? চোখের সামনেই তো আমাজান বেসিনের ঘটনা?"

"কোন গ্রহই তো প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করে না।"

"আপনি আর কি কি জানতে পারলেন?"

"অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায়।"

মি. চিবা : আমার এক চাচা আছেন, উদ্ভিদবিদ্যা অনেক জান। তিনি হিতা-গুনের কাছে এক গ্রামে থাকেন। তিনি একজন বনসাই বিশেষজ্ঞ।"

মি. প্যাটেল : "একটি কি?"

"একজন বনসাই বিশেষজ্ঞ। আপনি জানেন বনসাই হচ্ছে বামন বৃক্ষ।"

"আপনি কি গুল্মকে বোঝাতে চাইছেন?"

"আমি বোঝাতে চাইছি বৃক্ষ। বনসাই হচ্ছে বামন গাছ। এদের উচ্চতা দু'ফুটেরও কম হয়। আপনি আপনার হাতে করে এগুলো বহন করতে পারবেন। এরা অনেক বছর বাঁচে। আমার চাচার তিনশ' বছর বয়সের একটি বনসাইও আছে।"

"তিনশ' বছরের গাছ মাত্র দু'ফুট লম্বা? হাতে করে বয়ে বেড়ানো যায়?"

"হ্যাঁ। এগুলো খুব উঁচুমানের। এদের অনেক যত্ন করতে হয়।"

"এমন গাছের কথা কে কবে শুনেছে? উদ্ভিদবিদ্যার তত্ত্ব অনুযায়ীই এগুলো অসম্ভব।"

"কিন্তু আমি আপনাকে দিব্যি দিয়ে বলছি এ ধরনের গাছ আছে। মি. প্যাটেল আমার চাচা—"

"আমি যা দেখি তাই বিশ্বাস করি।"

মি. ওকামোতো : "এক মিনিট, প্লিজ। আটসুরো, তোমার চাচার প্রতি পুরোপুরি সম্মান রেখেই বলছি, আমরা উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার জন্য এখানে আসিনি।"

"আমি শুধু সাহায্য করতে চাইছি।"

"আপনার চাচার বনসাই কি মাংস খায়?"

"আমি এটা ভেবে বলিনি।"

"তার বনসাই কি কখনও আপনাকে কামড়েছে?"

"না।"

"তাহলে আপনার চাচার বনসাই আমাদের কোনো সাহায্যেই আসছে না। আমরা কি যেনো বলছিলাম?"

পাই প্যাটেল : "লম্বা বড়ো গাছ শেকড় দিয়ে আকড়ে ধরে থাকে মাটি—আমরা এই বলছিলাম।"

"এগুলো রেখে এগিয়ে যাই চলুন।"

"এটা হয়তো খুব শক্ত। আমি তাদের কখনও টেনে তোলার চেষ্টা করিনি এবং বয়ে আনার চেষ্টা করিনি।"

"আপনি খুব মজার মানুষ মি. প্যাটেল, হা! হা! হা!"

পাই প্যাটেল : "হা! হা! হা!"

মি. চিবা : "হা! হা! হা! এটা সেই মজা নয়!"

মি. ওকামোতো : "শুধু হাসতে থাকুন। হা! হা! হা!"

মি. চিবা : "হাঁ! হাঁ! হাঁ!"

মি. ওকামোতো : এবার বাঘটির প্রসঙ্গ। আমরা এটার ব্যাপারে নিশ্চিত নই যদিও।"

"কি বলতে চাইছেন?"

"এটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

"এটা একটা অবিশ্বাস্য গল্প।"

"সংক্ষেপে।"

"আমি জানি না কিভাবে বেঁচে গেলাম।"

"এটা যে একটা পশু শাবক ছিলো তা নিশ্চিত।"

"আমি আর একটা কুকি খাবো।"

"আর নেই।"

"ঐ ব্যাগে কি?"

"কিছুই না।"

"দেখতে পারি?"

মি. চিবা : "এটার মধ্যে আমাদের লাঞ্চ।"

মি. ওকামোতো : "বাঘের কাছে ফিরে গিয়ে...."

মি. পাই প্যাটেল : "ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সুস্বাদু স্যান্ডউইচ।"

মি. ওকামোতো : "হ্যাঁ, এগুলো দেখতে ভালো।"

মি. চিবা : "আমার ক্ষুধা লেগেছে।"

"এর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি। তাই এটা বিশ্বাস করাই কঠিন, তাই না। কোনো আমেরিকাতেই বাঘ নেই। এখানে যদি কোনো বন্য বাঘ দেখা যায় পুলিশের কাছে অবশ্যই তার খবর আসতো তাই না?"

"আমার এবার জুরিখ চিড়িয়াখানার সেই প্যান্থারটির কথা বলা উচিত। মধ্য শীতে যেটা চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়েছিলো।"

"মি. প্যাটেল, সন্দেহাতীতভাবেই বাঘ হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর প্রাণী। এ রকম একটি বাঘের সাথে একই নৌকায় আপনি কী করে টিকে থাকলেন? এর—"

"বুঝতে পারছেন না কেনো, বন্য প্রাণীদের কাছে আমরা হচ্ছি অদ্ভুত এবং নিষিদ্ধ প্রাণী। আমাদেরকে ওদের খুব ভয়। যতোটা সম্ভব ওরা আমাদের এড়িয়ে চলে। যখন কোনো জন্তু আমাদের সাথে লড়াই করে উপায়হীন এবং বেপরোয়া হয়ে এবং আর কোনো পথ না থাকায় বাধ্য হয়ে ওরা লড়াই করে।"

"একটি নৌকায়? দেখুন মি. প্যাটেল এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।"

"বিশ্বাস করা কঠিন? বিশ্বাস করা কঠিনের কি জানেন, অ্যা, কি জানেন? ভারতের চিড়িয়াখানা রক্ষকরা গোপনে সবাই জানে যে ১৯৭১ সালে কলকাতার চিড়িয়াখানা থেকে 'বোরা' নামের একটি মেরু ভালুক পালিয়েছিলো। এটির সম্বন্ধে পরে আর কিছুই শোনা যায়নি। আমরা বিশ্বাস করি হুগলি নদীর ধারে এটি এখনও চরে বেড়াচ্ছে। আপনাদের টোকিও শহরকে যদি উল্টে ধরেন তবে কি কি পড়বে জানেন? পড়বে নেকড়ে, কমোডো ড্রাগন, কুমির, উটপাখি, বেবুন, বন্য শূকর, চিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই বন্য জিরাফ এবং বন্য জলহস্তি টোকিওতে বাস করছে যাদের কেউ কখনও দেখেনি। একদিন আপনি টোকিওর

চিড়িয়াখানায় হেঁটে বেড়িয়ে খাঁচাগুলোয় শুয়ে থাকা প্রাণীদের দেখে দেখে জুতার তলায় কতো কিই না খুঁজে পাবেন—এরপর উপরে তাকান। আর আপনি কিনা মেক্সিকোর জঙ্গলে বাঘ খুঁজে বের করতে চান? কী হাস্যকর ব্যাপার হা! হা! হা!"

"টোকিওতে বন্য জিরাফ আর বন্য জলহস্তি আছে, মরুভালুক কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় ভালো কথা। আমরা তবু বিশ্বাস করি না নৌকায় আপনার সাথে একটা বাঘ ছিলো।"

"বড়ো নগরবাসীর মিথ্যে অহঙ্কার। আপনারা আপনাদের মহানগরকে বন্য জন্তুর অভয়ারণ্য ভাবতে রাজি তবু আমার ছোট্ট গ্রামে বাংলার বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চান না?"

"মি. প্যাটেল শান্ত হোন।"

"বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই যদি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে বেঁচে আছেন কেনো?"

"মি. প্যাটেল—"

"আপনার ভদ্রতা নিয়ে আমাকে খোঁচাননি! যে কোনো প্রেমিককে জিজ্ঞেস করুন ভালোবাসা কতো অবিশ্বাসের, যে কোনো বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করুন জীবন কতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যে কোনো বিশ্বাসীকে জিজ্ঞেস করুন ঈশ্বর কতো অবিশ্বাসের। 'বিশ্বাস করা কঠিন' নিয়ে আপনার সমস্যাটা কোথায়?"

"আমরা কেবল যৌক্তিক হতে চাই।"

"আমিও! আমি প্রতি মুহূর্তেই আমার যুক্তি প্রয়োগ করি। খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্য যুক্তি খুবই চমৎকার। 'কারণ' হচ্ছে খুব সস্তা এক অস্ত্র। বাঘকে বাইরে নেয়ার জন্য 'কারণ'কে কেউ কামড়ায়নি। কিন্তু অতিমাত্রায় যৌক্তিক হতে গেলে তো আপনার দুনিয়াকেই গোসলের পানির সাথে ফেলে দিতে হয়!"

"শান্ত হোন, মি. প্যাটেল, শান্ত হোন।"

মি. চিবা : "গোসলের পানি? সে এর ভেতর গোসলের পানি টেনে আনছে কেনো।"

"আমি কীভাবে শান্ত হবো? রিচার্ড পার্কারকে যদি দেখতেন!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"বিরাট। এতো বড়ো বড়ো দাঁত! চন্দ্র হাঁসের মতো নখ!"

মি. চিবা : "চন্দ্র হাঁসটা আবার কি?"

মি. ওকামোতো : চিবা! বোকার মতো প্রশ্ন না করে কাজে লাগতে পারেন না? এই ছেলেটা একটা কঠিন মাল। একে টলানো মুশকিল। কিছু একটা করুন।

মি. চিবা : "এই দেখো, চকোলেট বার!"

পাই প্যাটেল : "চমৎকার!"

[দীর্ঘ নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "এখনও সে আমাদের পুরো লাঞ্চ হাতাতে পারেনি। শিগগিরই সে টেম্পুরা চেয়ে বসবে।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "আমরা কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি! আমরা এখানে এসেছি একটি কার্গো জাহাজের ডুবে যাওয়া তদন্ত করতে। আপনি একমাত্র বেঁচে যাওয়া লোক। আর আপনি ছিলেন একজন যাত্রী, জাহাজের কেউ নন। জাহাজের যা ঘটেছে তার জন্য আপনি দায়ী হতে পারেন না। আমরা—"

"চকোলেট খুব ভালো।"

"আমরা কেনো দুর্বৃত্ত আইনে কোনো মামলা করতে যাচ্ছি না। আপনি এক হতভাগা নির্দোষ যাত্রী। আমরা শুধু জানতে চাইছি কেন এবং কীভাবে জাহাজটি ডুবলো। আমাদের ধারণা আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন মি. প্যাটেল।"

[নীরতবা]

"মি. প্যাটেল?"

[নীরবতা]

মি. প্যাটেল : "বাঘগুলো আছে, জীবনতরী আছে, সাগর আছে। এই তিনটিকে জীবনে একত্রে দেখেননি বলে আপনাদের ক্ষুদ্র ও সীমিত অভিজ্ঞতায় এগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। নির্জলা সত্য হচ্ছে জাহাজটি এদের বহন করছিলো এবং ডুবে গিয়েছিলো।"

[নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "এই ফরাসী সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

"তার সম্বন্ধে কী?"

"দু'জন অন্ধ লোকের দুটি আলাদা নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা হয়ে গেলো—এই কাকতালীয় ব্যাপারটা অকল্পনীয়, না?"

"এটা অবশ্যই ঘটেছে।"

"আমাদের কাছে এটি খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।"

"লটারিতে কেউ না কেউ তো জেতেই।"

"আমাদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা একেবারেই কঠিন।"

"আমার পক্ষেও।"

"আমি জানি আমাদের এখন সাপ্তাহিক ছুটি কাটানো উচিত। আপনারা খাদ্য নিয়ে বললেন?"

"বললাম।"

"খাদ্যের ব্যাপারে তার অনেক জানাশোনা?"

"যদি এগুলোকে খাদ্য বলে মেনে নেন।"

"তিমিটসুর পাচক একজন ফরাসী ছিলো।"

"দুনিয়ার সব জায়গায়ই ফরাসীরা আছে।"

"হতে পারে আপনার সাথে যে ফরাসীর দেখা হয়েছিলো সেই পাচক ছিলো।"

"হতে পারে। আমি কি করে বলবো? আমি তাকে কখনও দেখিনি। আমি অন্ধ ছিলাম। তখন তাকে রিচার্ড পার্কার খেয়ে ফেললো।"

"কী সুবিধা!"

"মোটেও না। এটা ছিলো এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাহলে নৌকায় মীরকাটের হাড়গোড়ের কি ব্যাখ্যা দেবেন?"

"হ্যাঁ, একটি ছোট প্রাণীর হাড়গোড়...."

"একটার বেশি!"

"—কিছু ছোট প্রাণীর হাড় নৌকায় পাওয়া গেছে। এগুলো বোধহয় জাহাজ থেকে এসেছে।"

"আমাদের চিড়িয়াখানায় কোনো মীরকাট ছিলো না।"

"ওগুলো মীরকাটের হাড় বলে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।"

মি. চিবা : "মনে হয় এগুলো কলার হাড় হা! হা! হা!"

"আটসুরো চুপ করো।"

"দুঃখিত, ওকামোতো। এটা পরিশ্রমের ধকলের ফল।"

"আপনি দেখছি আমাদের ব্যবসা লাটে তুলবেন।"

"খুবই দুঃখিত, ওকামোতো।"

মি. ওকামোতো : এগুলো অন্য কোনো ছোট মাছেরও হতে পারে।

: এগুলো মীরকাট ছিলো।

: এগুলো নেউলও হতে পারে।

: চিড়িয়াখানার নেউলগুলো বিক্রি করা হয়নি। এগুলো ভারতে থেকে গিয়েছিলো।

: এরা জাহাজে জন্মানো কোনো প্রাণীও তো হতে পারে! যেমন ইঁদুর। ভারতে নেউল তো যত্রতত্র পাওয়া যায়।

: নেউল কি জাহাজে জন্মে বা থাকে?

: কেনো নয়?

: প্রশান্ত মহাসাগরে ঝড়ের ভেতর কারা সাঁতরাচ্ছিলো? আর কারাইবা নৌকায় উঠতে পারে? এটা বিশ্বাস করা কঠিন। নয় কি?

"গত দু'ঘণ্টায় অবিশ্বাস্য অনেক কথাই তো শুনেছি!"

"এমনও হতে পারে নেউলগুলো আগে থেকেই নৌকায় ছিলো। আপনি যেমনটি বলেছিলেন সেই ইঁদুরটির কথা, যেটি আগে থেকেই নৌকায় ছিলো।"

"এতো প্রাণী নৌকায় ছিলো, এটা এক মজার ব্যাপার।"

"সত্যি মজার।"

"একটি আসল জঙ্গলই যেনো।"

"হ্যাঁ।"

"ওগুলো মীরাকাটের হাড়। দরকার হলে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।"

"নৌকায় অতো বেশি মীরকাট ছিলো না। আর কোনো মাথা পাওয়া যায়নি।"

"আমি তাদের বড়শির টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছি।"

"এগুলো মীরকাট না নেউলের হাড়—তা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও বলা দুষ্কর।"

"আপনি দেখছি একজন প্রাণীবিদ্যার ডাক্তার!"

"আচ্ছা ঠিক আছে, মি. প্যাটেল। আপনারই জিত হলো। নৌকায় মীরকাটের হাড়ের উপস্থিতির কোনো ব্যাখ্যা আমরা দাঁড় করাতে পারলাম না। অবশ্য ওগুলো যদি মীরকাটের হাড়ই হয়। ওটা আমাদের এখানে বিচার্য বিষয় নয়। আমরা এখানে জাহাজডুবির তদন্তে এসেছি।"

"একটা জিনিস আমি এক মিনিটের জন্যও ভুলিনি। আমি আমার পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছি।"

"আমরা এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত।"

"আমার মতো নয় নিশ্চয়ই।"

[অনেকক্ষণ নীরবতা]

মি. চিবা : "আমরা এখন কি করব?"

মি. ওকামোতো : "আমি জানি না।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

পাই প্যাটেল : "একটি কুকি খাবেন।"

মি. ওকামোতো : "হ্যাঁ। তাই বরং ভালো। ধন্যবাদ।"

মি. চিবা : "ধন্যবাদ।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "এটা একটা সুন্দর দিন।"

মি. প্যাটেল : হ্যাঁ। রোদেলা দিন।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

পাই প্যাটেল : "এবারই কি প্রথম মেক্সিকোতে এলেন?"

মি. ওকামোতো : "হ্যাঁ।"

"আমিও।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

পাই প্যাটেল : "তাহলে আপনাদের আমার গল্প পছন্দ হলো না?"

মি. ওকামোতো : "না, না। আমাদের এটা খুব পছন্দ হয়েছে। তাই না আটসুরো? আমাদের এটা অনেক দিন মনে থাকবে।"

মি. চিবা : "আমরা মনে রাখব।"

[নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "কিন্তু তদন্তের স্বার্থে আমরা জানতে চাই সত্যি সত্যি কী ঘটেছিলো।"

"সত্যি কি ঘটেছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনারা অন্য গল্প শুনতে চান।"

"ওহ্...না। আমরা জানতে চাইছি যা সত্যি সত্যি ঘটেছে।"

"দুনিয়াটা তা নয় যেভাবে এটা আছে। বরং দুনিয়াটা তেমনই যেমন আমরা এটাকে বুঝি। আর আমরা এটা বোঝার প্রক্রিয়ায় প্রায়ই এর সাথে নতুন কিছু না কিছু যোগ করি।"

"হা! হা! হা! আপনি খুব বুদ্ধিমান মি. প্যাটেল।"

মি. চিবা : "সে কি বিষয়ে বলছে?"

"আমার কোনো ধারণা নেই।"

মি. প্যাটেল : "আপনারা এমন কথা শুনতে চান, যা সত্যের প্রতিফলন?"

"হ্যাঁ।"

"যে কথার সত্যের সাথে বিরোধ নেই?"

"ঠিক তাই।"

"কিন্তু বাঘের সাথে তো সত্যের কোনো বিরোধ নেই।"

"ওহ্, দয়া করে আর বাঘকে টানবেন না তো।"

"আমি জানি আপনারা কি চান। আপনারা চান এমন কাহিনী যা আপনাদের চমকিত করবে। আপনারা চান একটি বৈচিত্র্যহীন গল্প। গতিহীন গল্প। আপনারা শুনতে চান শুকনো খটখটে অলঙ্কারহীন ঘটনার বর্ণনা।"

"উহ্!"

"আপনারা শুনতে চান এমন কাহিনী যাতে কোনো প্রাণী থাকবে না।"

"হ্যাঁ।"

"বাঘ এবং ওরাং-ওটাং ছাড়া।"

"ঠিক তাই।"

"হায়েনা এবং জেব্রা ছাড়া।"

"হ্যাঁ, তাদের ছাড়া।"

"মীরকাট বা নেউল ছাড়া।"

"আমরা ওগুলো চাই না।"

"জিরাফ এবং জলহস্তি ছাড়া।"

"আমরা আমাদের কানে আঙুল দেবো!"

"তাহলে আমার ধারণাই ঠিক। আপনারা পশুহীন কাহিনী শুনতে চান।"

"আমরা এমন কথা শুনতে চাই যাতে কোনো পশু থাকবে না। এতে জাহাজটা কিভাবে ডুবলো তার ব্যাখ্যা থাকবে।"

"তাহলে আমাকে দয়া করে এক মিনিট সময় দিন।"

"অবশ্যই। আমরা মনে হয় শেষপর্যন্ত কিছু পেতে যাচ্ছি। আশা করি সে এবার হিসেব করে কথা বলবে।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

"তাহলে শুনুন।"

"বেশ।"

"জাহাজটা ডুবে গেলো। এটা এমন প্রচণ্ড শব্দ করলো যে মনে হলো যেনো কোনো ধাতব দানব ধ্বসে পড়েছে। জাহাজটা ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম প্রশান্ত মহাসাগরে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরানো অবস্থায়। আমি জীবনতরীর দিকে ছুটে গেলাম। এটা ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সাঁতার। আমার নড়ার শক্তি ছিলো না। নাকানি-চুবানি খাচ্ছিলাম। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম। দ্রুত দম ফুরিয়ে যাচ্ছিলো আমার। ডুবেই যেতাম হয়তো। যদি না ঐ সময় পাচক বয়া ছুঁড়ে না দিতো এবং আমাকে টেনে না তুলতো। আমি শরীরের শেষ শক্তি প্রয়োগ করে নৌকায় উঠলাম এবং মূর্ছা গেলাম।

"আমরা চারজন বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার মা একদঙ্গল কলার ওপর ভেসে ভেসে এসে নৌকায় উঠেছিলেন। পাচক আগে থেকেই নৌকায় ছিলো। আর একজন নাবিক ও তাই।

"সে মাছিগুলো খেয়ে ফেললো, মানে ঐ পাচকটা। নৌকায় আমাদের জন্য ছিলো খাবার এবং পানি, যাতে আমাদের কয়েক সপ্তাহ চলবে। এছাড়া ছিলো মাছ ধরার উপকরণ, সমুদ্রের পানিকে শুদ্ধ করার জন্য সোলার স্টিল। খুব তাড়াতাড়িই আমাদের উদ্ধার করা হবে না এমনটি ভাবার মতো কোনো কারণ ছিলো না। পাচকটা সমানে দু'হাত চালিয়ে মাছি ধরে ধরে খাচ্ছিলো পিশাচের মতো। অচিরেই সে ক্ষুধায় পাগল হয়ে উঠলো। ওর মতো মাছি ধরে খাচ্ছি না বলে তো ও আমাদের বোকা-টোকা কতোকিছু বললো। আমরা বিরক্ত হলেও কিছু বললাম না। সে একজন আগন্তুক এবং বিদেশী। সে ইঁদুরটাও খেলো। সে এটি কেটে রোদে শুকিয়ে নিলো। সত্যি কথা বলতে কি মাকে লুকিয়ে ছোট্ট একটি টুকরো আমিও খেয়ে নিয়েছিলাম। আমি ছিলাম খুবই ক্ষুধার্ত। পাচকটা ছিলো পিশাচের মতো, বদমেজাজী এবং হঠকারি।

"নাবিকটা ছিলো অল্প বয়সের। অবশ্য বয়সে আমার চেয়ে বড়োই ছিলো। বিশের ঘরে পড়েছে কি পড়েনি। খুবই সুন্দর দেখতে। সম্ভবত তাইওয়ানের চাইনিজ। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তার ইংরেজির 'ইয়েস', 'নো' জানও ছিলো না। তাই কারও সাথে কথা বলতে না পেরে তার আরও একা আরও খারাপ লাগতে লাগলো। সে খুব কাঁদতে শুরু করলো। সে যখন কাঁদতো, মা তার মাথাটা কোলে তুলে নিতেন।

"তার ডান পা-টা উরুর কাছে ভেঙে গিয়েছিলো। তার পায়ের হাড় ভেঙে মাংস ফুড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। প্রচণ্ড ব্যথায় সে কাতরাচ্ছিলো। আমাদের পক্ষে যতোটা সম্ভব তার পায়ের শুশ্রূষা করছিলাম। তাকে যত্ন করে পানীয় এবং খাবার খাচ্ছিলাম।

"ঐ পিচাশ পাচকটা ফিসফিসিয়ে বললো ওর কালো রক্ত অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে এবং গ্যাংগ্রিন হবে। ওর পা-টা কেটে না ফেললে ওকে বাঁচানো যাবে না। ওর কথার পাত্তা দিলাম না। আমরা রোজই ওর ঘায়ের পুঁজ মুছে দিতাম। কিন্তু তবুও ওর পাটা কালো হয়ে গেলো এবং ফুলে উঠলো।

"ওদিকে আমাদের রাজি করাতে পাচক বলতেই থাকলো যে, ওকে বাঁচাতেই ওর পা কেটে ফেলা উচিত। শেষপর্যন্ত পাটা কাটতেই হলো। মা আর আমি তার দু'হাত চেপে ধরলাম আর সে চীনা নাবিকের ভালো পায়ের ওপর বসে ছুরি চালিয়ে আহত পাটা কাটতে শুরু করলো। নাবিকটার সে কী চিৎকার আর দাপাদাপি! আমরা খুব শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম, তারপরও তার বুক-পেট লাফিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠছিলো। পা কাটা হতেই আমি আর মা সরে এলাম। ভেবেছিলাম যন্ত্রণা দেয়া পাটা কাটতেই সে শান্ত হবে। কিন্তু ঘটলো উল্টোটা। সে মরণ চিৎকার শুরু করলো আর কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে লাগলো। সারা নৌকা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেলো। অবশেষে সে শান্ত হলো। পাচকটা চামড়া দিয়ে তার কাটা জায়গা ঢেকে দিলো আমরা তার কাটা জায়গায় কাপড় বেঁধে রক্ত থামাতে চাইছিলাম। আমি লাইফ জ্যাকেটগুলো জড়ো করে বিছানার মতো করলাম এবং সবাই মিলে তাকে সেখানে শুইয়ে দিলাম। আমার ধারণা ছিলো না এতো যন্ত্রণার পরও কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। সারা সন্ধ্যা এবং রাত সে গোঙাতে লাগলো। এরপর সে মূর্ছা গেলো এবং আবোল-তাবোল বকতে লাগলো। আমি ধারণা করলাম রাতেই সে মারা যাবে।

"কোনো মতে সে জীবন ধরে রাখলো। ভোরবেলা। সে তখনও বেঁচে আছে। বার বার সে জ্ঞান হারাচ্ছিলো। মা তাকে পানি খাওয়ালেন। আমি কাটা পাটার দিকে তাকালাম। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। রক্ত ঝরে ঝরে এটা অনেক চিকন হয়ে গিয়েছিলো। আমি একটা লাইফ জ্যাকেট হাতে দস্তানার মতো পেঁচিয়ে এটি ধরে ফেলে দিতে গেলাম।

"কি করছো?" পাকচটা বললো।

"এটাকে ফেলে দেবো।"

"বোকার মতো কাজ করো না। আমরা এটা দিয়ে বড়শির টোপ বানাবো। এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা।"

"মোদ্দা কথা?" মা জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি এ দিয়ে কী বোঝাতে চাইছো?'

"পাচকটি এমন ভাব দেখালো আর এটা সেটা করতে থাকলো যে সে খুব ব্যস্ত।"

"মার গলা চড়ে গেলো। 'তুমি কি বলতে চাইছো আমরা এই বাচ্চা ছেলেটার পা কেটেছি তাকে বাঁচাতে নয়, বড়শির টোপ বানাতে?' "

"পাচকটা চুপ করে থাকলো।"

" 'উত্তর দাও!' চিৎকার করে বললেন মা।"

"কোণঠাসা হওয়া পশুর মতো সে মার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের রসদ ফুরিয়ে আসছে। আমাদের আরও খাবার চাই, নইলে না খেয়ে মরতে হবে।"

"মা চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'আমাদের রসদ ফুরিয়ে আসছে না। আমাদের অনেক খাবার আছে। প্যাকেট প্যাকেট বিস্কুট এবং পানি। এগুলো শেষ হওয়ার আগেই আমাদের উদ্ধার করা হবে।' এই বলে মা প্লাস্টিকের থলেতে হাত দিলেন যেটিতে আমরা বিস্কুট রেখেছিলাম। তার হাতে এটি অনেক হাল্কা অনুভূত হলো। কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো আর ভাঙা কয়েক টুকরো বিস্কুট পড়ে আছে। 'কি ব্যাপার? বিস্কুটগুলো গেলো কোথায়? গত রাতেও তো এটা ভরা ছিলো!"

"পাচকটা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো। আমিও।"

" 'স্বার্থপর দৈত্য!' মা রেগে গেলেন। 'বিস্কুটগুলো সাবাড় করে এখন বলছো আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে!'

" 'তোমার ছেলেও কিছু খেয়েছে।" আমাকে দেখিয়ে বললো পাচকটি।

"মার চোখ আমার দিকে ঘুরলো। আমার কলজে শুকিয়ে গেলো।"

" 'পাইসাইন? ও যা বললো সত্যি?"

" 'এটা ছিলো রাত মা। আমি আধো ঘুমে ছিলাম এবং ক্ষুধার্ত ছিলাম। সে আমাকে একটি বিস্কুট দিলো এবং কিছু না ভেবেই আমি এটা খেয়ে নিলাম।..."

" 'মাত্র একটা, তাই না?" ফুঁসে উঠে বললো নাবিকটি।

"এবার মার বাইরে তাকাবার পালা। মনে হলো হঠাৎ করেই তাঁর রাগ উবে গেছে। দূর সাগরের দিকে ভাবলেশহীন তাকিয়ে আছেন তিনি। এরপর কোনো কথা না বলেই তিনি নাবিকটাকে শুশ্রূষা করতে গেলেন।

"আমি খুব করে চাইছিলাম মা আমার ওপর রেগে উঠুন। তবু তাঁর এই নির্মম নীরবতা আমার সহ্য হচ্ছিলো না। আমি নাবিকটার কাছে গিয়ে তার পিঠের নিচে আরও লাইফ জ্যাকেট গুঁজে দেয়ার ছলে মার কাছাকাছি হলাম। ফিসফিসিয়ে বললাম, 'মা, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি দুঃখিত।' আমার গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। সজল চোখ তুলে তাকাতেই দেখি মার চোখ দিয়ে দরদর করে পড়ছে অশ্রু। কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকালেন না। তিনি বোধহয় দূর অতীতের কোনো স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

" 'আমরা একা, পাইসাইন, একা।' তাঁর কথায় হতাশায় আমার হৃদয় দেয়ালের ইটগুলো খসে খসে পড়তে লাগলো। দুই সপ্তাহ হয়ে গেলো আমরা নৌকায়। রবি আর বাবার দেখা নেই। ওদের আশা কি তবে মা ছেড়েই দিলেন!"

"ঘুরে দেখি পাচকটি কাটা পাটার গোড়ানির দিকে ধরে এটিকে পানিতে ধুয়ে নিচ্ছে। মা তাঁর হাত দিয়ে আহত নাবিকটির চোখ ঢেকে ধরলেন।"

"শান্তভাবে নাবিকটি মারা গেলো। পিশাচ কুকটি গরু-ছাগলের মাংসের মতো টুকরো টুকরো করে কাটলো তাকে। তার পচা পা দিয়ে সে বড়শির টোপ বানালো। পিশাচটি নাবিকের শরীরের কিছুই ফেললো না। এমনকি তার অন্ত্র পর্যন্ত টুকরো টুকরো করলো সে। সারা নৌকায় সে কাটা মাংস শুকাতে দিলো। মা বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'দানব, পিশাচ, শয়তান, কি করে পারলে? তুমি না একজন মানুষ। একজন মানুষ হয়ে মানুষের শরীর তুমি

এভাবে কাটতে পারলে কি করে? তোমার ভেতর কি মায়া-মমতা-ভদ্যতা-সভ্যতা বলে কিছু নেই। দৈত্য কোথাকার!' অবিশ্বাস্যভাবে ইতরের মতো জবাব দিলো, যা লেখা সম্ভব নয়।

"পিশাচটি চীনা নাবিকের সুন্দর মুখের চামড়া টেনে তুলতেই আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বমি করতে লাগলাম।"

"পরের বার পাচকটি কাছে আসতেই মা কষে তার মুখে এক চড় মারলেন। মা রাগে রীতিমতো কাঁপছিলেন। মার এই বীরত্বপূর্ণ কাজ আমার ভয় কিছুটা দূর হলো।"

"আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পাচকটিও। সে অনড় দাঁড়িয়ে রইলো। সে মার দিকে তাকাতে পারলো না। আড়চোখে তাকিয়ে আমি এটা লক্ষ্য করলাম।

"আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে গেলাম। আমি মার কাছ ঘেঁষে বসলাম।"

"মা সব সময় ইতরটার দিকে নজর রাখছিলেন। দু'দিন পর মা যা সন্দেহ করেছিলেন তাই ঘটলো।" মা জোরে জোরে বললেন, 'আমি দেখেছি তুমি এক টুকরো মাংস খেয়েছো। তুমি বলেছিলে এগুলো দিয়ে মাছের টোপ বানাবে। আমি জানতাম তুমি এই মতলবেই এ কাজ করেছো। ব্যাটা পশু! দানব। একজন মানুষ হয়ে মানুষের মাংস কীরে খেলো?' মা যদি ভেবে থাকেন এমন ক্রমাগত ভর্ৎসনায় তার মানবীয় গুণাবলী জাগিয়ে তুলবেন তবে ভুল করেছেন। মার কথা শুনেও সে মাংস চিবুতে লাগলো। শুধু তাই নয় এবার রীতিমতো প্রকাশ্যে এক ফালি মাংস খেতে খেতে সে বলে উঠলো, "কী মজা! শুয়োরের মাংসের মতো। অগত্যা মা তার ঘৃণা দেখাতে মুখ ঝামটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। পিশাচটা আরেক ফালি মাংস খেতে খেতে বললো, 'এর মধ্যেই আমি আগের চেয়ে বেশি শক্তি পাচ্ছি।'

"নৌকায় আমরা যার যার প্রান্তে অবস্থান করছিলাম। কেউ কারও সীমানায় প্রবেশ করছিলাম না।"

"কিন্তু আমরা তাকে একেবারে অবজ্ঞা করতে পারলাম না। সে পিশাচ হলেও যথেষ্ট বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ছিলো। সে খুব করিৎকর্মা লোক। সমুদ্র সম্বন্ধে তার অনেক জ্ঞান। সব সময় তার মাথায় নতুন নতুন বুদ্ধি গজাতো। হঠাৎ একদিন ঠিক করলো ভেলা বানাবে। সুন্দর এক ভেলা বানিয়ে ফেললো সে। আমিও অবশ্য তাকে সাহায্য করলাম। কিন্তু সে ছিলো খুব রগচটা স্বভাবের এবং সব সময় আমার সাথে জোরে জোরে কথা বলতো আর অপমান করতো।

"মা আর আমি মৃত নাবিকের এক টুকরো মাংসও খেলাম না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা সমুদ্র থেকে ধরা মাছ বা অন্যকিছু শুরু করলাম। আজীবন নিরামিষভোজী আমার মা জীবন বাঁচাতে বিধাহীনভাবে এগুলো খেতে শুরু করলেন। আমি টের পেলাম ক্ষুধা মুখের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়।"

বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের মনের সংস্কার আর রাগ-অভিমানের মেঘ উড়িয়ে দিলো দূরে। পাচক যখন কোনো ডোরাডো মাছ বা কচ্ছপ ধরতো—আমরা খুশি হয়ে উঠতাম। এক সময় মা তো ওর সাথে হেসে কথা বলতেও শুরু করলেন। পক্ষান্তরে পাচক ভালো মেজাজে থাকলেও আর কথাবার্তা-আচরণ ছিলো কর্কশ। সে আমাদের মনে আশা জাগিয়ে বলতো যে এদিকে কিছুক্ষণ পর একটা দ্বীপ দেখা যাবে। আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতাম। এ ফাঁকে সে লকার থেকে আমাদের খাবার এবং পানি সরাতো।

"এই বিশাল সমুদ্র যেনো কোনোদিন শেষ হবে না।"

"সে মাকে মেরে ফেললো। আমি আমার মাকে মেরে ফেলতে দেখলাম। আমরা ক'দিন না খেয়ে ছিলাম। আমি খুব দুর্বল ছিলাম। একটি কচ্ছপ আমি ধরে রাখতে পারলাম না। পাচকটা তেড়ে এসে মারলো আমাকে। মার সহ্য হলো না। তিনিও পিশাচটাকে আঘাত

করলেন। মা আমার দিকে ফিরে বললেন 'যাও'। আমাকে তিনি ভেলার দিকে ধাক্কিয়ে দিলেন। আমি ভেলার জন্য লাফ দিলাম এবং পানিতে নামলাম। দ্রুত সাঁতরে ভেলায় উঠলাম। আমার করার কিছুই ছিলো না। তারা লড়াই করছিলো। মা একজন পুরুষের সাথে লড়াই করছিলেন। কিন্তু ঐ পেশীবহুল পিশাচটার সাথে পারলেন না। পিশাচটা মার কবজি ধরে মোচড় দিতেই মা এক তীব্র আর্ত চিৎকারে পড়ে গেলেন। সে মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার হাতে একটা ছোরা দেখা গেলো। সে এটা শূন্যে তুললো। তারপর দ্রুত নেমে এলো তার হাত। এরপর তার হাতটা উঠতেই দেখি ছোরাটা লাল। সে ক্রমাগত ছোরা চালিয়েই যাচ্ছিলো। আমি মাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে থামলো। মাথা তুললো এবং আমাকে দেখলো। আমার দিকে কি যেনো ছুঁড়ে মারলো। রক্তের একটা ধারা এসে আমার মুখে লাগলো। এটা আমাকে যে আঘাত দিলো পৃথিবীর কোনো চাবুকই এতো প্রচণ্ড আঘাত করতে পারতো না। আমি আমার মার মাথাটা ধরলাম আমার হাতে। তারপর এটি পানিতে ছেড়ে দিলাম। চারদিকের পানি লাল হয়ে গেলো। সে নৌকার খোলে লুকিয়ে ছিলো। আমার মার লাশটা ফেলে দেয়ার সময়ই তাকে আবার দেখতে পেলাম। তার মুখ ছিলো লাল।

"আমি দিনের বাদবাকি এবং রাতটা নৌকাতেই কাটালাম। আমি জেগেই ছিলাম এবং আমার নজর ছিলো তার দিকে। সে হয়তো রাতে ভেলার দড়িটা কেটে দেবে। কিন্তু সে তা করলো না।

"সকালবেলা তাকে দেখেই আমি দড়ি টানতে শুরু করলাম এবং নৌকায় উঠে পড়লাম। আমি ছিলাম খুব দুর্বল। সে কিছু বললো না। আমিও চুপ থাকলাম। সে একটি কচ্ছপ ধরেছিলো। সে আমাকে এর রক্ত খেতে দিলো। সে এটা কাটলো এবং কচ্ছপের মাংসের সেরা অংশটুকু আমাকে খেতে দিলো। আমি মাঝের বেঞ্চে বসে এটি খেয়ে নিলাম।"

"এরপর আমরা লড়াই করলাম এবং তাকে হত্যা করলাম। তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি ছিলো না। না বিরক্তির, না রাগের, না ভয়ের, না ব্যথার। যদিও আমরা লড়াই করেছিলাম তবু আমার কেনো যেনো মনে হলো সে ইচ্ছে করেই নিজেকে মারতে দিলো। আমি তার পেটে ছুরিটা সেধিয়ে দিলাম। সে আর্তনাদ করে উঠলো, কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলো। আমি ছোরাটা বের করে আবার তাকে আঘাত করলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিলো। সে তবু দাঁড়িয়েই রইলো। সে আমার দিকে তাকালো এবং মাথাটা বাড়িয়ে ধরলো। সে কি কিছু বোঝাতে চাইছিলো? আমার মনে পড়ে গেলো সে আমার মাকে কিভাবে মেরেছে। আমি তার গলায় ছুরি চালালাম। আর এতেই সে মারা গেলো। সে কিছুই বললো না। তার কোনো শেষ কথা ছিলো না। আমি ক্রমাগত তার ওপর ছুরি চালাতে লাগলাম। তার হৃৎপিণ্ড তখনও লাফাচ্ছিলো। আমি এটা কেটে বাইরে নিয়ে এলাম। এটা খেতে আমার খুব মজা লাগছিলো। এরপর আমি তার কলজে খেলাম। আমি আর দেহ থেকে বড়ো বড়ো চাকে মাংস কেটে নিলাম।

"সে খুব বাজে মানুষ ছিলো। তার এ খারাপ দিকটা আমার ভেতরও সংক্রামিত হলো—স্বার্থপরতা, রাগ, হিংস্রতা। এগুলো নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।"

"আবার সবকিছু চুপচাপ, সুনসান। আমি ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকলাম। এবং আমি শেষপর্যন্ত বেঁচে উঠলাম।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

"এটা কি ওটার চেয়ে ভালো? এর ভেতর কিছু খুজে পেয়েছেন কি যেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন? আমাকে কি গল্পের কিছু বদল করতে হবে?"

মি. চিবা : "কি ভয়ঙ্কর গল্প!"

[দীর্ঘ নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "জেব্রা এবং তাইওয়ানিজ নাবিক—দু'জনেরই পা কেটে নিয়েছিলো", লক্ষ্য করেছেন?

"না তো!"

"এবং হায়েনা জেব্রার পা কামড়ে ধরেছিলো ঠিক যেমন পাচক নাবিকের পা কেটে নিয়েছিলো।"

"ওহ্, ওকামোতো—আপনার কতোদিকেই না খেয়াল থাকে!"

"অন্য নৌকায় যে ফরাসীর সাথে তার কথা হয়েছিলো—সে কি বলেনি যে সে একজন যুবক এবং নাবিককে হত্যা করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"পাচক নাবিক এবং তার মাকে মেরেছিলো।"

"অবাক কাণ্ড!"

"এবার তার গল্পটা মানিয়েছে।"

"সুতরাং তাইওয়ানিজ নাবিক হচ্ছে জেব্রা, তার মা হচ্ছে ওরাং-ওটাং এবং কুকটা হচ্ছে হায়েনা—তার অর্থ সে হচ্ছে সেই বাঘ!"

"হ্যাঁ। বাঘটা হায়েনাকে মেরেছিলো—আর অন্ধ ফরাসী হচ্ছে সেই পাচক যাকে সে মেরেছিলো।"

মি. প্যাটেল : "আর একটি চকোলেট বার হবে?"

মি. চিবা : "হ্যাঁ, এই নিন!"

"ধন্যবাদ।"

মি. চিবা : "কিন্তু এর অর্থ কি দাঁড়ালো মি. ওকামোতো?"

"আমার কোনো ধারণা নেই।"

"আর দ্বীপটা? মীরক্যাটগুলোই বা কি?"

"আমি জানি না।"

"আর ঐ দাঁতগুলো? গাছে ঐ দাঁতগুলো কাদের ছিলো?"

"আমি জানি না। আমি কি ছেলেটির মাথায় উঠে বসে আছি নাকি?"

[দীর্ঘ নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "দুঃখিত প্রশ্নটা করতেই হচ্ছে—পাচকটা কি জাহাজ ডোবার ব্যাপারে কিছু বলেছে?"

"পরের কাহিনীর?"

"হ্যাঁ।"

"না।"

"সে কি ২ জুলাই সকালের এমন কিছু উল্লেখ করেছে যা থেকে জাহাজ ডুবি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায়?"

"না।"

"যান্ত্রিক বা অবকাঠামোর কোনো গোলমাল?"

"না।"

"অন্য কোনো জাহাজ বা বস্তু।"

"না।"

"সে কি বলেছে জাহাজটি কোন বিপদ সংকেত দেয়নি কেন?" "আর যদি দিয়ে থাকে? আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এ ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর মালবাহী জাহাজ ... মার্কা ডিঙ্গি জাহাজ, ভাগ্যক্রমে এটা যদি তেল বহন না করে, তাহলেও তখনি কোন রকম বিপদ সংকেত না দিয়েই একটি জাহাজ ডুবে যাবে।"

"যখন 'ওইকা' বুঝতে পারলো যে কিছু একটা ঘটেছে মিনিটখানেক তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"শুধু কি জাহাজটাই তৃতীয় শ্রেণীর ছিলো? এর নাবিকগুলো? তারা কেউ কেউ দুপুরবেলাতেও মদে চুর হয়েছিলো। কে বলবে আহাম্মকগুলো কি কাণ্ড ঘটিয়েছিলো? আর অফিসাররা?"

"আপনি এসব দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন?"

"কি দিয়ে?"

"আহাম্মকগুলোর কথা আপনাকে কে বললো?"

"আমি বোঝাতে চাইছি মদ্যপ অবস্থায় কেউ হয়তো পশুগুলোর খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছিলো।"

মি. চিবা : "খাঁচাগুলোর চাবি কার কাছে থাকতো?"

"বাবার কাছে।"

মি. চিবা : "তাহলে নাবিকরা কি করে খাঁচাগুলো খুলতে পারে? তাদের কাছে তো চাবি ছিলো না।"

"আমি জানি না। এরা তো শাবলও ব্যবহার করতে পারে!"

মি. চিবা : "তারা এটা কেনো করতে যাবে?"

"আমি জানি না। মাতালের মতিগতি কে বলতে পারে? জন্তুগুলো খাঁচার বাইরে ছিলো।"

মি. ওকামোতো : "ক্ষমা করবেন। আপনি নাবিকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।"

"সন্দেহ করছি।"

"অফিসারদের কেউ মাতাল ছিলো বলে জানেন কি?"

"না।"

"কিন্তু আপনি দেখেছেন নাবিকদের কেউ কেউ মদ্যপ ছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি বলছেন অফিসারদের ঠিকমতো কাজ করতে দেখেছেন?"

"আমাদের সাথে কমই দেখা হতো। তারা কখনও পশুর খাঁচার কাছে আসতো না।"

"আমি বলতে চাইছি জাহাজ পরিচালনার ব্যাপারে।"

"আমি কি করে বলবো। আপনি কি মনে করেন তারা আমাদের সাথে বসে রোজ চা খেতো? তারা আমাদের এড়িয়ে চলতো। যদিও তারা ইংরেজি বলতো, কিন্তু তা নাবিকদের চেয়ে খুব একটা উন্নত ছিলো না। আমাদের দেখলে তারা নিজেদের মধ্যে জাপানী ভাষায় কথা বলতো। তারা আমাদের নিম্ন শ্রেণীর ভারতীয় বলে অবজ্ঞা করতো। আমরা পশুগুলোর

দেখাশোনা করেই দিন কাবার করতাম। বাবা-মার ক্যাবিনে যেতাম। রবি অবশ্য খুবই আমুদে ছিলো এবং এর মাঝেও সে এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ খুঁজতো। কিন্তু সে ঐ রেলিং ধরে সাগর দেখা পর্যন্তই। আমি কি করে বলবো অফিসাররা উপযুক্ত ছিলো কিনা!"

"আপনি বলছেন জাহাজটি বাম দিকে কাত হয়ে পড়েছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"এবং সামনের অংশ থেকে পিছনের দিকে গড়ানো ছিলো?"

"সুতরাং জাহাজের পিছনের অংশ আগে ডুবেছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"সামনের অংশ আগে নয়?"

"না।"

"আপনি নিশ্চিত? সামনে থেকে পিছনের দিকে গড়ানো ছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"অন্য কোনো জাহাজের সাথে কি এটার সংঘর্ষ হয়েছিলো?"

"অন্য কোনো কিছুর সাথে কি এটা ধাক্কা খেয়েছিলো?"

"না, আমি দেখিনি।"

"এটা কি চড়ায় উঠে গিয়েছিলো?"

"না, এটা ডুবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো।"

"ম্যানিলা ত্যাগের পর কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিলো কি?"

"না।"

"আপনার কি মনে হয় জাহাজটা নিয়ম অনুযায়ী বোঝাই ছিলো?"

"এটা আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রা। আমি এসব বিষয়ে অজ্ঞ।"

"আপনি বিশ্বাস করেন কোনো বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"অন্য কোনো শব্দ।"

"হাজারো শব্দ।"

"এগুলোর সাথে জাহাজডুবির সম্পর্ক আছে?"

"না।"

"আপনি বলছেন জাহাজটা দ্রুত ডুবে যায়।"

"হ্যাঁ।"

"অনুমান করতে পারেন কতোক্ষণ লেগেছিলো?"

"এটা বলা মুশকিল। খুব দ্রুত। আমার মনে হয় বিশ মিনিটেরও কম সময়ে।"

"এবং অনেক রাবিশ জিনিষ?"

"হ্যাঁ।"

"জাহাজটাতে কি কোনো খেয়ালি উন্মত্ত ঢেউ আঘাত করেছিলো?"

"জানি না।"

"কিন্তু একটা ঝড় ছিলো!"

"আমার কাছে সমুদ্র উত্তাল মনে হয়েছিলো। বাতাস এবং বৃষ্টি ছিলো।"

"ঢেউগুলো কতো উচ্চতার ছিলো?"

"পঁচিশ-ত্রিশ ফুট।"

"এটা ভদ্রই ছিলো, নাকি?"

"আপনি তখন নৌকায় ছিলেন না, তাই না?"

"অবশ্যই। কিন্তু একটি কার্গো জাহাজের।"

"হতে পারে তারা অনেক উঁচুতে ছিলো। আমি জানি না। আবহাওয়া খারাপ ছিলো যা আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। নিশ্চিতভাবে এটুকু বলতে পারি।"

"আপনি বলেছেন আবহাওয়া দ্রুত ভালো হয়ে গিয়েছিলো। জাহাজ ডুবে গেলো আর তার পরের দিনই চমৎকার আবহাওয়া—বলেছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"শব্দটা হঠাৎ ওঠা ঝড়ের চেয়ে বেশি নয়।"

"এটাই জাহাজকে ডুবিয়েছে।"

"এটাই আমাদের আশ্চর্য করছে।"

"আমার পুরো পরিবার মরে গেছে।"

"আমরা দুঃখিত।"

"তাহলে মি. প্যাটেল সবকিছু স্বাভাবিক থাকলো অথচ...?"

"তারপর স্বাভাবিকভাবে ডুবে গেলো।"

"কেনো?"

"আমি জানি না। আপনারা বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে আপনারাই এটা বের করুন।"

"আমরা বুঝতে পারছি না।"

[দীর্ঘ নীরবতা]

মি. চিবা : এখন কি?

মি. ওকামোতো : আমরা এ পর্ব এখানে শেষ করবো। জাহাজটি ডোবার ব্যাখ্যা প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবে গেছে জাহাজটির সাথেই।

[নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "হ্যাঁ। ঠিক তাই। চলো যাই। বেশ মি. প্যাটেল আমাদের যা যা দরকার তার সবই আমরা পেয়ে গেছি। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আপনি আমাদের অনেক অনেক উপকার করলেন।"

"আপনাদেরও ধন্যবাদ। কিন্তু যাবার আগে আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"বেশ, করুন।"

"সিমিটসুম ১৯৭৭ সালের ২ জুলাই ডুবেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আর আমি ম্যাক্সিকোর উপকূলে উঠেছি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮?"

"ঠিক তাই।"

"আমি আপনাদের দুটি গল্প বলেছি যা এই ২৭৭ দিনে ঘটেছে?"

"হ্যাঁ।"

"এর মধ্যে জাহাজটি ডোবার কোন ব্যাখ্যাই পাননি?"

"ঠিক তাই।"

"দুটোর কোনো পার্থক্য করতে পারেন?"

"তাই।"

"আপনারা ধরতে পারলেন না দুটি গল্পের কোনটি সত্য। এ সম্বন্ধে আমার কথা শুনুন।"

"বলুন।"

"দুটো গল্পতেই জাহাজ ডোবে, আমার পুরো পরিবার মারা যায় এবং আমি ভোগান্তির শিকার হই?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে বলুন, দুটো গল্পে ঘটনার তথ্যগত দিকে যদি মিল থাকে তারপরও কোনটা সত্য জন্তুসহ না জন্তু ছাড়া ধরতে পারলেন না?"

মি.ওকামোতো : এটা একটা মজার প্রশ্ন।

মি. চিবা : জন্তুসহ গল্পটা সত্যি।

মি. ওকামোতো : *হ্যাঁ।* জন্তুসহ গল্পটা উন্নততর।

মি. প্যাটেল : ধন্যবাদ। ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ।

[নীরবতা]

মি. ওকামোতো : আপনাকে ধন্যবাদ।

মি. চিবা : *মে এখন ঠিক কি বলবো?*

মি. ওকামোতো : জানি না।

মি. চিবা : শুই দেখুন—মে কাঁদছে।

[অনেকক্ষণ নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "আমরা যাওয়ার সময় সাবধান থাকবো। আমরা রিকার্ডো পাওয়েলের খপ্পরে পড়তে চাই না।"

মি. প্যাটেল : ঘাবড়াবেন না। সে এমন জায়গায় লুকিয়ে আছে যে আপনারা কোনোদিন খুঁজে পাবেন না।

মি. ওকামোতো : আমাদের সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনার যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য আমরা আমাদের সমবেদনা জানাই।

"ধন্যবাদ।"

"এখন কি করবেন?"

"আমি কানাডায় যেতে চাই।"

"ভারতে ফিরে যাবেন না?"

"না। দুঃখের স্মৃতি ছাড়া সেখানে আমার এখন কেউ নেই।"

"জানেন নিশ্চয়ই, আপনি বীমার টাকা পেতে যাচ্ছেন?"

"ওহ্।"

"হ্যাঁ। ওইকা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে।"

[নীরবতা]

মি. ওকামোতো : "আমাদের এখন ওঠা উচিত। আপনার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করছি।"

মি. চিবা : "হ্যাঁ। আপনার সৌভাগ্য কামনা করছি।"

"ধন্যবাদ।"

মি. ওকামোতো : "বিদায়।"

পাই প্যাটেল : "রাস্তার জন্য কিছু কুকি দেবো?"

মি. ওকামোতো : "ভালইতো হয় তাহলে!"

"এই যে, দু'জনের তিনটি করে।"

"ধন্যবাদ।"

মি. চিবা : "ধন্যবাদ।"

"আপনাদেরও ধন্যবাদ। বিদায় ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।"

মি. চিবা : "বিদায়।"

মি. ওকামোতো : "আমি ক্ষুধার্ত।" এসো খাই। তুমি আবার এটা নিয়ে নিতে পারো।

১০০

মি. ওকামোতো পরে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি আমাদের স্বাক্ষাতকার পর্বটি স্মরণ করে একে "কঠিন এবং স্মরণীয়" ঘটনা বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পাইসাইন মলিটর প্যাটেলকে বর্ণনা করেছিলেন 'হাল্কা গড়নের, খুব শক্ত মনের এবং খুব বুদ্ধিদীপ্ত' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

তার তদন্ত রিপোর্টের সার সংক্ষেপ এরকম :

সিমিটসুম জাহাজের একমাত্র বেঁচে যাওয়া যাত্রীটি জাহাজডুবির কারণ কি ছিলো সে ব্যাপারে আশা জাগানিয়া কোনো তথ্যই দিতে পারলো না। তার সাথে কথা বলে মনে হয়েছে জাহাজটা খুব দ্রুত ডুবে গিয়েছিলো। এ থেকে ধারণা করা যায়, জাহাজের তলায় বড়ো ধরনের কোন ফাটল ধরেছিলো। জাহাজডুবির সাথে সাথে অনেক রাবিশ ভেসে ওঠা থেকে এ ধারণাই পোক্ত হয়। কিন্তু এর তলা ফেসে যাবার সঠিক কারণ কি ছিলো তা জানা যায়নি। সেদিনের আবহাওয়ার তথ্য নিয়ে জানা গেছে, আবহাওয়া তেমন খারাপ ছিলো না যাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। বেঁচে যাওয়া যাত্রীটির এ প্রসঙ্গে দেয়া তথ্য উচ্ছাসপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়। বড়ো জোর আবহাওয়া এ ঘটনার সহযোগী কারণ হতে পারে। মনে হয় জাহাজের অভ্যন্তরীণ কোনো ঘটনা এর জন্য দায়ী। যাত্রীটির বিশ্বাস সে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলো। এটা ইঞ্জিনের বড়ো কোনো সমস্যাকেই নির্দেশ করে। হতে পারে বড়ো কোনো বয়লার ফেটে গিয়েছিলো। জাহাজটি ছিলো ২৯ বছরের পুরনো (এরলান্ডসন এ্যান্ড ক্যাম্প শিপইয়ার্ডস, মালমো, ১৯৪৮)। ১৯৭০ সালে এটার সংস্কার করা হয়েছিলো। অবকাঠামোর বড়ো কোন বিপর্যয় এবং আবহাওয়া—এ দুইয়ের মিলিত কারনেই হয়তো জাহাজটা ডুবেছে। অবশ্য এটা পুরোপুরিই অনুমাননির্ভর। ঐদিন এলাকায় অন্য কোনো জাহাজ ছিলো না। সুতরাং জাহাজে-জাহাজে সংঘর্ষ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাবিশ জিনিসের সাথে সংঘর্ষের ফলে হতে পারে—কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই। কোনো ভাসমান মাইনের বিস্ফোরণে এটা ঘটতে পারে। কিন্তু এটা অনেকটা হাস্যকর, যেহেতু জাহাজটার পিছনের দিকটা আগে ডুবেছে। এতে আরও ধারণা করা

যায় জাহাজের পিছনেও নিশ্চয় বড়ো ফাটল ধরেছিলো। যাত্রীটি নাবিকদের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করলেও অফিসারদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারেনি। ওইকা জাহাজ কোম্পানি কেবল বৈধ মালপত্রই বহন করে থাকে এবং সতর্কতার সাথে নাবিক এবং অফিসার নিয়োগ করে।

জাহাজডুবির কোন সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। ওইকার বীমার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে আর কোনো উদ্যোগের প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ের এখানেই ইতি টানার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি বেঁচে যাওয়া যাত্রী মি. পাইসাইন মলিটর প্যাটেলের ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশের সাথে, ক্রমাগত সাহসী লড়াই করে টিকে থাকার কাহিনী অনন্য এবং অসাধারণ। উল্লেখ্য, সে একজন ভারতীয় নাগরিক। এই তদন্তে গিয়ে তার কাহিনী শুনে জানতে পারলাম— জাহাজডুবির ইতিহাসে তার মতো এতোদিন সাগরে ভেসে টিকে থাকার ঘটনা আর একটিও নেই। আর এমন এক রোমাঞ্চকর, কঠিন বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মর্মস্পর্শী ঘটনা কে কবে শুনেছে, যেখানে ভুক্তভোগীর পাশে সঙ্গী হিসেবে দেখা যায় এক জলজ্যান্ত বাংলার বাঘকে।

লাইফ অব পাই

ইয়ান মার্টেল

পাই প্যাটেল পন্ডিচেরির বাসিন্দা। সেখানে তার বাবার ছিলো চিড়িয়াখানা। তার বয়স যখন ষোলো, তার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেন তাদের বিশাল পরিবারসহ কানাডায় অভিবাসন করার। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যতাড়িত হতে হলো যখন তাদের বহন করা কার্গো জাহাজটি ঝঞ্ঝা-কবলিত হয়ে ডুবে গেলো। শুধু একটি নিসঙ্গ জীবনতরী টিকে রইলো বিক্ষুব্ধ নীল প্রশান্ত মাহসাগরে। বেঁচে যওয়া পাঁচজন আরোহী ছিলো—পাই, একটি হায়েনা, একটি জেব্রা (যার একটি পা ভেঙে গেছে), একটি মাদি ওরাং-ওটাং এবং ৪৫০ পাউন্ড ওজনের একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। একটি বিস্ময়কর অভিযানের পটভূমি এভাবেই রচিত হয়েছে।

ইয়ান মার্টেলের কল্পনাপ্রসূত অদম্য পাইয়ের জীবন একটি ঐন্দ্রিজালিক পাঠ-অভিজ্ঞতা, দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণনার এক অশেষ নীল বিস্তার, টিকে থাকা এবং চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস.....এক চমৎকার ও ভয়ঙ্কর কাহিনী যা মানবজীবনকে অর্থবহ করে।—দি স্টেইট্সম্যান

যাঁরা বিশ্বাস করে থাকেন উপন্যাস হচ্ছে এক জীবন্মৃত কলা-ইয়ান মার্টেলের রচনা তাঁদের [illegible], পুলকিত এবং কৃতজ্ঞ করবে।—আলবার্টো ম্যাঙ্গুয়েল

ঠিক যখন আপনি ভাবছেন মোহাবিষ্টতার যুগ শেষ...ইয়ান মার্টেল ঠিক তখনই ঐন্দ্রিজালিক [illegible] করেন তাঁর মনোমুগ্ধকর কাহিনীতে।—ইন্ডিয়া টুডে

গল্পের ছলে চমৎকারিত্ব মিশিয়েছেন....কেউ পাইয়ের জীবন রূপকাশ্রয়ী কাহিনী বা ঐন্দ্রিজালিক [illegible] উপকথা হিসেবে পড়ে না, বরং টান টান উত্তেজনার অভিযান হিসেবে পড়ে থাকে। [illegible] প্রকাশভঙ্গি এক মুগ্ধতার প্রবাহ সৃষ্টি করেছে এই সাংঘাতিক মনোরম উপন্যাসে।—দি গার্ডিয়ান

মার্টেল তাঁর এই সহজিয়া বইয়ের আদলে যা অর্জন করেন তা আসলে এক স্বল্প পরিসর, মন্ত্রমুগ্ধতা [illegible] করেই এটি আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত পড়তে আকুল করে এবং আদিমূলে ফিরিয়ে নেয়।—আউটলুক

এক বিস্ময়কর উপন্যাস। এটা অবিশ্বাস্য যে, কেউ তার কল্পনাকে এমন বল্গাহীন রাজত্ব দিতে পারে এবং সমগ্র সর্পিল ধারণার কোমল আবরণকে এমন উজ্জ্বল, যৌক্তিকভাবে আনুক্রমিক উপস্থাপন করতে পারে।—ডেকান ক্রনিক্‌ল

ইয়ান মার্টেলের বই আপনাকে শুধু অস্বাভাবিকতা বিশ্বাস করতেই উদ্বুদ্ধ করে না, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন....এর জাদুবাস্তবতা এবং পঞ্চতন্ত্র এক উর্বর সুধামিশ্রণ সুসমন্বিত করে। —ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

LIFE OF PIE

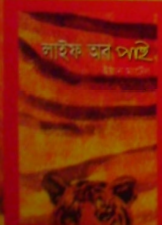

By Yan Martel

THE SKY PUBLISHERS

ISBN 984-826-021-8

9 789848 260210

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET